শ্রীশ্রীনিবাস চরিতামৃত

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দাশগুপ্ত

শ্রীশ্রীরাধারমণো জয়তি।
ভজ নিতাই গৌর রাধে শ্যাম।
জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম॥

সমর্পণ

যিনি বাল্যকাল হইতে প্রকট কালের প্রতিটী মুহূর্ত্ত যাঁহাদের লীলা মাধুরী আস্বাদনে নিমগ্ন থাকিয়া, আপনাকে এবং আপামর সাধারণকে অবিরল প্রেম-ধারায় নিরন্তর সিক্ত করিয়াছেন; যিনি অলক্ষিত ভাবে কৃপা শক্তি সঞ্চার করিয়া শ্রীল শ্রীনিবাস-নরোত্তম-রামচন্দ্র-শ্যামানন্দের পূত লীলা কাহিনী সঙ্কলন করাইয়াছেন, সেই পরম করুণ শ্রীগুরুদেব শ্রীল রামদাস বাবাজী মহারাজের প্রসন্নতা প্রার্থনা করিয়া তাঁহারই কর কমলে "শ্রীশ্রীনিবাস চরিতামৃত" সমর্পণ করিলাম।

শ্রীশ্রীগুরু পূর্ণিমা।
সন ১৩৬৭ সাল।

অযোগ্য সেবক—
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দাশগুপ্ত।

শ্রীশ্রীগৌরবিধুর্জয়তি

বাঁকুড়া নিবাসী কবিরাজ শ্রীমান কৃষ্ণচৈতন্য দাশগুপ্ত ভায়ার লিখিত "শ্রীশ্রীনিবাস চরিতামৃত" গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া বড় তৃপ্তি পাইয়াছি। আমি মনে করি শ্রীভগবানে ভক্তিপিপাসু ব্যক্তিমাত্রের এই গ্রন্থ অধ্যয়নে কল্যাণ লাভ হইবে। ইতি—

শ্রীপাদ রামদাস বাবাজী
মহারাজের প্রতিষ্ঠিত
আশ্রম সমূহের ট্রাষ্টী
শ্রীরাধাচরণ দাস বাবাজী
১৩ই শ্রাবণ, ১৩৬৭।

ভূমিকা

অখণ্ড সুখ পাইবার জন্য জীব কত চেষ্টাই না করিতেছে কিন্তু তাহা সফল হয় কৈ? জীবের এই প্রচেষ্টা অনাদি কাল হইতে চলিতেছে।

স্থাবর জঙ্গমাদি নানা যোনিতে বারম্বার জন্ম গ্রহণ করিয়া ঐ অখণ্ড সুখকেই জীব খুঁজিয়া বেড়াইতেছে। পরিশেষে সুদুর্ল্লভ মানুষ দেহ যখন প্রাপ্ত হয় তখন ঐ সুখের লালসায় সে করিতে পারে না এমন কর্ম্ম নাই। তথাপি কি কোন মানুষ কখন বলিতে পারে আমি যতটা এবং যেরূপ সুখ চাহিয়াছিলাম তাহা পাইয়াছি?

শাস্ত্র বলিলেন—হতাশ হইবার কারণ নাই। আমার কথায় চল, আমি সে আশ্বাস দিতে পারি। এমন কি আমা ব্যতীত অন্য কেহই সে ভরসা দিতে পারে না। আমার প্রদর্শিত পথে যে চলিবে সে প্রকৃত সুখের অধিকারী হইবেই হইবে। শাস্ত্র এই ভাবে আশ্বাস দিয়া জীবকে টানিয়া আনিলেন নিজের আওতার মধ্যে। দেখাইলেন তাঁকে কর্ম্ম, যোগ, জ্ঞান প্রভৃতি পথ। সর্ব্বশেষে তিনি ভক্তি পথ দেখাইয়া বলিলেন—এই পথই প্রকৃতপক্ষে অভয়ের পথ। ইহাতে চোখ মুদিয়া ছুটিতে পার। যেমন তেমন ছুটিতে পার, কোন বাধা নাই, কোন বিপদ নাই, পতন নাই কি স্খলন নাই।

"ধাবন্নিমীল্য বা নেত্রে ন স্খলেন্ন পতেদিহ"। 'ভাগবত'। এই পথের শেষ সীমায় উপস্থিত হইলেই পাইবে শ্রীভগবানকে। শ্রীভগবানকে পাইলেই তুমি তোমার সকল দুঃখের অবসান ঘটাইয়া অনন্ত সুখের অধিকারী হইবে। সুখ এবং শ্রীভগবানকে পৃথক্ বলিয়া বুঝিলে চলিবে না "আনন্দং ব্রহ্মণো রূপম্", "রসো বৈ সঃ, রসং হেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি" এই উপনিষৎ প্রমাণে শ্রীভগবানই হইতেছেন রস ঘন বিগ্রহ, আনন্দ ঘন বিগ্রহ, সুখ ঘন বিগ্রহ। তদ্ব্যতীত সুখের অস্তিত্ব অন্য কোথাও নাই। তাই তিনি সকল সাধনার চরম ফল। তাঁহাকে পাইয়া পুনরায় আলাদা করিয়া সুখকে পাইতে হইবে না। তিনি সুখময়, তিনি রসময়, তিনি আনন্দময়। এবম্বিধ শ্রীভগবানকে প্রাপ্ত হইবার একমাত্র উপায় ভক্তি।

ভক্তি ব্যতীত তাঁহাকে পাইলেও পাওয়া যায় না। ফল কথা—রসনেন্দ্রিয় ব্যতীত যেমন রস আস্বাদন হয় না, ভক্তি ব্যতীত তেমনি শ্রীভগবানের রস স্বরূপটী উপলব্ধি হয় না। "ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ" "ভক্ত্যা মামভিজানাতি"। ভক্তিতে ভগবদ্ মাধুরী এমন আস্বাদন হয় যে, সে মাধুরী আস্বাদন করিতে শ্রীভগবানেরও লালসা জাগে।

শ্রীভক্তি রসামৃত গ্রন্থে শ্রীরূপ গোস্বামি চরণ ভক্তিকে "শ্রীকৃষ্ণাকর্ষিণী" বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ অনন্ত কোটী

ব্রহ্মাণ্ড ও তদন্তর্গত অনন্ত জীবকে স্বমাধুর্য্য দিয়া আকর্ষণ করেন, শিব ব্রহ্মাদি দেবাধি দেবগণও ঐ মাধুর্য্যময় আকর্ষণে পতিত না হইয়া পারেন না। আবার সেই শ্রীকৃষ্ণকে আকর্ষণ করিয়া বশীভূত করিয়া থাকেন একমাত্র ভক্তি। এইজন্য জগতে ভক্তি সুদুর্ল্লভা। "সেয়ং সাধন সাহস্রৈর্হরিভক্তিঃ সুদুর্ল্লভা"। "মুক্তিং দদাতি কর্হিচিৎ স্ম ন ভক্তি যোগম্"। কিন্তু যদি কোন ভক্তের চরিত অনুশীলন করা যায় তবে নিঃসন্দেহে সেই সুদুর্ল্লভা ভক্তি সুসুলভা হইয়া পড়েন। এইজন্য ভক্তিকামী সাধকের পক্ষে ভক্ত চরিতানুশীলন অবশ্য কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ যাঁহারা শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের উপাসনা করেন তাঁহাদের শ্রীগৌর পরিকরগণের লীলাবলী শ্রবণ ও অধ্যয়ন অপরিহার্য্য। এই গ্রন্থের বর্ণিত বিষয়—শ্রী শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভুর চরিত ইনি এত প্রচুর ভক্তি বৈভবের অধিকারী ছিলেন যে, ইঁহাকে মহাজনগণ সাক্ষাৎ ভক্তাবতার ভগবান শ্রীগৌর সুন্দরের এক অন্তরঙ্গ ভক্ত বলিয়া ক্ষান্ত হন নাই, ইঁহাকে প্রেম পুরুষোত্তম শ্রীগৌরসুন্দেরর অভিন্ন প্রকাশ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি শ্রীভগবান আনন্দময় এবং সেই আনন্দমাধুরী প্রকটিত হয় একমাত্র ভক্তি দ্বারা। এই ভক্তির পরাকাষ্ঠা যেখানে সেইখানেই ভগবদ্ মাধুরীর চরম বিকাশ। শ্রীমদ্ ভাগবতাদি শাস্ত্র প্রমাণে জানা যায় ব্রজগোপীগণই ভক্তির চরমকাষ্ঠার অধিকারিণী। যাঁহাদিগকে ভক্তির প্রতিদান দিতে পূর্ণব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ নিজের অসামর্থ্য জ্ঞাপন করিতে গিয়া বলিয়াছিলেন "ন পারয়েঽহং নিরবদ্যসংযুজাম্"। সুতরাং এই ব্রজগোপীগণের ভক্তির নিকট ভগবদ্ মাধুরীর যে চরম বিকাশ হইয়াছিল ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। তাই শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বলিলেন "তত্রাতি শুশুভে তাভির্ভগবান্ দেবকী সুতঃ। মধ্যে মণীনাং হৈমানাং মহামারকতো যথা"। শ্রীভগবান সহজেই মধুর তাহাতে আবার রাসস্থলীতে গোপীগণের সঙ্গে মিলিত হইয়া তিনি অতিশয় মধুর হইয়াছিলেন। যেমন মহামরকতমণি স্বাভাবিক

সুন্দর হইলেও হেমমণি মালার মধ্যস্থিত হইলে উহা অধিক সুন্দর হইয়া থাকে। আবার ঐ রাসস্থলীতে গোপীগণের মধ্যে যিনি প্রধানা সেই মহাভাব স্বরূপিনী শ্রীরাধাঠাকুরাণীর সঙ্গে যখন তিনি মিলিত হইয়াছিলেন তখন যে মাধুরী তাঁহার প্রকট হইয়াছিল তাহা আস্বাদন করিতে স্বয়ং তাঁহার নিজেরই অনিবার্য্য ইচ্ছা হইয়াছিল। কিন্তু কৃষ্ণমাধুর্য্যের স্বভাব হইতেছে কৃষ্ণভক্ত ব্যতীত অন্যকর্ত্তৃক উহা আস্বাদিত হয় না ফল কথা ভগবদ্ মাধুরী ভক্তই আস্বাদন করিয়া থাকেন অন্যে পারে না, স্বয়ং ভগবানও পারেন না। যদি পারিতে হয় তবে ভগবানকে ভক্ত হইতে হয়। তাহাই হইল। ভগবান কৃষ্ণ স্বীয় অসমোর্দ্ধ মাধুরী আস্বাদন করিতে অসমোর্দ্ধ ভক্তির অধিকারিণী শ্রীরাধারাণীর ভাবকান্তি আশ্রয় করিয়া নবদ্বীপে অবতীর্ণ হইলেন। সেই রাধাভাবদ্যুতি সম্বলিত শ্রীকৃষ্ণের নাম হইল শ্রীগৌরাঙ্গ। ফলতঃ ভগবান ভক্ত হইলেন ভক্তি রস আস্বাদন করিতে। ইহাতেই পাঠক অবগত হইবেন ভক্তি কত উর্দ্ধের বস্তু।

শাস্ত্র ও মহাজনগণ ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে রসিকেন্দ্র চূড়ামণি বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। অপ্রাকৃত আনন্দ চিন্ময় রস অশেষ বিশেষে উপভোগ করাই তাঁহার স্বভাব, তাই তিনি ভগবান হইয়া যে আনন্দ, তাহা তাঁহার থাকিলেও ভক্ত হইয়া যে আনন্দ তাহা তাঁহার ছিল না বলিয়া তিনি ভক্ত হইতে ইচ্ছা করিলেন। তাঁহার সে বাসনা পূর্ণ হইল শ্রীগৌরাঙ্গ অবতারে। এ রহস্য সাধারণ মানুষ এমন কি বহু পণ্ডিতেরাও বুঝিতে পারিলেন না। তাঁহারা শ্রীগৌরাঙ্গকে 'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' বলিয়া কান্দিতে দেখিয়া ও শুনিয়া স্থির করিলেন—ইনি কৃষ্ণের একজন পরম ভক্ত, কিন্তু এ রহস্য যাঁহারা বুঝিতে পারেন এমন অন্তরঙ্গ পরিকরগণ বলিলেন—না তা নয়, ইনি কৃষ্ণ, কৃষ্ণই কৃষ্ণ ভক্তি আস্বাদন করিতে কৃষ্ণভক্ত হইয়াছেন। ইঁহাদের বাক্য সমর্থন করিতে কত কত শাস্ত্র প্রমাণও পাওয়া গেল।

রস শাস্ত্র বিচারে দেখা যায় নায়ক-নায়িকার মিলন অপেক্ষা বিরহেই রসের পূর্ণাভিব্যক্তি হয়, প্রকৃত পক্ষে আমি আপনাকে কেমন ভালবাসি তাহার প্রকৃত ছবিটি উঠিবে তখন, যখন আমি আপনাকে হারাইব। আপনি যখন আমাকে ছাড়িয়া বিদেশে চলিয়া যাইবেন।

শ্রীকৃষ্ণ যদি বৃন্দাবন ছাড়িয়া মথুরায় না যাইতেন তাহা হইলে ব্রজবাসীর যে অতুলনীয় কৃষ্ণপ্রেম তাহার ছবি কেহ তুলিতে পারিত না। ব্রজবাসিগণ কৃষ্ণবিরহী হইয়াছিলেন বলিয়াই তাঁহাদের সেই প্রগাঢ় প্রেমের পরিচয় শাস্ত্র ও মহাজনগণ দিতে পারিয়াছেন কোন এক রসিক ভক্ত বলিয়াছিলেন—বিরহ ও মিলনের মধ্যে আমি বিরহকেই প্রশংসা করি, কারণ মিলনেতে তাঁকে মাত্র একটী জায়গায় পাই, বিরহে সর্ব্বত্রই তাঁর দর্শন মিলে। ব্রজবাসিগণ কৃষ্ণকে মথুরা পাঠাইয়া কৃষ্ণবিরহী হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু কৃষ্ণ দর্শন হইতে বঞ্চিত হন নাই। "যাহা যাহা নেত্র পড়ে তাঁহা কৃষ্ণ স্ফুরে"। প্রকৃত পক্ষে মিলনে যে সুখ অনুভূত হয় সেই সুখই শত সহস্র গুণে অনুভূত হয় বিরহের মধ্যে। শ্রীরূপ গোস্বামি চরণ তাঁহার উজ্জ্বল নীলমণি গ্রন্থে গোপীগণের পরকীয়া তত্ত্ব বিচার করিতে গিয়া এই সিদ্ধান্তই করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন গোপীগণ কৃষ্ণের নিত্য কান্তা। কৃষ্ণের সহিত তাঁহাদের নিত্য মিলনই হইয়া রহিয়াছে। কিন্তু রসিক শেখর কৃষ্ণ বিরহের মধ্যে রস বিশেষ আস্বাদন করিবার জন্য সেই স্বকীয়া কান্তাদিগকে শ্রীবৃন্দাবনে পরকীয়া রূপে অবতীর্ণ করাইয়া ছিলেন। কারণ পরকীয়া রমণীর সহিত নিরবচ্ছিন্ন মিলনেতে বহু অন্তরায় আসিয়া বিরহ ঘটাইয়া থাকে। শ্রীবৃন্দাবনে প্রকটলীলায় শ্রীরাধারাণী শ্রীকৃষ্ণের সহিত কতটুকু মিলন সুখ পাইয়াছিলেন? তাঁহার অন্তরে ওতপ্রোতভাবে অনন্তমিলনের আশা থাকিলেও তিনি মহাবিরহের সম্মুখীন হইয়াছিলেন। তাই তিনি নিজ প্রাণনাথের সঙ্গে যখন মিলিত হইতেন তখন তাঁর নিকট সেই বিরহের জন্য কত

খেদ করিতেন। সেই খেদ তাঁহার অভিন্ন স্বরূপ শ্রীনিত্যানন্দের অবতার শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরের মুখে ব্যক্ত করিয়াছেন—

হেদে হে নাগরবর, শুনহে মুরলীধর,
নিবেদন করি তুয়া পায়।
চরণ-নখর-মণি, যেন চাঁদের গাথনি,
ভাল শোভে আমার গলায়।
শ্রীদাম সুদাম সঙ্গে, যখন বনে যাও রঙ্গে,
তখন আমি দুয়ারে দাঁড়ায়ে।
মনে করি সঙ্গে যাই, গুরুজনার ভয় পাই,
আঁখি রহে তুয়া পানে চেয়ে॥
চাই নবীন মেঘ পানে, তুয়া বঁধু পড়ে মনে,
এলাইলে কেশ নাহি বাঁধি।
রন্ধন শালাতে যাই, তুয়া বঁধু গুণ গাই,
ধুঁয়ার ছলনা করি কান্দি॥
মণি নও মাণিক্য নও, আঁচলে বাঁধিলে রও,
ফুল নও যে কেশে করি বেশে।
নারী না করিত বিধি, তুয়া হেন গুণনিধি,
লইয়া ফিরিতাম দেশে দেশে॥
অগুরু চন্দন হইতাম, তুয়া অঙ্গে মাখা রইতাম,
ঘামিয়া পড়িতাম রাঙ্গা পায়।
কি মোর মনের সাধ, বামন হ'য়ে চাঁদে হাত,
বিধি কি সাধ পূরাবে আমায়॥

শ্রীরাধারাণী যাই বলুন না কেন তাঁর সাধ পূর্ণ হইয়াছে। তাঁহার সহিত জড়িত হইয়া তাঁর ভাবকান্তি অঙ্গীকার করিয়া শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হইলেন শ্রীগৌরাঙ্গ রূপে। শ্রীভগবান ভক্তের কোন অভিলাষই অপূর্ণ রাখেন না। মহাভাবস্বরূপিণীরই বা অভিলাষ অপূর্ণ রাখিবেন কি করিয়া? শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে মিলিত হইয়া

শ্রীরাধারাণীর বিরহ তাপ শান্ত হইল। কিন্তু সেই তাপ আশ্রয় করিল শ্রীকৃষ্ণকে। কারণ শ্রীকৃষ্ণ গৌরাঙ্গ হইয়া নিজেকে ভাবিলেন শ্রীরাধা। শ্রীরাধার মতই "কৃষ্ণ কোথায়" বলিয়া তিনি কান্দিলেন। কান্দিয়া কান্দিয়া ধরা ভাসাইয়া দিলেন। তাঁহার সেই ক্রন্দনে পাষাণও বিগলিত হইয়া গেল। শ্রীভগবানের এ এক অপূর্ব্ব মাধুরী। নিজে কৃষ্ণ হইয়াও "কৃষ্ণ কোথায়" বলিয়া কান্দিতেছেন। নীলাচলে গম্ভীরায় বসিয়া স্বরূপ ও রামরায় নামক দুইজন অন্তরঙ্গ পরিকরকে ললিতা বিশাখার আসনে রাখিয়া কৃষ্ণকে কেমন করিয়া পাওয়া যাইবে তাঁদের সঙ্গে সেই পরামর্শ করিতেছেন! বিরহিণীর অষ্ট সাত্ত্বিক দশা ভোগ করিতেছেন! শ্রীভগবানের প্রকৃত পক্ষে ইহা এক অভূত-পূর্ব্ব লীলা মাধুরী। কৃষ্ণ, কৃষ্ণবিরহিণী শ্রীরাধারাণীর ভাবে কৃষ্ণ-মাধুর্য্য আস্বাদন করিতেছেন। আস্বাদন করিতে করিতে তাঁহার যে মাধুর্য্য প্রকটিত হইল তাহাতেও তিনি লুব্ধ না হইয়া পারিলেন না। অর্থাৎ কৃষ্ণের কৃষ্ণ-মাধুর্য্য আস্বাদন করিতে যেমন ইচ্ছা হইয়াছিল গৌরেরও তেমনি গৌর মাধুর্য্য আস্বাদন করিতে বাসনা জাগিল। রসিকেন্দ্র চূড়ামণির পক্ষে এরূপ বাসনার উদ্রেক হওয়া অস্বাভাবিক নয় এবং তাঁহার কোন বাসনা অপূর্ণ থাকাও সম্ভব নয়। শ্রীভক্তি রত্নাকরাদি গ্রন্থ হইতে শ্রীল শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভুর চরিত অনুশীলন করিলে জানা যায় শ্রীগৌরাঙ্গের ঐ শ্রীরাধা ভাবাবিষ্ট মাধুর্য্য ভোগের লালসা পূর্ণ হইয়াছে। শ্রীগৌরাঙ্গই স্ব মাধুর্য্য আস্বাদন করিতে শ্রীশ্রীনিবাস আচার্য্যপ্রভু রূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। কারণ শ্রীনিবাস প্রভুর জীবনে সপার্ষদ শ্রীগৌরাঙ্গের বিরহ যেরূপ ভোগ হইয়াছে এমনটী আর কোথায়ও দেখা যায় নাই।

পূর্ব্বেই আমরা বলিয়াছি বিরহের মধ্যেই মিলন সুখ সহস্রধারে পরিণত হয়। শ্রীনিবাস প্রভু গৌর বিরহ সমুদ্রে পতিত হইয়া গৌর মিলন মাধুর্য্য তেমনি সহস্রধারেই উপভোগ করিয়াছেন। তাঁর জীবন চরিত ভক্তি রত্নাকরাদি বিবিধ গ্রন্থে আলোচিত হইয়াছে।

বর্ত্তমান জগতের মানুষ যে বিপর্য্যয়ের মধ্যে দিন কাটাইতেছে তাহার পক্ষে ঐ সব গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া শ্রীনিবাস প্রভুর চরিত অনুশীলন করা সম্ভব নয়। এতদ্ব্যতীত ঐ সব দুর্ল্লভ গ্রন্থ বাজারে এখন পাওয়া যায় না। সুতরাং কবিরাজ শ্রীমান্ কৃষ্ণচৈতন্য দাশগুপ্ত সেই সব গ্রন্থ হইতে শ্রীনিবাস চরিত কুসুম চয়ন করিয়া যে মালাটী এই গ্রন্থাকারে রচনা করিলেন প্রকৃত পক্ষে তিনি গৌরানুরাগী ভক্তগণের এক মহোপকারই সাধন করিলেন। তাঁহার সঙ্কলিত এই চরিতামৃত খুব সুখপাঠ্যই হইয়াছে। পুষ্প যদি দিব্য সৌরভের আধার হয় এবং উত্তম শিল্পীর শিল্পচাতুর্য্যে দিব্য এক মালা আকারে পরিণত হয় তবে সে, সকল শ্রেণীর মনকে হরণ করিয়া থাকে। এই গ্রন্থখানি সেইরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে। শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভুর চরিত্রের এক এক ঘটনা অমৃত স্বরূপ। তাহা পাঠ করিলে অতি বড় পাষণ্ডেরও হৃদয় বিগলিত হইয়া ভক্তিলতা রোপণের উত্তম ক্ষেত্ররূপে পরিণত হয়।

লেখক নিজ লেখনীর মধ্যে ঐ চরিতামৃত সংগ্রহ করিয়া এমন সুন্দরভাবে পরিবেশন করিয়াছেন যে, যে কোন ব্যক্তি উহা পাঠ করিলে ভক্তিরসে আপ্লুত হইয়া আত্মহারা হইয়া পড়িবেন। শ্রীগুরু বৈষ্ণবের কৃপা না হইলে এমন ভাবে এই গ্রন্থ লেখা হইত না। শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের নিকট এবং তাঁহার অভিন্ন প্রকাশ শ্রীশ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর নিকট প্রার্থনা করি শ্রীমান্ লেখক দীর্ঘায়ু হইয়া এইরূপে আরও গ্রন্থাবলী সঙ্কলন করিয়া গৌর গৌরপরিকরের লীলারস বিতরণে ত্রিতাপতপ্ত ও ভক্তিরসিক মানবগণের শান্তি ও প্রীতি বিধান করুন। অলমতি বিস্তরেণ—

শ্রীগুরু বৈষ্ণব কৃপা প্রার্থী
বরাহনগর পাঠবাড়ী আশ্রমের
শ্রীশ্রীভাগবত চতুষ্পাঠীর অধ্যাপকদ্বয়—
শ্রীকেদারনাথ কাব্য-ব্যাকরণ পুরাণতীর্থ
শ্রীবৈষ্ণব চরণ দাস তর্ক-তীর্থ

১৩ই শ্রাবণ, ১৩৬৭।

সূচি-পত্র।

বিষয়—		পৃষ্ঠা।

বিষয়— পৃষ্ঠা।

[২২০ পৃঃ পাদটীকায় সপ্তম লাইনে "অনুগ্রহে" স্থলে "আগ্রহে" হইবে।]

শ্রীশ্রীনিবাস চরিতামৃত

শুদ্ধংসাত্ত্বততত্ত্বমত্র ভগবানুদ্ভাব্য শক্ত্যৈকয়া
শ্রীরূপাভিধয়া প্রকাশয়িতমপ্যেতৎ স্বশক্ত্যান্যয়া।
শ্রীমদ্বিপ্রকুলেঽমলে প্রকটয়ন শ্রীশ্রীনিবাসাভিধং
লীলা সংবরণং স্বয়ং স বিদধে নীলাচলে শ্রীপ্রভুঃ॥

পূর্ব্বকথা, জন্ম ও বাল্যলীলা

নবদ্বীপে তখন আনন্দের হাট বসিয়াছে। শ্রীমন্মহাপ্রভুর অভিনব লীলা-কাহিনী সমগ্র ভারতের বুকে ধীরে ধীরে ছড়াইয়া পড়িতেছিল। সকলেই তখন সাগ্রহে নবদ্বীপের প্রত্যেকটী ঘটনার প্রতি লক্ষ্য রাখিতেছেন। যাঁহারা সুযোগ পাইলেন, আসিয়া যোগদান করিলেন। আর দৈবক্রমে যাঁহারা আসিতে পারিলেন না তাঁহারা নিজ নিজ দুরদৃষ্টকে ধিক্কার দিলেন। ভাগীরথীর তীরবর্ত্তী চাকন্দী গ্রামনিবাসী আবাল্য ভজন পরায়ণ গঙ্গাধর ভট্টাচার্য্য তখন টোলের ছাত্র; নিমাই এর কথা তিনিও শুনিয়াছেন। তাঁহার টোল সংস্থাপনের কথা, দিগ্বিজয়ী-বিজয়ের কথা, প্রভৃতি যতই শুনিয়াছেন ততই আকৃষ্ট হইয়াছেন। আবার যখন শুনিলেন,—গয়া হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পর নিমাই এর চরিত্র একেবারে পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে, অদ্ভুত কৃষ্ণ প্রেমানুরাগে তিনি ভাসিতেছেন, তখন ভট্টাচার্য্য যেন তাঁহার প্রতি অধিকতর মনোযোগী হইয়া পড়িলেন, এবং অবশেষে তাঁহার 'স্বয়ং-ভগবত্তার' সংবাদ যখন শুনিলেন তখন নিকটে যাইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া সুযোগের অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। কিছুদিনের মধ্যেই গঙ্গাধর একদিন নবদ্বীপের উদ্দেশ্যে রওনা হইয়া পড়িলেন। কিন্তু নদীয়া নাগর নিমাই পণ্ডিতের যে রূপটী ভট্টাচার্য্য হৃদয়ে ধারণ

করিয়া রাখিয়াছিলেন, সে রূপটীর দর্শন পাইবার সম্ভাবনা তাঁহার চিরদিনের মত বিলীন হইয়া গেল। গৌর সুন্দরের গৃহত্যাগ এবং সন্ন্যাস গ্রহণার্থে কাটোয়াতে কেশব ভারতীর সমীপে আগমনের সংবাদ পথিমধ্যেই তাঁহার কর্ণগোচর হইল। এই মর্ম্মান্তিক সংবাদ শ্রবণ করিয়া ভট্টাচার্য্য হতাশায়, এবং অন্তর্বেদনায় একেবারে বিমূঢ় হইয়া সেই পথের উপরেই কিয়ৎক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলেন। অবশেষে কি যেন ভাবিয়া উন্মত্তের ন্যায় আবার কেশব ভারতীর আশ্রম অভিমুখে দৌড়াইয়া চলিলেন।

শ্রীভগবান যখন আবির্ভূত হন তখন তাঁহার নিজস্ব প্রভাব এবং মাধুর্য্যের গুণে জীব-সমাজ জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হয়, ইহাই নিয়ম। এই অবতারগণের মধ্যে যে স্বরূপে এই মাধুর্য্য যত অধিক পরিমাণে প্রকাশিত হয়, সেই স্বরূপের প্রতি জীব যেন ততই অধিক পরিমাণে আকর্ষণ অনুভব করিতে থাকে। ইতিপূর্ব্বে এই পৃথিবীর বুকে যত যত অবতারের আবির্ভাব ঘটিয়াছে সেই সেই অবতারে তাঁহার মাধুর্য্য যে পরিমাণে বিকশিত হইয়াছে, তাহা অপেক্ষা কলিপাবন অবতারী শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলায় মাধুর্য্যের প্রকাশ সর্ব্বাধিক। এই কারণেই সিংহ ব্যাঘ্রাদি হিংস্র পশু সমাজ হইতে আরম্ভ করিয়া মনুষ্য জাতি পর্য্যন্ত সমস্ত জীব সমষ্টি গৌর সুন্দরের প্রতি যে রূপ আকর্ষণ অনুভব করিয়াছে, এমনটী ইতিপূর্ব্বে পৃথিবীর ইতিহাসে আর কখনও ঘটে নাই। সন্ন্যাস প্রাপ্তির নিবেদন লইয়া গৌর সুন্দর যখন ভারতীর চরণাগ্রে পতিত হইলেন,—তখন ভারতীও বিচলিত হইয়া উঠিলেন। এই অপরূপ সচল সুবর্ণ বিগ্রহটীর চাঁচর-চিকুর শোভিত শির মুণ্ডণ করাইয়া, কৌপীন পরাইয়া কৃচ্ছ সাধনার ব্রত দিয়া তাঁহাকে বৃক্ষতলবাসী করিতে হইবে ভাবিয়া তিনিও গভীর বেদনায় উদ্বেলিত হইয়া উঠিলেন। ভারতী অশ্রুত্যাগ করিতে করিতে বিষণ্ন বদনে তাঁহাকে সন্ন্যাস দিতে অস্বীকার করিলেন। ক্ষৌরিকও সেই সঙ্গে শির মুণ্ডন কর্ম্মে নিযুক্ত হইতে অস্বীকার

করিল। এই অভাবনীয় সংবাদ লোক মুখে প্রচারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সমস্ত কাটোয়াবাসী একযোগে ছুটিয়া আসিলেন। অল্পকালের মধ্যেই সংখ্যাতীত স্ত্রী পুরুষের সমাগমে ভারতীর আশ্রম একপ্রকার জন-সমুদ্রে পরিণত হইল। কুল-বধূগণ নীরবে শিরে করাঘাত করিতে করিতে অদূরে দাঁড়াইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন, আর মধ্যে মধ্যে গৌর সুন্দরের শ্রীঅঙ্গ এবং অপরূপ কেশ কলাপের প্রতি সকাতরে দৃষ্টিপাত করিতে করিতে মৌন ভাষায় প্রতিবাদ জানাইতে লাগিলেন। বৃদ্ধ ও বৃদ্ধাগণের মধ্যে কেহ ভারতীর চরণে পড়িয়া, কেহ বা ক্ষৌরিকের করে ধরিয়া, আবার কেহ বা গৌর সুন্দরের করকমলে ধরিয়া এই অসহনীয় লীলা সংবরণ করিবার জন্য কাঁদিয়া কাঁদিয়া অনুরোধ জানাইতে লাগিলেন। অন্তরের আবেগ সহ্য করিতে না পারিয়া কেহ বা মূর্চ্ছিত হইয়া সেইখানেই লুটাইয়া পড়িলেন। কিন্তু শ্রীভগবানের আমোঘ ইচ্ছাশক্তির নিকটে জীবের প্রতিবাদ শক্তির কোনও মূল্য নাই। এই বিশাল জনতার সমবেত ক্রন্দন এবং হাহাকারের মধ্যেই গৌরসুন্দরের শির মুণ্ডিত হইল। সূক্ষ্ম পট্ট বস্ত্রের পরিবর্ত্তে গৈরিক কৌপীন বহির্বাস শ্রীঅঙ্গের ভূষণ হইল। করকমলে দণ্ড, কমণ্ডলু এবং স্কন্ধে ভিক্ষার ঝোলা লইয়া তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন: বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি শ্রীভগবান এইরূপে জীবের মঙ্গলের জন্য পৃথিবীতে আসিয়া বৃক্ষতলবাসী হইলেন।

এদিকে উন্মত্ত-প্রায় গঙ্গাধর ছুটিতে ছুটিতে ঠিক এই সময় ভারতীর আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বিহ্বল জনতাকে দুই বাহু দ্বারা সরাইতে সরাইতে তিনি একেবারে গৌর সুন্দরের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়া পড়িলেন। নয়নে নয়নে মিলন হইল। প্রভুর নয়ন দ্বার দিয়া যেন করুণার অমিয় ধারা ঝরিতে লাগিল। নয়ন যুগল বিস্ফারিত করিয়া ভট্টাচার্য্য দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া তাঁহার সারা জীবনের প্রত্যাশিত সেই গৌর রূপ সুধা, অতৃপ্ত লালসায় পান করিতে লাগিলেন, হৃদয় হইতে এক অপূর্ব্ব আনন্দের তরঙ্গ উঠিয়া তাঁহাকে

একেবারে অবশ করিয়া দিল। কিন্তু এই আনন্দ স্থায়ী হইল না, গৈরিক বহির্বাস, মুণ্ডিত মস্তক, দণ্ড কমণ্ডলু এবং ভিক্ষার ঝোলার প্রতি দৃষ্টি পড়িতেই তাঁহার ভাবান্তর ঘটিল এবং সহসা আর্ত্তনাদ সহকারে ভট্টাচার্য্য মূর্চ্ছিত হইয়া ধরণীতলে লুটাইয়া পড়িলেন। বহুক্ষণ অচেতন অবস্থায় থাকিবার পর অর্দ্ধ বাহ্য দশা প্রাপ্ত হইয়া তেমনই পড়িয়া রহিলেন এবং আচ্ছন্নের ন্যায় থাকিয়া তিনি যেন শুনিলেন ভারতী এই নবীন সন্ন্যাসীর নামকরণ করিলেন 'শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য'; কিন্তু অপ্রকৃতিস্থ অবস্থায় গঙ্গাধর শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য স্থলে সম্ভবতঃ শ্রীচৈতন্য শুনিলেন। সেই অবস্থায় পড়িয়া পড়িয়া ভট্টাচার্য্য শ্রীচৈতন্য নামটি কয়েকবার আপন মনে আবৃত্তি করিলেন, পড়িয়া প'ড়য়া কিছুক্ষণ কাঁদিলেন। তাহার পর অকস্মাৎ উঠিয়া শ্রীচৈতন্য, শ্রীচৈতন্য এই নাম উচ্চারণ করিতে করিতে গঙ্গাতীর দিয়া পুনরায় চাকন্দী অভিমুখে ছুটিয়া চলিলেন। করুণাময় প্রভু সস্নেহ দৃষ্টিতে সেই পথের দিকে চাহিয়া রহিলেন।*

অনাহারে অনিদ্রায় ক্রমাগত ছুটিতে ছুটিতে ভট্টাচার্য্য অবশেষে চাকন্দী গ্রামে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং সেইদিন হইতে উন্মত্তের ন্যায় শ্রীচৈতন্য শ্রীচৈতন্য এই নাম উচ্চারণ করিতে করিতে গ্রামের পথে পথে ঘুরিতে লাগিলেন। গ্রামবাসীগণ বুঝিলেন গঙ্গাধর পাগল হইয়া গিয়াছেন। গৌর সুন্দরের সন্ন্যাস গ্রহণের কথাও ধীরে ধীরে চাকন্দী-গ্রামে আসিয়া পৌছিল। সন্নাস গ্রহণ করিয়া তিনি শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নাম ধারণ করিয়াছেন, তাহাও সকলে শুনিলেন। গঙ্গাধরের উন্মত্ততার প্রকৃত কারণ এই ঘটনার সহিত বিজড়িত এই কথা যখন

* ১৪৩১ শকাব্দা মকর সংক্রান্তির পূর্ব্বদিন শেষ রাত্রে শ্রীমন্মহাপ্রভু গৃহত্যাগ করিয়া সংক্রান্তির প্রাতঃকালে কাটোয়াতে উপনীত হন, সেইদিন, এবং ১লা মাঘ সমস্ত দিন অগণিত জন সমাগম রোদন কীর্ত্তন নর্ত্তনাদির মধ্যে অতিবাহিত করিয়া ঐদিন সন্ধ্যাকালে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। উপরোক্ত ঘটনা সেই তারিখেই অনুষ্ঠিত হয়।

তাঁহারা শুনিলেন তখন হইতেই উন্মত্ত গঙ্গাধরকে সকলে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতে লাগিলেন। নিরবচ্ছিন্ন ভাবে শ্রীচৈতন্য নাম উচ্চারণ করিতে দেখিয়া সকলে তাঁহাকে শ্রীচৈতন্যদাস বলিয়া ডাকিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহাকে শ্রীচৈতন্যদাস বলিয়া কেহ ডাকিলে তিনিও আনন্দ লাভ করিতেন। ক্রমে গঙ্গাধর নামটী ধীরে ধীরে সকলের স্মৃতি হইতে মুছিয়া গেল ; গঙ্গাধর এখন হইতে শ্রীচৈতন্যদাস হইলেন।

কাটোয়ার নিকটবর্ত্তী যাজিগ্রামে বলরাম আচার্য্য নামে জনৈক বিশিষ্ট ব্রাহ্মণের বসতি ছিল, পাণ্ডিত্য সদাচার এবং সরলতার গুণে তিনি সকলেরই শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। তাঁহার লক্ষ্মীপ্রিয়া নাম্নী অপরূপা এবং সর্ব্ব গুণালঙ্কৃতা এক কন্যা ছিলেন। কন্যার বিবাহকাল সমাগত হইলে আচার্য্য যথাযোগ্য পাত্রের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হন এবং অবশেষে প্রাকৃত সম্পদ বিহীন হইলেও অপ্রাকৃত মহাসম্পদের অধিকারী, সর্ব্ব সদ্‌গুণ বিভূষিত চাকন্দী গ্রামবাসী পরম রূপবান যুবক এই গঙ্গাধরকে জামাতারূপে মনোনীত করেন। যথা সময়ে বিবাহ কার্য্যও সমাপ্ত হয়। ভক্তিমতী লক্ষ্মীপ্রিয়া দেবী নিজ ভাব ও সংস্কারের অনুকূল পরম বৈষ্ণব গঙ্গাধরকে পতিরূপে লাভ করিয়া, এবম্বিধ যোগাযোগ রচনাকারী জগদীশ্বরের চরণে কৃতজ্ঞচিত্তে প্রণতি জানাইয়া তাঁহার সহিত চাকন্দী অলঙ্কৃত করিলেন এবং কায়মনোবাক্যে তাঁহার চরণে আত্মসমর্পণ করিয়া পতি সেবায় আত্ম নিয়োগ করিলেন। গঙ্গাধরের এই উদ্বাহ কার্য্য কাটোয়ায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর সহিত মিলিত হইবার পূর্ব্বেই ঘটিয়াছিল এবং ঘটনাচক্রে পড়িয়াই যেন বিবাহ করিয়াছিলেন। তিনি নিরন্তর ভগবত ভাবে বিভোর থাকিতেন। সংসার বা দেহ পরিচর্য্যার প্রতি তাঁহার দৃষ্টি মাত্রও ছিল না। বিবাহের পরবর্ত্তীকালেও তাঁহার মানসিক অবস্থার কিছুমাত্র পরিবর্ত্তন দেখা গেল না। যাহা হউক লক্ষ্মীপ্রিয়া দেবী আসিয়া পতি এবং সংসার পরিচর্য্যার যাবতীয় ভার আপনার হস্তে তুলিয়া লইলেন। তাঁহার সেবা কুশলতায় কিছুকাল পরম শান্তিতে অতিবাহিত হইলে পর—গঙ্গাধর একদিন শ্রীমন্মহাপ্রভুর

শ্রীচরণ দর্শন মানসে নবদ্বীপ যাইবার পথে নিজ অভিষ্ট দেবের সন্ন্যাস মূর্ত্তি দেখিয়া যখন অর্দ্ধোন্মত্ত হইয়া ফিরিয়া আসিলেন তখন, এই আত্ম-ভোলা স্বামীকে দেখিয়া দেবী অতিশয় চিন্তান্বিতা হইয়া পড়িলেন। তিনি বুঝিলেন প্রভুর সন্ন্যাস মূর্ত্তি দর্শন করিয়া যে আঘাত পাইয়াছেন, তাহার বেগ সহ্য করিতে না পারিয়াই তিনি এইরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছেন। দেবী বহু যত্নে পরিচর্য্যার দ্বারা তাঁহাকে সুস্থ করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

লক্ষ্মীপ্রিয়া দেবীর প্রচেষ্টায় গঙ্গাধর ভট্টাচার্য্য কিছু দিনের মধ্যে অপেক্ষাকৃত স্থির এবং সংযত হইলেন। নির্জনে গৌর চিন্তায় অথবা লক্ষ্মীপ্রিয়া দেবী এবং অন্তরঙ্গ ভক্তগণের সহিত গৌর প্রসঙ্গের মধ্যে তাঁহার দিন পরমানন্দে অতিবাহিত হইতে লাগিল। কিন্তু প্রভুর ইচ্ছা অন্যরূপ। আর সেই ইচ্ছার বিরুদ্ধে তৃণ খণ্ডটীও ছেদন করিবার সামর্থ্য কাহারও নাই। সেই অমোঘ ইচ্ছাশক্তি আকুমার সন্ন্যাসী শ্রীমন্নিত্যানন্দকে সংসারে প্রবেশ করাইয়াছে, শ্রীরূপ, সনাতন, দাস রঘুনাথকে গৃহত্যাগ করাইয়াছে। দশ সহস্র সন্ন্যাসীর আচার্য্য মায়াবাদী প্রকাশানন্দকে বহির্বাস পরাইয়া বৃন্দাবনবাসী করাইয়াছে। কর্ম্ম সংস্কার মুক্ত মায়া-গ্রন্থিহীন নিত্য পার্ষদ তাঁহারা, প্রভুর লীলার সহায়তা করিবার জন্য তাঁহার অবতীর্ণ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ইঁহারা তাঁহারই ইঙ্গিত ক্রমে আবির্ভূত হন, এবং তিনি যাঁহার দ্বারা যে কার্য্য সাধন করিবার ইচ্ছা করেন, তাঁহাকে সেই সেই কার্য্যে নিযুক্ত করেন। সেই সেই কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া ইঁহারাও প্রভুর আদেশ পালন করিয়া আপনাদিগকে কৃতার্থ জ্ঞান করেন। গঙ্গাধর এখন শ্রীচৈতন্য দাস হইয়াছেন। সাংসারিক এবং দৈহিক ব্যাপারে তাঁহার আজন্ম উদাসীনতা। সেই উদাসীনতা ক্রমে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে। বিবাহের পর বহুদিন অতীত হইয়াছে, এ যাবৎকাল পর্য্যন্ত তাঁহাদের কোন সন্তানাদি হয় নাই, সে সম্বন্ধে কোন কামনাও স্বামী স্ত্রীর মনে কোনও দিন উদিত হয় নাই। এখন সন্তান প্রাপ্তির কালও অতীত হইয়াছে।

এতদিন পরে আজ শ্রীচৈতন্য দাসের মনে প্রভুর প্রেরণায় সন্তান কামনা জাগিয়া উঠিল। আবার লক্ষ্মীপ্রিয়া দেবীর অন্তরেও সেই ক্ষুধা। শ্রীমন্মহাপ্রভু ব্যতীত তাঁহারা আর কিছু জানেন না। যাবতীয় বিষয়ের আবেদন নিবেদন দাবী দাওয়া যাহা কিছু সমস্তই প্রভুর শ্রীচরণে সমর্পিত হয়। একদিন স্বামী স্ত্রী উভয়ে মিলিয়া পরামর্শ করিলেন যে শ্রীধাম পুরীতে গিয়া তাঁহারা তাঁহাদের মনের এই কামনার কথা প্রভুর চরণে নিবেদন করিবেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভু ইতিপূর্ব্বে সমগ্র দাক্ষিণাত্য ভ্রমণ ও নিজ নাম প্রেম বিতরণ কার্য্য শেষ করিয়া শ্রীক্ষেত্রে পুনঃ পদার্পণ করিয়াছেন। শ্রীমৎ অদ্বৈত প্রভু এবং অন্যান্য গৌড়ীয় ভক্তগণ প্রভুর আগমন সংবাদ অবগত হইয়া তাঁহার শ্রীচরণ দর্শনার্থে যথাকালে নীলাচল অভিমুখে যাত্রা করিলেন। শ্রীচৈতন্য দাস এবং লক্ষ্মীপ্রিয়া দেবী চাকন্দী হইতে যাজিগ্রামে আসিয়া কয়েকদিন অবস্থান করিলেন। পরে শ্রীক্ষেত্রগামী ভক্ত বৃন্দের সহিত একদিন উভয়েই শ্রীক্ষেত্র অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

শ্রীনাম সঙ্কীর্ত্তন করিতে করিতে গৌড়ীয় ভক্তবৃন্দ যথাসময়ে শ্রীক্ষেত্রের দ্বারদেশে উপস্থিত হইলেন। সেই সঙ্কীর্ত্তনের ধ্বনি শ্রবণ করিয়া প্রভু বুঝিলেন গৌড়ীয় ভক্তগণ আসিয়াছেন, স্থানীয় ভক্তগণের হস্তে প্রসাদী মাল্যাদি দিয়া প্রভু গৌড়ীয়গণকে সাদরে আমন্ত্রণ করিয়া লইয়া আসিবার নিমিত্ত পাঠাইয়া দিলেন এবং নিজেও ব্যগ্রতাবশতঃ গৃহে বসিয়া অপেক্ষা করিতে না পারিয়া অগ্রসর হইয়া আসিলেন। শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের মন্দিরের সম্মুখে প্রভুর সহিত তাঁহাদের মিলন হইল। বহুদিনের অদর্শন-বেদনা বুকে লইয়া শ্রীচৈতন্য দাস আসিয়াছেন। অন্যান্য ভক্তবৃন্দের ন্যায় আসিয়া তিনিও প্রভুর চরণে সাষ্টাঙ্গে প্রণত হইলেন। প্রভু সাদরে শ্রীচৈতন্য দাসকে উঠাইয়া হৃদয়ে ধারণ করিলেন। প্রভু ও ভৃত্য, উভয়ের নয়নে প্রেম বারি বহিতে লাগিল। সন্ন্যাস গ্রহণের পর হইতে কোনও স্ত্রীলোক প্রভুর

চরণ স্পর্শ করিতে অথবা সম্মুখে দাঁড়াইতে সাহস পাইতেন না। লক্ষ্মীপ্রিয়া দেবীও নিকটে না আসিয়া অন্যান্য রমণীগণের সহিত দূর হইতে শ্রীচরণ দর্শন করিয়া দণ্ডবৎ করিলেন। সমাগত ভক্তবৃন্দের শ্রীজগন্নাথ দর্শন, প্রসাদ সেবন এবং বিশ্রামের ব্যবস্থা করিয়া দিবার ভার বাণীনাথের উপরে সমর্পণ করিয়া দিয়া প্রভু আপন শ্রীঅঙ্গ সেবক গোবিন্দকে নিকটে ডাকিলেন এবং শ্রীচৈতন্য দাসকে দেখাইয়া আদেশ করিলেন—'গোবিন্দ। এই ব্রাহ্মণ অতি সরল এবং নিরীহ, তুমি নিজে ইঁহাকে শ্রীজগন্নাথ দর্শন করাইবে। আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থাও করিয়া দিবে। সর্ব্বদা সতর্ক দৃষ্টি রাখিবে যাহাতে ইঁহাদের কোনও বিষয়ে কোনও রূপ অসুবিধা না হয়। অতঃপর শ্রীচৈতন্য দাস প্রভু এবং অন্যান্য ভক্তবৃন্দের চরণে প্রণাম জানাইয়া পত্নীকে লইয়া গোবিন্দের সহিত শ্রীজগন্নাথ দর্শনান্তে প্রসাদ সেবন করিয়া যথাযোগ্য স্থানে আসিয়া বিশ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন। প্রভুর চরণাশ্রয়ে তাঁহাদের দিন পরমানন্দে অতিবাহিত হইতে লাগিল।

এইরূপে কিছুদিন গত হইল। ইঁহাদের শ্রীক্ষেত্র আগমনের কারণ কেহ জানেন না। তাঁহাদের আগমনের তাৎপর্য্য কি, সেই বিষয় লইয়া ভক্তগণের মধ্যে মাঝে মাঝে আলোচনা হয়। কিন্তু তাঁহারা কোনও প্রকার সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন না। সঙ্কোচ বশতঃ ব্রাহ্মণ দম্পতীও কিছু বলিতে পারেন না আর প্রভুর চরণে তাঁহাদের কামনার বিষয় নিবেদন করিতেও সাহস পান না। স্বামী স্ত্রী মিলিত হইয়া মধ্যে মধ্যে সেই বিষয়ে গোপনেই আলোচনা করেন এবং মনে মনে অন্তর্য্যামী প্রভু ও শ্রীজগন্নাথ দেবের চরণে প্রার্থনা করেন। এইরূপেই দিন কাটিয়া যায়। কিন্তু যাঁহাদের শ্রীচরণে তাঁহারা প্রার্থনা নিবেদন করিতে আসিয়া ছিলেন, সে প্রার্থনা নীরবেই তাঁহাদের কর্ণ গোচর হইয়াছিল। শ্রীজগন্নাথ দেব একদিন স্বপ্নে আবির্ভূত হইয়া শ্রীচৈতন্য দাসকে বলিলেন— তুমি গৃহে গমন কর, অল্পকালের মধ্যেই তোমরা তোমাদের কামনা অনুযায়ী সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর

পুত্র লাভ করিবে। অসাধারণ প্রেম এবং পাণ্ডিত্যের অধিকারী হইয়া সেই সন্তান তোমার বংশ ধন্য করিবে।" পরদিন প্রত্যুষে উঠিয়া আনন্দাশ্রু বিগলিত নয়নে কাঁদিতে কাঁদিতে চৈতন্য দাস সেই স্বপ্ন বিবরণটী পত্নীকে শ্রবণ করাইতেছেন, এমন সময় প্রভুর শ্রীঅঙ্গ সেবক গোবিন্দ আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং হাসিতে হাসিতে বলিলেন—"তোমাদের মনোরথ প্রভুর গোচর হইয়াছে; অনতিকাল মধ্যেই তোমরা এক অমূল্য পুত্ররত্ন লাভ করিবে। প্রভুর বিশুদ্ধ প্রেম হৃদয়ে ধারণ করিয়া সেই সন্তান আবির্ভূত হইবে। অতএব কোনও প্রকার চিন্তা না করিয়া অবিলম্বে গৃহে প্রত্যাগমন কর সর্ব্বদা নাম সঙ্কীর্ত্তনে নিযুক্ত থাকিয়া দিন অতিবাহিত করিবে। প্রভুর আদেশ ক্রমে আমি তোমাদিগকে সংবাদ দিতে আসিলাম।" এই দুইটী অচিন্ত্য ঘটনার সমাবেশে, আনন্দে ও বিস্ময়ে আত্মহারা হইয়া ব্রাহ্মণ দম্পতী ভক্ত বাঞ্ছাপূর্ণকারী প্রভুর শ্রীচরণে পুনঃ পুনঃ দণ্ডবৎ জানাইতে লাগিলেন।

অতঃপর প্রভুর আদেশ অনুসারে তাঁহারা শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেব ও প্রভুর চরণে সাষ্টাঙ্গ প্রণতি পূর্ব্বক শেষ বিদায় গ্রহণ করিয়া স্বদেশাভিমুখে যাত্রা করিলেন। গৌড় দেশে পদার্পণ করিয়া তাঁহারা সর্ব্বাগ্রে যাজিগ্রামে বলরাম আচার্য্যের বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শ্রীজগন্নাথ দেব এবং প্রভুর আদেশ বার্ত্তা শ্রবণে আচার্য্য পরম সুখী হইলেন। যাজিগ্রামে কয়েকদিন থাকিয়া শ্রীচৈতন্য দাস পত্নীর সহিত যখন চাকন্দী অভিমুখে রওনা হইলেন তখন বিচ্ছেদ বেদনা সহ্য করিতে না পারিয়া দুহিতা এবং জামাতার সহিত আচার্য্যও তাঁহাদের সহযাত্রী হইলেন। সর্ব্বজনপ্রিয় ব্রাহ্মণ দম্পতীর দীর্ঘ অদর্শনে গ্রামবাসীগণ কাতর হইয়া পড়িয়াছিলেন, এখন উভয়কে স্বগ্রামে পাইয়া সকলেই আনন্দিত হইলেন। ইতিপূর্ব্বে শ্রীচৈতন্য দাস সর্ব্বদা স্বভাবতঃই ভগবৎ প্রসঙ্গে বিভোর হইয়া থাকিতেন। এখন আবার প্রভুর আদেশ পাইয়া অধিকতর উৎসাহ সহকারে

নাম সঙ্কীর্ত্তন রসে নিমগ্ন হইলেন। সন্তান প্রাপ্তি বিষয়ক কথাটী স্বামী-স্ত্রী এবং আচার্য্যের মনে গোপনেই রহিল। কথিত আছে প্রভুর ইঙ্গিত অনুসারে ভট্টাচার্য্য নীলাচল হইতে আসিয়া সাতদিন যাবৎ পুত্র কামনার সঙ্কল্প লইয়া গঙ্গাতীরে পুরশ্চরণ করিয়াছিলেন।

কিছুদিনের মধ্যেই ব্রাহ্মণ দম্পতীর মনোবাসনা পূর্ণ হইল। লক্ষ্মীপ্রিয়া দেবী অন্তর্ব্বত্নী হইলেন। তাঁহার দেহে অপরূপ রূপলাবণ্যের বিকাশ দেখিয়া নারীগণ বিস্মিতা হইলেন এবং পরে তাঁহাকে অন্তর্ব্বত্নী জানিতে পারিয়া পরম পুলকিত হইলেন। ইঁহাদের সহজ প্রীতিপূর্ণ ব্যবহারে গ্রামবাসীগণ সকলেই ইঁহাদের সহিত পরম আত্মীয়ের ন্যায় ব্যবহার করেন। লক্ষ্মীপ্রিয়া দেবীকে নিঃসন্তান দেখিয়া প্রতিবেশিনীরা সকলেই দুঃখিতা ছিলেন। এখন তাঁহার সন্তান সম্ভাবনার কথা শ্রবণ করিয়া পরম আনন্দে প্রচুর উপঢৌকনাদি সহ তাঁহাকে দর্শন করিয়া গেলেন। বহুবিধ দ্রব্য সম্ভারে ভট্টাচার্য্যের গৃহ পূর্ণ হইয়া উঠিল।

দশ মাস অতিক্রম করিলে প্রসবকাল সমাগত হইল। ১৪৪১* শকে শুভ বৈশাখী পূর্ণিমা দিবসে রোহিনী নক্ষত্রে লক্ষ্মীপ্রিয়া দেবীর গর্ভে চম্পক বর্ণ বিশিষ্ট পরম রূপবান এক অপরূপ শিশু জন্মগ্রহণ করিলেন। সংবাদ শ্রবণ মাত্র প্রতিবেশিনীগণ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। জাতকের অসাধারণ সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্য দর্শন করিয়া সকলে বিস্ময়ে বিমুগ্ধা হইলেন এবং আনন্দে আত্মহারা হইয়া উলুধ্বনি ও শঙ্খধ্বনি করিতে লাগিলেন, পরে ধান্য ও দুর্ব্বাদি দ্বারা আশীর্ব্বাদ করতঃ কৌলিক প্রথা অনুসারে বহুবিধ মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানের দ্বারা সকলে সদ্যোজাত শিশুকে বরণ করিয়া লইলেন। গ্রামবাসী সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ বহুবিধ যৌতুকাদি সহ আসিয়া দেখিয়া গেলেন। ব্রাহ্মণগণের বেদ পাঠ এবং অন্যান্য সকলের কণ্ঠোদ্গীর্ণ নাম সঙ্কীর্ত্তনের ধ্বনিতে ভট্টাচার্য্যের গৃহ মুখরিত হইয়া উঠিল।

* 'ইতিহাস প্রসঙ্গ" দ্রষ্টব্য।

প্রভুর কৃপায় এইরূপ সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর ও সর্ব্বসুলক্ষণ যুক্ত সন্তান লাভ করিয়া ব্রাহ্মণ দম্পতী আনন্দে আত্ম-হারা হইয়া পড়িলেন। যাঁহার কৃপা প্রেরণায় সন্তান লাভ লইল, কায়মনোবাক্যে সেই মঙ্গলময় প্রভুর চরণে তাহাকে সর্ব্বান্তঃকরণে সমপর্ণ করিয়া দিলেন। পরমানন্দে দিন অতিবাহিত হইতে লাগিল। নবজাত শিশু ক্রমে বলিষ্ঠ এবং বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন। তাঁহার অঙ্গের সৌন্দর্য্য, মাধুর্য্য, মনোমুগ্ধকর অঙ্গ-ভঙ্গী এবং চাঞ্চল্যও সেই অনুপাতে বাড়িতে লাগিল। অন্নপ্রাশনের কাল উপস্থিত হইলে শ্রীচৈতন্য দাস গ্রামবাসীগণের স্বেচ্ছাকৃত সহযোগিতায় পরম সমারোহের সহিত অন্নপ্রাশন এবং নাম করণ কার্য্য সুসম্পন্ন কারলেন। অপূর্ব্ব শ্রীসম্পন্নরূপ এবং মাধুর্য্যময়ী মূর্ত্তি দেখিয়া শ্রীচৈতন্য দাস সর্ব্বসম্মতি ক্রমে সন্তানের নাম রাখিলেন শ্রীনিবাস।

কালচক্র চলিতে লাগিল, সঙ্গে সঙ্গে শ্রীনিবাসও বয়ঃপ্রাপ্ত হইতে লাগিলেন। প্রতিবেশিনীগণ এই সর্ব্বচিত্তাকর্ষক অপরূপ শিশুটীকে পাইয়া যেন আনন্দে মাতিয়া উঠিলেন। গৃহ কার্য্যের অনিবার্য্য ব্যস্ততা বশতঃ তাঁহারা সর্বসময়ে শিশুটীকে লইয়া থাকিতে পারেন না। আবার অধিক ক্ষণ না দেখিলেও মন চঞ্চল হইয়া উঠে। সুতরাং কোনও প্রকারে গৃহকর্ম্ম হইতে অবসর পাইলেই তাঁহারা সব ফেলিয়া ছুটিয়া আসেন এবং শ্রীনিবাসকে বুকে জড়াইয়া ধরেন। রাত্রিকাল ব্যতীত জননী লক্ষ্মীপ্রিয়া দেবীর পক্ষে সন্তানকে একান্তে পাইবার আর বিশেষ কোন সুযোগই রহিল না। হামা দিতে শিখিয়া অবধি শ্রীনিবাসের স্বাভাবিক চাঞ্চল্য যেন আরও বাড়িয়া উঠিল এবং ক্রোড়ে ধারণ করিয়া রাখা ক্রমেই যেন অসম্ভব হইয়া পড়িল। ক্রোড়ে ধরিয়া রাখিতে গেলেই পরম বিরক্তি এবং বিদ্রোহ প্রকাশ পূর্ব্বক ভূমিতে অবতরণ করিয়া শ্রীনিবাস যখন অঙ্গনময় 'হামা' দিয়া বেড়াইতেন তখন প্রতিবেশিনীগণ স্নেহ সজল দৃষ্টিতে তাঁহার প্রতি চাহিয়া দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া দেখিতেন। কখনও বা চঞ্চল

শিশুর অবাধ্যতায় কপট ক্রোধ প্রকাশ করিয়া তাঁহারা দুরন্ত শিশুর পশ্চাৎ পশ্চাৎ তাড়া করিয়া যাইতেন, আর শ্রীনিবাস তাঁহাদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে করিতে দ্রুত অঙ্গনময় ঘুরিয়া বেড়াইতেন। কিন্তু ক্ষুদ্র শিশু কতক্ষণ আর ছুটিবে, ক্লান্ত হইলে তাঁহারা তাঁহাকে কোলে তুলিয়া লইয়া স্নেহাতিশয্যে পুনঃ পুনঃ চুম্বনাদি দ্বারা তাঁহাকে বিব্রত করিয়া তুলিতেন। শ্রীনিবাস পরাজিত হইয়া অবশেষে তাঁহাদের নিকট আত্মসমর্পণ করিতেন। কখনও বা কৌতুকময় হাস্য সহকারে রমণীগণের উল্লাসের মাত্রা বৃদ্ধি করিয়া দিতেন।

ক্রমে শ্রীনিবাসের বাক্য স্ফূর্ত্তি হইল। অর্দ্ধস্ফুট কণ্ঠে 'মা' 'মা' বলিতে শিখিলেন। ভাষা আয়ত্তে নাই, কিন্তু তাহাতে শ্রীনিবাসের কোনও অসুবিধা নাই। কখনও আপনা আপনি কখনও বা অপরের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া তাঁহার সেই অর্থ-হীন বাক্যালাপ নিরন্তর চলিতে লাগিল। তাঁহার সেই কথন প্রচেষ্টা দেখিয়া সকলে সকৌতুকে হাসিয়া উঠিতেন। জননী সুযোগমত শ্রীনিবাসকে লইয়া একান্তে বসিতেন এবং নানা প্রকার ছল চাতুরীর দ্বারা শান্ত করিয়া যখনই গৌর এবং গৌর পরিকরগণের নামাবলীর সহিত পরিচয় করাইয়া দিতে চেষ্টা করিতেন, * তখনই মাতৃদেবী পরম আশ্চর্য্য সহকারে লক্ষ্য করিতেন যে, শিশু সমস্ত চাঞ্চল্য পরিত্যাগ করিয়া তাহা উৎকর্ণ হইয়া শ্রবণ করিতেছেন এবং নামগুলি উচ্চারণ করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন। তখন তাঁহার মুখে কখনও কারুণ্য কখনও গাম্ভীর্য্য আবার কখনও বা উদাসীনতার অভিব্যক্তি ফুটিয়া উঠিত, তিনি কেমন যেন ব্যগ্র হইয়া পড়িতেন।

---

* ওরে বাপ বল দেখি গৌর বিশ্বম্ভর।
লক্ষ্মী বিষ্ণুপ্রিয়া পতি শচীর কুমার॥
গদাধর প্রাণনাথ শ্রীশ্রীবাসেশ্বর।
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নিত্যানন্দ হলধর॥ ইত্যাদি ভঃ রঃ

শ্রীনিবাস হাঁটিতে শিখিলেন। শৈশবাবস্থা হইতে জননী এবং রমণীগণের মুখে এতদিন যে নামগুলি শ্রবণ করিয়া আসিয়াছেন, সেই গৌর এবং গৌর পরিকরগণের নামগুলি তাঁহার কণ্ঠের ভূষণ হইল। বিভোর হইয়া কোমল কণ্ঠে নামগুলি উচ্চারণ করিতে করিতে শ্রীনিবাস যখন নৃত্য করিতেন তখন সকলে বিস্মিত ও মুগ্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া দেখিতেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর অশেষ করুণায় গৌরভক্ত শিশুকে পুত্র রূপে লাভ করিয়াছি মনে করিয়া শ্রীচৈতন্য দাস ও লক্ষ্মীপ্রিয়া দেবী আনন্দে অধীর হইতেন। পরমানন্দে দিন অতিবাহিত হইতে লাগিল। শ্রীনিবাস পঞ্চম বর্ষে উপনীত হইলেন; সঙ্গে সঙ্গে বালকের অন্তরে বিদ্যা লাভ করিবার ইচ্ছাও বলবতী হইল। পুত্রের আগ্রহ দর্শনে মুগ্ধ হইয়া শ্রীচৈতন্য দাস চাকন্দী নিবাসী পরম পণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় ধনঞ্জয় বাচস্পতি মহাশয়ের নিকটে শ্রীনিবাসকে অধ্যয়নার্থে নিযুক্ত করিলেন। পরম রূপলাবণ্যময় এই বালকটীকে ছাত্ররূপে লাভ করিয়া বাচস্পতি মহাশয়ও পরম আনন্দিত হইয়া বিশেষ যত্ন সহকারে তাঁহাকে বিদ্যাভ্যাস করাইতে লাগিলেন। এই বালককে কিছুদিন অধ্যয়ন করাইয়া বাচস্পতি মহাশয় বুঝিলেন, এই প্রকার সুতীক্ষ্ণ-বুদ্ধি ছাত্রকে ইতিপূর্ব্বে পাঠ দেওয়ার সৌভাগ্য তাঁহার হয় নাই। পরন্তু পাঠ বুঝাইয়া দেওয়া মাত্রেই শ্রুত বিষয় কণ্ঠস্থ করেন, এই প্রকার মেধাবী ছাত্রকে দর্শন করিবার সৌভাগ্যও তাঁহার হয় নাই। বাচস্পতি মহাশয় প্রাণপণ চেষ্টায় শ্রীনিবাসের অধ্যাপনায় আত্মনিয়োগ করিলেন। শ্রীনিবাসও বালকোচিত চাপল্য বর্জ্জন করিয়া অখণ্ড মনোযোগ সহকারে বিদ্যাভ্যাস করিতে লাগিলেন। ক্রমে বিদ্যারসে নিমগ্ন শ্রীনিবাসের চূড়াকরণ এবং উপনয়নের কাল সমাগত হইলে শ্রীচৈতন্য দাস শুভকাল নির্ব্বাচন করিয়া কার্য্য সুসম্পন্ন করিতে উদ্‌যোগী হইলেন। বালকের মস্তক মুণ্ডিত হইল। গৈরিক বসন, উপবীত, ভিক্ষার ঝোলা এবং দণ্ড ধারণ করিয়া শ্রীনিবাস ব্রহ্মচারী বেশে যখন দাঁড়াইলেন তখন সমবেত দর্শক মণ্ডলী

স্বভাব সুন্দর এই বালকের নয়নাভিরাম সৌন্দর্য্য দর্শনে মুগ্ধ ও কৃতার্থ হইলেন। উপনয়ন উৎসব উপলক্ষে সকলেই আনন্দে উন্মত্ত কিন্তু শ্রীনিবাসের মনে শান্তি নাই। অসাধারণ কার্য সম্পাদনের দায়িত্ব লইয়া যাঁহারা আবির্ভূত হন, তাঁহাদের অসাধারণ চরিত্রের পরিচয় অল্পবিস্তর লোকচক্ষে প্রকাশিত হইয়াই থাকে। দৈনন্দিন বিদ্যাভ্যাসের মধ্যে সাময়িক বিরতি, সাধারণ ছাত্রগণের পক্ষে পরম প্রত্যাশিত আনন্দ জনক ঘটনা। কিন্তু সেই সাময়িক পাঠ বিরতি বালক শ্রীনিবাসের মনে দুঃখের আগুন জ্বালিয়া দিল। এই উৎসবময় পরিবেশ তাঁহার অসহ্য বোধ হইল, অন্তরালে গিয়া শ্রীনিবাস ব্যাকুল ভাবে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। কথিত আছে—এই সময় বিদ্যাদেবী স্বয়ং আবির্ভূতা হইয়া তাঁহাকে আশ্বাস প্রদান পূর্ব্বক আশিস্ প্রদান করেন। সরস্বতীর কৃপায় শ্রীনিবাস উত্তরকালে সর্ব্বশাস্ত্রে পারদর্শী হন।

অসাধারণ মেধা এবং অধ্যবসায়ের ফলে শ্রীনিবাস অতি অল্প-কালের মধ্যে ব্যাকরণ-কোষ অলঙ্কার, কাব্য এবং যাবতীয় দর্শন শাস্ত্রে সুপণ্ডিত হইয়া উঠিলেন। পাণ্ডিত্যের সঙ্গে সঙ্গে ভগবৎ প্রেমানুরাগও উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে লাগিল। পাণ্ডিত্যের তেজোময় দীপ্তির সহিত ভগবৎ প্রেমের সুকোমল মাধুর্য্যের সংমিশ্রণে শ্রীনিবাসের চরিত্রটী এক অপরূপ মহিমাময় আকারে রূপায়িত হইয়া শোভা পাইতে লাগিল। স্থানীয় পণ্ডিত এবং সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের দৃষ্টি ধীরে ধীরে শ্রীনিবাসের উপর পড়িতে লাগিল।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর সন্ন্যাস গ্রহণের পর তাঁহার পরিকরগণের মধ্যে অনেকে বিরহ জ্বালায় অধীর হইয়া যতিধর্ম্ম অবলম্বন পূর্ব্বক প্রভুর সঙ্গে নীলাচল যাত্রা করেন, প্রভুর আদেশ অনুসারে কেহবা নবদ্বীপেই থাকিয়া যান। আবার কেহ কেহবা নবদ্বীপ ত্যাগ করিয়া বিভিন্ন স্থানে চলিয়া যান এবং নির্জ্জন বাস অবলম্বন পূর্ব্বক নিরপেক্ষ ভাবে ভজনে আত্ম নিয়োগ করেন। সময়ে সময়ে তাঁহারা পরস্পর মিলিত হইয়া

গৌর প্রসঙ্গে নিমগ্ন হ'ন, বহিরঙ্গ সমাজের সহিত তাঁহারা সংশ্রব বড় একটা রাখিতেন না। অগ্রদ্বীপে শ্রীগোপীনাথের সেবক গোবিন্দ ঘোষ প্রমুখ কয়েকজন গৌর পরিকর তখন চাকন্দী ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী গ্রামে বাস করিতেন। শ্রীনিবাসের পাণ্ডিত্য, ভগবৎ নিষ্ঠা এবং গৌর প্রীতির সংবাদ ক্রমে তাঁহাদের কর্ণ গোচর হইলে, তাঁহারাও শ্রীনিবাসের সহিত মিলিত হ'ন।

তখন শ্রীনিবাসের জন্ম হয় নাই। প্রভু একদিন নীলাচলে শ্রীজগন্নাথ দেবের মন্দিরে ভাবাবেশে নৃত্য করিতে করিতে অশ্রুসিক্ত কণ্ঠে, সপ্রেমে শ্রীনিবাস, শ্রীনিবাস—বলিয়া কাহাকে যেন আহ্বান করিলেন, তখন ইহার তাৎপর্য্য কেহ বুঝিতে না পারিয়া বিস্মিত হন, এবং সঙ্কীর্ত্তনান্তে এই বিষয়ে প্রভুকে জিজ্ঞাসা করিলে প্রভু বলিলেন—আমার বিশুদ্ধ প্রেম মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া অচিরাৎ চাকন্দী গ্রামে আবির্ভূত হইবে, প্রেম এবং ভক্তি শাস্ত্র প্রচার করিয়া সে সমগ্র দেশ প্রেমের বন্যায় নিমজ্জিত করিবে।" প্রভুর এই ভবিষ্যৎ বাণী শ্রবণ করিয়া সকলে আনন্দে আত্ম-হারা হন। এই ভবিষ্যৎ বাণীর কথা স্থানীয় ও বিদেশীয় সমুদয় ভক্তবৃন্দের নিকটে ক্রমেই ছড়াইয়া পড়ে। তখন হইতেই সকলে শ্রীনিবাসের আবির্ভাবের জন্য সাগ্রহে অপেক্ষা করিতেছিলেন। স্থানীয় ভক্তগণ আজ তাঁহাকে পাইয়া পরম সমাদরে আপন অন্তরঙ্গ গোষ্ঠীর মধ্যে টানিয়া লইলেন। তাঁহারা শ্রীনিবাসকে দেখিলেন ঠিক যেন—শ্রীমন্মহাপ্রভুর ন্যায় তাঁহার তপ্ত কাঞ্চনাভ অঙ্গের দ্যুতি, সুললিত পরিপুষ্ট অঙ্গ নব যৌবনের উন্মেষে ঝলমল করিতেছে। জ্ঞান ও পাণ্ডিত্যের প্রতিভায় মুখমণ্ডলে গাম্ভীর্য্যের অভিব্যক্তি, তদুপরি প্রেমানুরাগের অঞ্জন লাগিয়া নয়ন দ্বয় ঈষৎ রক্তিম ও সজল। একটী বিরাট উন্নতশির বনস্পতি প্রেম-ভক্তির সংমিশ্রণে যেন স্বর্ণ লতায় রূপান্তরিত হইয়া দীনতার ভারে ভূলুণ্ঠিত গতি লাভ করিয়াছে। সেই সঙ্গে বনস্পতির আভিজাত্যের চিহ্নগুলিও যেন অঙ্গ প্রত্যঙ্গে প্রকটিত হইয়া রহিয়াছে। গৌর

পরিকরগণ তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া 'গৌর অঙ্গ পরশের' অনুভূতিতে আপ্লুত হইলেন। প্রথম সাক্ষাতের দিনেই শ্রীনিবাস তাঁহাদিগকে প্রেমের সম্বন্ধ সূত্রে আবদ্ধ করিয়া ফেলিলেন। বিরহ কাতর গৌর পরিকরগণ এই গৌর প্রেমে পাগল শ্রীনিবাসকে পাইলেন। প্রাণ ভরিয়া গৌর কথা শ্রবণ করাইবার একটি উপযুক্ত শ্রোতা পাইয়া সকলে পরমানন্দে গৌর প্রসঙ্গে নিমগ্ন হইলেন। গৌর প্রসঙ্গে তাঁহাদের ক্লান্তি নাই। 'আবার গৌর রস—পিপাসু শ্রীনিবাসেরও সে বিষয়ে অবসাদ নাই, পরন্তু সেই প্রসঙ্গ শ্রবণ করিতে করিতে তাঁহার তৎবিষয়ে লোলুপতা এবং গৌর দর্শনের পিপাসা ক্রমে যেন বাড়িয়াই চলিল। গৌর পাগল শ্রীচৈতন্য দাস পুত্রের মনের গতি পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। পুত্রের অধ্যয়ন নিষ্ঠায় তিনি পরম তুষ্ট ছিলেন। কিন্তু এমনি করিয়া হৃদয়স্থ গৌর প্রেমের অবরুদ্ধ পেটিকাটি অকস্মাৎ খুলিয়া গিয়া পুত্রকে যে এইরূপ আছন্ন করিয়া দিবে, তাহা তিনি কল্পনাও করেন নাই। 'গৌর প্রেমিক সন্তানের পিতা হইবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছি'—এই কথা মনে করিয়া শ্রীচৈতন্য দাস আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করিতে লাগিলেন। যখনই তিনি শ্রীনিবাসকে কাছে পাইতেন, তখনই সস্নেহে বসাইতেন এবং পুত্রের মস্তকে ও সারা অঙ্গে হস্ত মার্জ্জন করিতে করিতে গৌর কথা শুনাইতেন। লীলা কথার আবেশে শ্রোতা ও বক্তার কখনও কখনও বাহ্য জ্ঞান লুপ্ত হইয়া যাইত, নয়নে প্রেম বারির বন্যা নামিত। একদিন কথা প্রসঙ্গে প্রভুর সন্ন্যাস গ্রহণের বিষয় লইয়া প্রসঙ্গ আরম্ভ হইল। কথা কহিতে কহিতে শ্রীচৈতন্য দাস ভাবাবেশে অধীর হইয়া পড়িলেন, অবশেষে আবেগ সহ্য করিতে না পারিয়া পিতা পুত্র উভয়েই সেদিন গভীর মূর্চ্ছায় আক্রান্ত হইয়া ধরণী তলে লুটাইয়া পড়িলেন।

মাতাপিতা মাত্রেই সন্তানের মঙ্গল কামনা করেন। কিন্তু সাধারণ মায়াচ্ছন্ন জীব সেই মঙ্গলের প্রকৃত স্বরূপ কি তাহা নির্ণয় করিতে গিয়া প্রথমেই ভুল করিয়া বসেন। ভগবৎ ভজনের মধ্যে যে

প্রাথমিক ত্যাগ সংযমাদির কৃচ্ছ্রতা রহিয়াছে, তাহাকে অতিক্রম করিতে পারিলেই যে নিরবিচ্ছিন্ন আনন্দ লাভ করা যায়, এই কথা বহু সুকৃতির অধিকারী ব্যতীত অপর কেহই বিশ্বাস করিতে পারেন না। সেই কারণে প্রায় সকলেই সেই পথ ত্যাগ করিয়া আপাতঃ সুখকর এই বিষয় সুখকেই জীবনের একমাত্র অবলম্বন বলিয়া মনে করেন, এবং সন্তান সন্ততিগণকেও তাঁহারা সেই পথে পরিচালিত করিতে সচেস্ট হন। কিন্তু চরম আনন্দের সংবাদটী যাঁহারা নির্ভুল ভাবে অবগত আছেন তাঁহাদের এই ভুল হইবে কেন? যে পথ অবলম্বন করিলে সন্তানগণ ভগবৎ রাজ্যে প্রবেশ করিতে পারিবে, সর্ব্বশক্তি প্রয়োগ করিয়া তাঁহারা তাহাদিগকে সেই পথেই পরিচালিত করিতে সচেস্ট হন। আবার ভজনানুকুল সংস্কার লইয়াই যে সকল সন্তান জন্ম গ্রহণ করেন, বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যখন তাহাদের হৃদয়স্থ প্রেম ভক্তির বিকাশ হয় তখন জনক জননী তাহা দর্শন করিয়া আনন্দে উন্মত্ত হন। সন্তান সন্ততিগণ সহ ভগবৎ ভজন ও নাম সঙ্কীর্ত্তনাদির দ্বারা তাঁহারা সপরিবারে আনন্দ সাগরে অবগাহন করিতে থাকেন। ভক্তিমান শ্রীনিবাসকে পাইয়া শ্রীচৈতন্য দাস ধন্য হইয়াছেন। আবার শ্রীচৈতন্য দাসকে পাইয়া শ্রীনিবাসও কৃতার্থ। গৌর কথা ও নাম প্রসঙ্গে পিতা পুত্রের দিন আনন্দে অতিবাহিত হইতে লাগিল। শ্রীচৈতন্য দাস কখনও গৌর কথা কখনও বা পরিকরগণের কথা, শ্রীনিবাসকে শ্রবণ করাইতে বসেন, আর শ্রোতা ও বক্তা উভয়েই কাঁদিয়া অধীর হন, বিরহ সহ্য করিতে না পারিয়া কখনও বা উভয়েই মূর্চ্ছিত হইয়া পড়েন। একদিন কথা প্রসঙ্গে শ্রীরূপ সনাতনের বিষয় বলিতে বলিতে শ্রীচৈতন্য দাস একেবারে কাতর হইয়া উঠিলেন এবং অশ্রু-সিক্ত কণ্ঠে তখন শ্রীনিবাসকে বলিতে লাগিলেন "বাবা শ্রীনিবাস! তুমি এখন বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়াছ। এইবার তোমার জননীকে লইয়া যাজিগ্রামে গিয়া বসবাস কর, আমার সারা জীবনের এই সাধ যে, শ্রীবৃন্দাবনে গিয়া শ্রীরূপসনাতনাদি প্রভুর অন্তরঙ্গগণের শ্রীচরণাশ্রয়ে

থাকিয়া অবশিষ্ট জীবন অতিবাহিত করি।” বলিতে বলিতে শ্রীচৈতন্য দাসের কণ্ঠ রুদ্ধ হইল। অবিরল নয়ন ধারায় মুখ বুক ভাসিয়া যাইতে লাগিল। শ্রীনিবাস পিতার চরণ-যুগল হৃদয়ে ধারণ করিয়া নয়নবারিতে ধৌত করিয়া দিতে লাগিলেন। দিন যাইতে লাগিল; সঙ্গে সঙ্গে শ্রীচৈতন্য দাসের শ্রীবৃন্দাবন গমনের ব্যাকুলতাও দিন দিন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে লগিল। কিন্তু প্রকট লীলার কাল তাঁহার সংক্ষেপ হইয়া আসিয়াছিল, এই শেষ ইচ্ছা পূর্ণ করিবার তাঁহার আর সুযোগ হইল না।

নরহরি-মিলন।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর পরিকরগণের মধ্যে যে কয়জন তাঁহার সহিত মধুর ভাবে সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া উপাসনায় সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন, শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুর মহাশয় তাঁহাদের অন্যতম। কাটোয়ার নিকটবর্ত্তী শ্রীখণ্ড গ্রামে বৈদ্য বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়া অতি শৈশবাবস্থা হইতে তিনি ভগবৎ ভজনে আত্মনিয়োগ করেন।* শ্রীমন্মহাপ্রভুর গয়া হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পর শ্রীশ্রীনামসঙ্কীর্ত্তনের বন্যায় তিনি যখন নদীয়াকে নিমজ্জিত করিলেন, তখন সরকার ঠাকুর মহাশয়ও আসিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হন। সুযোগ পাইলেই তিনি চামর হস্তে লইয়া প্রভুর পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইতেন এবং বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া ব্যজন করিতেন; আর অশ্রু ধারায় তাঁহার মুখ বুক ভাসিয়া যাইত। প্রভু নগর সংকীর্ত্তনে আবিষ্টভাবে নাচিতে নাচিতে যখন আছাড় খাইয়া পড়িতেন, তখন জননী শচী দেবীর আদেশে সরকার ঠাকুর মহাশয়

* দীনেশ সেন মহাশয়ের কৃত ‘বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের’ মতে সরকার ঠাকুর মহাশয়ের জন্ম ১৪০২ অথবা ১৪০৩ শকাব্দায়। গৌড়ীয় বৈষ্ণব জীবন বলেন ১৪০১ অথবা ১৪০২ শকাব্দায় সরকার ঠাকুর মহাশয়ের জন্ম। অন্যান্য ঐতিহাসিক গণের মতও প্রায় এইরূপ। সুতরাং ১৪০০শক হইতে ১৪০৩ শকের মধ্যে তাঁহার আবির্ভাব ধরিয়া লওয়া যায়।

তাঁহার শ্রীঅঙ্গ রক্ষার নিমিত্ত সর্ব্বদা পাশে পাশে থাকিতেন। আবার ভগবৎ ভাবে প্রভু যখন বিষ্ণু খট্টার উপরে উপবেশন করিতেন তখন তিনি আরতি করিতে করিতে অশ্রু ধারায় সিক্ত কলেবর হইতেন। আকুমার ব্রহ্মচারী সরকার ঠাকুর মহাশয়ের প্রতি প্রভু তাঁহার সমগ্র কৃপা শক্তিকে সমর্পণ করিয়া তাঁহাকে প্রেমে বিহ্বল করিয়া দিয়া ছিলেন। তাঁহার অপরূপ ভাব ও গৌর সেবায় আবেশ দেখিয়া সকলে তাঁহার প্রতি মুগ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিতেন। শ্রীখণ্ডের সরকার ভবনে শ্রীগৌর-বিষ্ণুপ্রিয়ার যে দারুময়ী যুগল মূর্ত্তি অদ্যাবধি সেবিত হইতেছেন, তাহা শ্রীসরকার ঠাকুর মহাশয়েরই প্রতিষ্ঠিত। পরিকরগণের মধ্যে তিনিই সর্ব্বপ্রথম প্রভুর যুগল মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া সেবা প্রকাশ করেন। প্রভুর জীবনীও সর্ব্বপ্রথম সরকার ঠাকুর মহাশয় কর্ত্তৃক রচিত হয়। ইঁহার ভ্রাতা মুকুন্দ সরকার মহাশয়ের পুত্র শ্রীরঘুনন্দন তাঁহার সেবক, ইনিও প্রভুর অন্তরঙ্গ পরিকরগণের অন্যতম।* শ্রীচৈতন্য মঙ্গল রচয়িতা শ্রীলোচনানন্দ দাস, সরকার ঠাকুর মহাশয়ের অন্যতম শিষ্য।

প্রভুর সন্ন্যাস গ্রহণের পর সরকার ঠাকুর মহাশয় গৌর বিরহে কাতর হইয়া নবদ্বীপ-বাস ত্যাগ করতঃ শ্রীখণ্ডে চলিয়া আসেন এবং প্রভুর বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা পূর্ব্বক তৎসেবায় আত্মনিয়োগ করিয়া কোনও প্রকারে কাল যাপন করিতেছিলেন। শ্রীনিবাসের কথা তিনিও শুনিয়াছেন, কিন্তু ইচ্ছা সত্ত্বেও নানা কারণে এতদিন তাঁহাকে

---

* রঘুনন্দন, সরকার ঠাকুর মহাশয়ের শিষ্য কিনা সে বিষয়ে মতভেদ আছে। ইনি মহাপ্রভুর স্বীকৃত পুত্র। অতি শৈশবে গৃহ দেবতা শ্রীগোপীনাথকে সাক্ষাৎ আবির্ভূত করাইয়া ভোজন করান। শ্রীখণ্ডে গোপীনাথের করস্থিত 'অর্দ্ধলড্ডুক' এখনও সেই স্মৃতি বহন করিতেছে। তাঁহার স্বরূপ নির্ণয় প্রসঙ্গে গৌরগণোদ্দেশ দীপিকা বলেন :—

ব্যূহস্তৃতীয়ঃ প্রদ্যুম্নঃ প্রিয়-নর্ম্ম-সখোভবন্।
চক্রে লীলা সহায়ং যো রাধামাধবয়োর্ব্রজে॥
শ্রীচৈতন্যাদ্বৈততনুঃ স এব রঘুনন্দনঃ। গৌঃ গঃ দীঃ

দেখিবার সুযোগ হইয়া উঠে নাই। শ্রীনিবাসও এতদিন শ্রীখণ্ডে গিয়া তাঁহার দর্শন লাভের সুযোগ করিয়া উঠিতে পারেন নাই। কিন্তু আকস্মিক ভাবেই একদিন পরস্পর সাক্ষাৎকারের সুযোগ আসিয়া গেল। কোনও প্রয়োজন বশতঃ শ্রীনিবাস একদিন যাজিগ্রামের পথে চলিয়াছেন, আর সেই সময় সরকার ঠাকুর মহাশয়ও গঙ্গাস্নানের অভিপ্রায়ে সেই পথ দিয়া যাইতেছেন, সেই পথের উপরেই উভয়ের সম্মিলন ঘটিয়া গেল। শ্রীনিবাস ইতিপূর্ব্বে পিতার নিকট হইতে সরকার ঠাকুর মহাশয়ের সকল কথাই শ্রবণ করিয়াছিলেন, তাঁহার মহিমার কথা শ্রীনিবাসের অজ্ঞাত নাই। দূর হইতে তাঁহাকে দেখিয়াই শ্রীনিবাস ছুটিয়া আসিলেন এবং তাঁহার চরণে লুটাইয়া পড়িলেন। সরকার ঠাকুর মহাশয়ও পরম স্নেহ সহকারে শ্রীনিবাসকে তুলিয়া হৃদয়ে ধারণ করিলেন।

শ্রীরাধার প্রেম মাধুরী আস্বাদনের নিমিত্ত তাঁহারই ভাব এবং কান্তি অঙ্গীকার করিয়া শ্রীকৃষ্ণ, নবদ্বীপে গৌরসুন্দর রূপে অবতীর্ণ হন। তাঁহার সেই উদ্দেশ্য পরিপূরণের জন্য ব্রজরামাগণও তাঁহার সহিত আসিয়া পরিকর স্বরূপে আবির্ভূত হইলেন। ব্রজলীলার অন্তরঙ্গা সহচরী শ্রীমধুমতী নদীয়ালীলায় আসিয়া সরকার ঠাকুর মহাশয় রূপে মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিলেন। সাক্ষাৎ 'যুগল-বিলাস'ও স্ব স্বরূপে আসিয়া ইঁহাতে মিলিত হন। গৌর সুন্দরকে 'যুগল-বিলাস' রস আস্বাদন করাইবার জন্যই যেন সেই অপূর্ব্ব বস্তুটী সরকার ঠাকুরমহাশয় রূপে নদীয়ায় আসিয়া মধুরভাব * অবলম্বন পূর্ব্বক

* পুরা মধুমতী প্রাণসখী বৃন্দাবনস্থিতা।
অধুনা নরহর্য্যাখ্যঃ সরকারঃ প্রভোঃ প্রিয়ঃ॥ গৌঃ গঃ দীঃ
'নরহরি বিলসই মোর'—নরোত্তমদাসের প্রার্থনা।
'যুগল বিলাস হ'য়ে মূর্তিমান, ধরে নরহরি নাম।
—শ্রীল রামদাস বাবাজী মহারাজ, নরহরি সূচকে।
'প্রেমের রমণী ভেল দাস নরহরি ॥' —নরোত্তমদাস।
'গৌর প্রেম রমণী নরহরি'
—নরহরি সূচকে শ্রীলরামদাস বাবাজী মহারাজ।

প্রভুর পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু আজ নীলাচলবাসী সন্ন্যাসী; গৌর-নাগরী নরহরির অন্তর দিবারাত্র বিরহানলে জ্বলিতেছে। আজ সেই গৌর সুন্দরের শুদ্ধ প্রেম শ্রীনিবাস রূপে মূর্ত্তিমান হইয়া তাঁহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। গৌর বিরহের জ্বালা জুড়াইবার জন্যই যেন সরকার ঠাকুর মহাশয় দুই বাহু প্রসারিত করিয়া তাঁহাকে প্রাণের আবেগে আলিঙ্গন করিলেন। গৌর-প্রেম আজ গৌর-বিলাসীর আলিঙ্গনে ধরা দিয়া তাঁহার নিকটে আত্ম-সমর্পণ করিলেন। শ্রীনিবাসকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া সরকার ঠাকুর মহাশয় গৌর আলিঙ্গনের সুখ আস্বাদন করিতে লাগিলেন। পরে সরকার ঠাকুর মহাশয় শ্রীনিবাসকে পরম যত্নে নিকটে বসাইলেন এবং সেইখানেই কিছুক্ষণ আলোচনা-প্রসঙ্গে অতিবাহিত করিলেন। তৎপরে তাঁহাকে গৃহে পাঠাইয়া দিয়া স্বগণে গঙ্গাতীর অভিমুখে যাত্রা করিলেন। এই সম্মিলনেব পর হইতেই শ্রীনিবাসের জীবনের গতি এক নূতন পথ ধরিয়া অগ্রসর হইতে আরম্ভ করিল।*

---

* শ্রীল শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভু শ্রীমন্মহাপ্রভুর দ্বিতীয় প্রকাশ। এই বিষয়ে বহু প্রমাণ আছে। কয়েকটী উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

১। সরকার ঠাকুর মহাশয়ের সহিত প্রথম মিলনে :—

শ্রীনিবাস নাম শুনি সুখ উপজিল।
চৈতন্যের শক্তি হন দৃঢ় বিশ্বাস হৈল॥

—প্রেম বিলাস ৪র্থ বিলাস।

২। গোস্বামীগণের প্রতি বৃন্দাবনে শ্রীগোবিন্দজীর উক্তি :—

মোর শক্তিতে জন্ম ইহার করিলা প্রকাশ।
প্রেম রূপে জন্ম হৈল নাম শ্রীনিবাস॥

—কর্ণানন্দ ৬ষ্ঠ নির্য্যাস।

৩। তথাহি কস্যচিদ্ বৈষ্ণব বাক্যং—

নিত্যানন্দ ছিল যেই নরোত্তম হইলা সেই
শ্রীচৈতন্য হইলা শ্রীনিবাস।
শ্রীঅদ্বৈত যারে কয় শ্যামানন্দ তিঁহো হয়
ঐছে হইলা তিনের প্রকাশ।

—প্রেম বিলাস ২০শ বিলাস।

পিতৃ-বিয়োগ

সরকার ঠাকুর মহাশয়ের নিকট হইতে বিদায় লইয়া শ্রীনিবাস গৃহে ফিরিয়া আসিলেন বটে, কিন্তু শ্রীচৈতন্যদাস আর পূর্ব্বের শ্রীনিবাসকে ফিরিয়া পাইলেন না। সরকার ঠাকুর মহাশয় তাঁহার হৃদয়স্থ গৌর বিরহের জ্বলন্ত অনলটী যেন আলিঙ্গন ছলে শ্রীনিবাসের হৃদয়ে সঞ্চারিত করিয়া দিয়াছেন। তাহার জ্বলন্ত শিখায় দগ্ধ হইতে হইতে শ্রীনিবাস গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। তিনি যেন উন্মাদ দশা প্রাপ্ত হইলেন, সর্ব্বদা বিভোর হইয়া থাকেন, সময়ে সময়ে বাহ্যজ্ঞান মাত্র থাকে না, মধ্যে মধ্যে বক্ষ হইতে দীর্ঘ নিঃশ্বাস নির্গত হয়, কখনও বা এইরূপ গম্ভীরভাবে অবস্থান করেন যে, তখন কেহ নিকটে যাইতেও সাহস পান না। এক একবার যখন করুণ স্বরে রোদন করেন, তখন তাহা শ্রবণ করিয়া যেন পাষাণও বিদীর্ণ হইয়া যায়। আবার কখনও কখনও ক্রমাগত হাস্য আবার কখনও বা নৃত্য করিতে থাকেন। সরকার ঠাকুর মহাশয়ের কৃপাশক্তির প্রভাবেই যে

৪। সরকার ঠাকুর মহাশয়ের উক্তি :—

শ্রীরূপ প্রমুখৈকশক্তিকতমেনাবিষ্করোতি প্রভু—
গ্রন্থোঽয়ং বিতনোতি শক্তিপরয়া শ্রীশ্রীনিবাসাখ্যয়া।
দ্বে শক্তী প্রকটীকৃতে করুণয়া ক্ষৌণীতলে যেন স—
শ্রীচৈতন্যদয়ানিধির্মম কদা দৃগ্‌গোচরং যাস্যতি॥

—ভক্তি রত্নাকর ও নরোত্তম বিলাস।

৫। "নিজ নাম রূপগুণলীলা আস্বাদিতে
গৌর প্রকট শ্রীনিবাস রূপেতে"— ইত্যাদি।

শ্রীনিবাস-সূচকে শ্রীল রামদাস বাবাজী মহারাজ।

৬। শ্রীমচ্ছচী নন্দন প্রেমরূপ পাহি প্রভো শ্রীনিবাস দ্বিজেন্দ্র॥

—ভক্তি রত্নাকর মঙ্গলাচরণ।

শ্রীনিবাসের এইরূপ প্রেমোন্মাদ দশা উপস্থিত হইয়াছে শ্রীচৈতন্যদাস তাহা ক্রমে অবগত হইলেন এবং নানা প্রকারে সান্ত্বনা দিয়া তাঁহাকে সুস্থ করিতে সচেষ্ট হইলেন। কিছুদিন পর ভাবাবেগ ঈষৎ সংযত হইল বটে কিন্তু বিরহ জ্বালা কিছুমাত্র প্রশমিত হইল না। শ্রীনিবাসের যখন এইরূপ অবস্থা তখন আবার অকস্মাৎ এক অনর্থপাত হইয়া গেল, তাহাতে তিনি যেন একেবারে বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। শ্রীচৈতন্যদাস একদিন প্রবল জ্বরে আক্রান্ত হইলেন এবং জ্বর ভোগ করিতে করিতে সপ্তম দিবসে সকলের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া নিত্যলীলায় প্রবিষ্ট হইলেন।

এই অপরিণত বয়সে পিতৃহারা হইয়া শ্রীনিবাস একেবারে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলেন। লক্ষ্মীপ্রিয়া দেবীও পতি-বিয়োগে উন্মত্ত প্রায় হইয়া পড়িলেন। জননীর অবস্থা দেখিয়া শ্রীনিবাসের অন্তরে দুঃখানল যেন দ্বিগুণিত হইয়া জ্বলিতে লাগিল। পিতার সহিত শ্রীনিবাসের সম্পর্ক লৌকিক মাত্রই নহে, তাঁহার পারমার্থিক জগতে অনুপ্রবেশের আদিগুরু তিনি, তিনিই তাঁহার গৌর-লীলারস আস্বাদনের মরমী সাথী। শ্রীচৈতন্য দাসের ন্যায় পিতাকে পাইয়াছিলেন বলিয়াই এই তীব্র গৌর বিরহানল হৃদয়ে ধারণ করিয়াও শ্রীনিবাস গৃহত্যাগে উদ্যোগী হন নাই। শ্রীচৈতন্য দাসের অপ্রকটে তিনি শুধু পিতৃহারাই হইলেন না, গুরু-হারা সাথী-হারা এবং অবলম্বন হারা হইয়া তিনি যেন একেবারে নিরাশ্রয় হইয়া পড়িলেন। তাহার উপর গৌর-সর্ব্বস্ব জননীর আবার এই অবস্থা! প্রতিবেশিগণ আসিয়া তাঁহাদিগকে বহু প্রকারে সান্ত্বনা দিলেন। তাঁহাদের সহায়তায় শ্রীনিবাস যথা সময়ে পিতৃদেবের অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া সম্পন্ন করিলেন। পরে গঙ্গাবারিতে অস্থি বিসর্জ্জন দিয়া শূন্য হৃদয়ে গৃহে ফিরিয়া আসিলেন। যথা সময়ে শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়াও সুসম্পন্ন হইল। যে আকর্ষণে শ্রীনিবাস সংসারে বাস করিতে ছিলেন, সে আকর্ষণ এখন আর নাই। তাঁহার মনের চাঞ্চল্যও যেন ক্রমেই বাড়িয়া উঠিতে

লাগিল। ১৪৫৪ শকে ফাল্গুন মাসের পঞ্চমী তিথিতে * বসবাস করিবার অভিপ্রায়ে শ্রীনিবাস জননীর সহিত যাজিগ্রামে আসিয়া উপনীত হইলেন। বলরাম আচার্য্য তখন পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন কি না বলা যায় না। তবে সেখানে শ্রীনিবাসের বসবাসের পক্ষে কোন রূপ অসুবিধার কারণ ছিল না। স্থানীয় জমীদার এবং গ্রামবাসিগণ পরম সমাদরে একখানি নব-নির্ম্মিত গৃহে তাঁহাদিগকে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। বলরাম আচার্য্যের সমুদয় সম্পত্তিও তিনি লাভ করিয়া ছিলেন। যাজিগ্রামে আসিয়া শ্রীনিবাস স্থানীয় ভক্তবৃন্দ ও গৌর পরিকরগণের সঙ্গ প্রাপ্ত হইলেন এবং তাঁহাদের সহিত মিলিত হইয়া পূর্ব্ববৎ গৌর-প্রসঙ্গে আত্মনিয়োগ করিলেন। কিন্তু তাহাতে গৌর দর্শনের পিপাসা কমিল না। তাহা ক্রমেই বলবতী হইয়া উঠিতে লাগিল। ফলে আর থাকিতে না পারিয়া অবশেষে তিনি শ্রীধাম পুরী যাইবার জন্য কৃত-সঙ্কল্প হইয়া যাত্রার সুযোগের অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। অতঃপর সরকার ঠাকুর মহাশয়ের নিকট হইতে অনুমতি গ্রহণের জন্য শ্রীনিবাস একদিন শ্রীখণ্ড অভিমুখে রওনা হইয়া গেলেন। যথা সময়ে শ্রীখণ্ডে সরকার ঠাকুর মহাশয়ের আলয়ে আসিয়া শ্রীনিবাস তাঁহার চরণ সমীপে দণ্ডবৎ হইয়া পড়িলেন। পরম স্নেহে বিগলিত হইয়া তিনিও শ্রীনিবাসকে উঠাইয়া আলিঙ্গন পূর্ব্বক নিকটে বসাইয়া কুশল সমাচার গ্রহণ করিলেন। যথাযোগ্য আলাপ আলোচনার পর শ্রীনিবাস নীলাচল গমন করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া অনুমতি প্রার্থনা করিলে সরকার ঠাকুর মহাশয় সস্নেহে বলিলেন—'শ্রীমন্মহাপ্রভুর

* কথিত আছে ফাল্গুন মাসের পঞ্চমী তিথিতে শ্রীনিবাস যাজিগ্রামে বসবাসের নিমিত্ত আগমন করেন এবং তাহার অব্যবহিত পরবর্ত্তী মাঘ মাসের শুক্লা পঞ্চমীতে শ্রীনিবাস নীলাচল যাত্রা করিয়া পথে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অদর্শন বার্ত্তা শ্রবণ করেন। বঙ্গভাষা ও সাহিত্য গ্রন্থের উক্তি অনুসারে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অদর্শনের তারিখ ১৫৩৩ খৃঃ অর্থাৎ ১৪৫৫ শকের আষাঢ়ী শুক্লা সপ্তমী তিথি, রবিবার। অতএব শ্রীনিবাসের যাজিগ্রামে আগমন ১৪৫৪ শকে এবং নীলাচল যাত্রা ১৪৫৫ শকে হওয়াই সম্ভব।

শ্রীচরণ দর্শনের জন্য অন্তরে সত্যই যদি উৎকণ্ঠা হইয়া থাকে তবে আর কাল বিলম্ব করা উচিত হইবে না। শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর প্রেরিত তরজা প্রাপ্তির পর হইতেই প্রভুর আচরণ যেন প্রহেলিকাময় হইয়া উঠিয়াছে। তাহা দর্শন করিয়া ভক্তগণের মনে এই আশঙ্কাই প্রবল হইয়া উঠিয়াছে যে, প্রভু হয়ত অতি অল্পকালের মধ্যেই প্রকট লীলা সংগোপন করিবেন। অতএব আর বিলম্ব না করিয়া সত্বরই নীলাচল অভিমুখে রওনা হও, বলিতে বলিতে সরকার ঠাকুর মহাশয় গৌর বিরহে এবং তাঁহার আসন্ন লীলা সংগোপনের আশঙ্কায় কাতর হইয়া অশ্রু মোচন করিতে লাগিলেন। অতঃপর শ্রীনিবাস তাঁহার নিকট হইতে বিদায় লইয়া শ্রীরঘুনন্দন এবং শ্রীখণ্ডবাসী অন্যান্য ভক্তবৃন্দের নিকটে আসিলেন ও যথাযোগ্য প্রণাম বন্দনা করিয়া তাঁহাদের নিকটেও বিদায় গ্রহণ করিয়া শেষে যাজিগ্রামে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

নীলাচল-গমন

যাজিগ্রাম ফিরিয়া আসিয়া শ্রীনিবাস জননীর সান্ত্বনার জন্য আরও কিছুদিন সেখানে বাস করিলেন। কিন্তু গৌর দর্শনের অদম্য ব্যাকুলতা তাঁহাকে আর বেশীদিন গৃহে আবদ্ধ থাকিতে দিল না। প্রবল উৎকণ্ঠায় অধীর হইয়া তিনি পুনঃ পুনঃ মাতৃ চরণে বিদায় ভিক্ষা করিতে লাগিলেন। পতিবিরহে কাতরা লক্ষ্মীপ্রিয়া দেবী শ্রীনিবাসের মুখ দর্শন করিয়াই কোনও প্রকারে কালাতিপাত করিতে ছিলেন। অপ্রাপ্ত বয়স্ক এই একমাত্র প্রাণাধিক সন্তানকে সুদূর নীলাচলের পথে বিপদ সঙ্কুল অবস্থার মধ্যে ছাড়িয়া দিতে জননীর প্রাণ কোনও প্রকারেই রাজী হইতে ছিল না। কিন্তু শ্রীনিবাসের অবস্থা দেখিয়া তিনি ইহাও বুঝিলেন যে, নীলাচল যাইতে না দিলে উদ্বেগ এবং বিরহ বশতঃ হয়ত তাঁহার জীবনাশঙ্কা দেখা দেওয়াও বিচিত্র নহে। সুতরাং নিরুপায় হইয়াই তাঁহাকে অনুমতি দান করিতে হইল। ১৪৫৫ শকের

মাঘ মাসে শুক্লা পঞ্চমী তিথিতে সরকার ঠাকুর মহাশয় কর্ত্তৃক প্রেরিত জনৈক বৈষ্ণবের সহিত শ্রীনিবাস, পতিহারা অবলম্বন হারা বৃদ্ধা জননীর সংরক্ষণের ভার সর্ব্বনিয়ন্তার উপরে ছাড়িয়া দিয়া নীলাচলের পথে নির্গত হইলেন।

শ্রীনিবাস নীলাচলের পথে চলিয়াছেন। গৌর প্রেমে উন্মত্ত হইয়াই চলিয়াছেন। অনতিকাল মধ্যেই চির আকাঙ্ক্ষিত প্রভুর চরণ কমলের দর্শন লাভ করিব, এই আশায় হৃদয় পরিপূর্ণ করিয়া চলিয়াছেন। কখনও ধীরে ধীরে চলিতেছেন, আবার কখনও ভাবাবেশে অধীর হইয়া দৌড়াইয়া যাইতেছেন। বাহ্যজ্ঞান এক প্রকার নাই বলিলেও চলে। আসন্ন সম্মিলনের আনন্দে নয়ন যুগলে অশ্রুর ধারা নামিয়াছে। পথচারী যাত্রির দল সবিস্ময়ে দেখিলেন এক অপরূপ তপ্ত কাঞ্চন দ্যুতিময় ব্রাহ্মণ কুমার নয়ন ধারায় ভাসিতে ভাসিতে নীলাচলের অভিমুখে প্রেম বিহ্বল হইয়া ছুটিতে ছুটিতে চলিয়াছেন। অনাহারে অনিদ্রায় এবং পথশ্রমে দেহ অতি ক্ষীণ, পরিধেয় জীর্ণ ও মলিন, কেশপাশ রুক্ষ, অবিন্যস্ত ও ধুলিধূসর। তথাপি সর্ব্ব দৈন্য ভেদ করিয়া লাবণ্যের ছটায় যেন উদীয়মান সূর্য্যের অরুণাভায় দশ দিক উদ্ভাসিত করিতে করিতে ছুটিয়া চলিয়াছেন। যিনি দেখিতেছেন, তিনিই স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া পড়িতেছেন। তাঁহারা অনুমান করিতেছেন—এই বালক হয়ত বা স্থাবর জঙ্গম প্রেমোন্মত্তকারী নীলাচলের অপরূপ সন্ন্যাসী শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যের অন্তরঙ্গগণের মধ্যে কেহ হইবেন। নতুবা এই জাতীয় প্রেমোন্মত্ততা আর কোথা হইতেই বা আসিবে?

মধ্যে মধ্যে শ্রীনিবাসের বাহ্যজ্ঞান ফিরিয়া আসিতেছে, তখন নীলাচল প্রত্যাগত যাত্রীগণের মুখে প্রভুর কুশল সমাচার লইতেছেন, ভাগ্যবানগণের চরণে পতিত হইয়া অভীষ্ট প্রাপ্তির জন্য কৃপা প্রার্থনা করিতেছেন, আবার অগ্রসর হইতেছেন। কিন্তু তাঁহার আশা আকাঙ্ক্ষাকে নিমেষের মধ্যে ধূলিসাৎ করিয়া দিবার নিমিত্ত

বিভীষিকাময়ী দুঃসংবাদ অচিরে নীলাচল-প্রত্যাগত যাত্রী প্রমুখাৎ সমাগত হইল, তাহাতে তাঁহার হৃদয়ের গৌর দর্শনের আশাবর্ত্তিকাটী চির নির্ব্বাপিত হইয়া গেল, শ্রীনিবাস শোকের গাঢ় তমিস্রায় গভীর ভাবে নিমজ্জিত হইলেন। তাঁহার জীবনের একমাত্র অবলম্বন শ্রীমন্মহাপ্রভু অদর্শন হইয়াছেন সে কথা তাঁহার কর্ণগোচর হইল। ভাগ্য বিপর্য্যয়কারী হৃদয় বিদায়ক এই সংবাদ কর্ণে প্রবিষ্ট হইয়া সেই কিশোর প্রেমিকের কোমল হৃদয়টী যেন সুতীক্ষ্ণ অস্ত্রের দ্বারা শতধা বিদার্ণ করিয়া দিল। নয়ন যুগল বিস্ফারিত হইল, অশ্রু রুদ্ধ হইল, অঙ্গসমূহ কাঠিন্য প্রাপ্ত হইয়া সবেগে কম্পিত হইতে লাগিল। অবশেষে শ্রীনিবাস আর্ত্তনাদ করিয়া গভীর মূর্চ্ছায় আক্রান্ত হইলেন। তাঁহার সুবর্ণময় কলেবর সবেগে পথ প্রান্তে নিপতিত হইল।

সাধারণ জীবের হৃদয়ে প্রেমের বিকাশ নাই বলিয়া আত্মীয়স্বজনের বিয়োগ ঘটিলে কয়েক বিন্দু অশ্রুত্যাগ করিয়াই তাহারা সব ভুলিয়া যায়। প্রেম নাই তাই বিরহও নাই! কিন্তু যথার্থ প্রেমের অভিব্যক্তি যেখানে, সেখানে প্রেমিক ও প্রেমাস্পদের মধ্যে বিচ্ছেদ যদি সত্য সত্যই আবির্ভূত হয় এবং মিলনের সম্ভাবনাকে চিরদিনের মত নিশ্চিহ্ন করিয়া দেয়, তবে সেই আঘাত সহ্য করিবার সামর্থ্য কাহারও নাই। কিন্তু বিচ্ছেদ এবং বিরহ এক কথা নহে। বিচ্ছেদ বহিয়া আনে হতাশা, কিন্তু মিলনের সম্ভাবনাটীকে লইয়াই বিরহের আবির্ভাব ঘটে। সেই আশাই প্রেমিককে জীবনী শক্তি দিয়া বাঁচাইয়া রাখে। বিরহের পশ্চাতে যদি মিলনের সম্ভাবনা না থাকিত তবে কোন প্রেমিকই এই অবস্থায় দেহ ধারণ করিয়া থাকিতে পারিতেন না। শ্রীভগবানের বিরহে কেহ কখনও মরে না, তিনি যে কোন উপায়ের দ্বারাতেই হোক প্রেমিকের প্রাণ রক্ষা করেন। শ্রীনিবাসের মূর্চ্ছা ধীরে ধীরে অপগত হইতে লাগিল। জ্ঞান ফিরিয়া আসিতেই তাঁহার আবার নূতন করিয়া স্মরণ হইল যে প্রভু অন্তর্হিত হইয়াছেন। জীবনের একমাত্র অবলম্বন শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীচরণ কমল দর্শনের আর

কোনও সম্ভাবনা নাই, সে আশা চিরতরে লুপ্ত হইল, শ্রীনিবাস আর্ত্ত স্বরে কাঁদিয়া উঠিলেন। পুনঃ পুনঃ শিরে করাঘাত করিতে লাগিলেন। এক একবার অঙ্গুলি দ্বারা কেশপাশ ছিন্ন করিতেছেন। আবার কখনও বা নখ দ্বারা বক্ষ ক্ষত বিক্ষত করিতেছেন। তাঁহার এতাদৃশ অবস্থা দেখিয়া হৃদয়-হীন পথিকেরাও বিগলিত এবং চঞ্চল হইয়া উঠিল। এইরূপে কিছুক্ষণ বিলাপ করিতে করিতে শ্রীনিবাস পুনরায় চৈতন্য হারাইয়া ভূমিতলে পতিত হইলেন। এইরূপ পুনঃ পুনঃ মূর্চ্ছা এবং বিলাপের মধ্যে সমস্ত দিবস অতীত হইল। রাত্রির অন্ধকার ঘনীভূত হইলে শ্রীনিবাস সঙ্কল্প করিলেন—সমস্ত আশাই যখন তিরোহিত হইল তখন আর অকারণে দেহভার বহন করিবার কোন প্রয়োজন নাই। মনে স্থির করিয়া রাখিলেন রাত্রি গভীর হইলে অগ্নি প্রজ্জ্বালিত করিয়া তাহাতে দেহ বিসর্জ্জন করিবেন। এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া শ্রীনিবাস নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। অতিরিক্ত পরিশ্রম অনাহার এবং সমস্ত দিবসব্যাপী পুনঃ পুনঃ মূর্চ্ছা এবং ক্রন্দনের ফলে তিনি অত্যন্ত ক্লান্ত ও দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়া ছিলেন। সেই পথের পার্শ্বে এক বৃক্ষতলে তিনি আচ্ছন্ন ভাবে পড়িয়া রহিলেন। অবশেষে মধ্য রাত্রিতে প্রভুর ইচ্ছায় কিছু তন্দ্রার আবেশ আসিল। ভক্তের এই হৃদয় বিদারক অবস্থায় প্রভুর হৃদয় টলিয়া গেল। তাঁহাকে দর্শন দিয়া আশ্বস্ত করিবার জন্য এবং দেহ ত্যাগের সঙ্কল্প হইতে বিচ্যুত করিবার জন্যই প্রভু স্বপ্নচ্ছলে শ্রীনিবাসের সমক্ষে আবির্ভূত হইলেন এবং শ্রীনিবাসের মস্তকে শ্রীচরণ অর্পণ করিয়া তাঁহাকে সস্নেহে অঙ্কে ধারণ পূর্ব্বক বহু প্রকার স্নেহ বাক্যের দ্বারা প্রবোধ দান করিলেন। কিছুক্ষণ পর শ্রীনিবাস জাগরিত হইয়া করুণাময় প্রভুর অহৈতুকী কৃপার কথা স্মরণ করিয়া নীরবে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। এইরূপে অশ্রুধারায় ভাসিতে ভাসিতে সমস্ত রাত্রি অতিবাহিত করিলেন। শেষ রাত্রে পুনরায় কিঞ্চিৎ নিদ্রাকর্ষণ হইলে প্রভু পুনরায় আবির্ভূত হইলেন এবং স্বহস্তে অশ্রু মুছাইয়া দিয়া পরম স্নেহে শ্রীনিবাসকে

হৃদয়ে ধারণ করিয়া বলিলেন—'গদাধর প্রভৃতি আমার আপন জনেরা নীলাচলে তোমার সহিত মিলিত হইবার জন্য সতৃষ্ণ নয়নে আশা পথ চাহিয়া বসিয়া আছেন। তুমি মনে কোনরূপ দ্বিধা না করিয়া অবিলম্বে নীলাচলে গমন কর, তোমার এই দেহ অবলম্বন করিয়া আমি আমার অনেক উদ্দেশ্য সাধন করিব, দেহত্যাগের সঙ্কল্প ত্যাগ কর' বলিতে বলিতে প্রভু পরম স্নেহে শ্রীনিবাসকে পুনরায় আলিঙ্গন দিলেন এবং নানা প্রকারে আশ্বাস প্রদান করিয়া অন্তর্হিত হইলেন। নিদ্রা ভঙ্গ হইলে শ্রীনিবাস দেখিলেন রজনী অতিক্রান্ত হইয়াছে, দিগন্ত অরুণাভায় উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর দর্শন এবং শ্রীমুখের আদেশ পাইয়া বিরহ তাপ কিঞ্চিৎ প্রশমিত হইলে, শ্রীনিবাস মনস্থির করিলেন, প্রভু নীলাচল যাইবার আদেশ করিয়াছেন, অতএব যাইতেই হইবে। তাঁহার ইচ্ছাই জয়যুক্ত হউক। এই কথা ভাবিতে ভাবিতে তিনি উঠিয়া পুনরায় নীলাচলের পথে যাত্রা করিলেন। কয়েক দিবসের মধ্যেই শ্রীনিবাস নীলাচলের দ্বার দেশে আসিয়া উপনীত হইলেন। দূর হইতে নরেন্দ্র সরোবর দৃষ্টি গোচর হইল। এই সরোবর প্রভুর জল ক্রীড়ার স্থান। অন্তরঙ্গ পরিকরগণের সহিত প্রভু এই স্থানে কতই না আনন্দ করিয়াছেন। আজ নরেন্দ্র সরোবর নির্জ্জন। শ্রীনিবাস সরোবরের তীরে লুণ্ঠিত হইয়া ব্যাকুলভাবে কাঁদিতে লাগিলেন। অধিক রাত্রি পর্য্যন্ত তিনি একইভাবে পড়িয়া পড়িয়া কাঁদিলেন। পরে প্রায় মধ্যরাত্রিতে ঈষৎ ধৈর্য্য লাভ করিয়া সরোবরের উদ্দেশ্যে দণ্ডবৎ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তাহার পর মন্থর গতিতে শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের মন্দিরের উদ্দেশ্যে অগ্রসর হইলেন। অবশেষে সিংহ দ্বারের নিকটে আসিয়া পথ পার্শ্বে উপবেশন করিলেন এবং বিষন্ন চিত্তে সেই স্থানে বসিয়া নাম কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। নীলাচলে গমন করিব, ইহা শ্রীনিবাসের সারা জীবনের সাধ। আজ সেই সাধ পূর্ণ হইল ভাগ্য বিড়ম্বনায় সম্পূর্ণ অন্যরূপে। ইহাতে এক বিন্দু উৎসাহ নাই,

আনন্দ নাই। অনাহার ও অনিদ্রায় পথশ্রমের ক্লান্তি এবং গৌর বিরহের তাপে জর্জ্জরিত দেহে আর কিছুমাত্র সামর্থ্য ছিল না। নাম করিতে করিতে শ্রীনিবাস সেই পথ পার্শ্বেই নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন। এই সময় শ্রীবলরাম ও শ্রীসুভদ্রা দেবী সহ শ্রীজগন্নাথ দেব স্বপ্নে আবির্ভূত হইয়া তাঁহাকে দর্শন দান পূর্ব্বক আশ্বস্ত করিলেন। কিছুক্ষণ পর সহসা জাগ্রত হইয়া শ্রীনিবাস দেখিলেন একজন অপরিচিত ব্রাহ্মণ প্রসাদ হস্তে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে সস্নেহে ডাকিতেছেন এবং প্রসাদ গ্রহণ করিতে বলিতেছেন। কে এই ব্যক্তি, তিনি অনাহারে আছেন এ কথা ইনি জানিলেনই বা কিরূপে ইত্যাদি নানারূপ চিন্তা করিতে করিতে শ্রীনিবাস বিস্মিতভাবে উঠিয়া বসিলেন এবং প্রসাদের পাত্রখানি গ্রহণ করিলেন। পাত্রটী নামাইয়া রাখিবার পরই সম্মুখে তাকাইয়া দেখিলেন আর কেহ কোথাও নাই। ব্রাহ্মণ যেমন আসিয়াছিলেন তেমনি সহসা অন্তর্হিত হইয়া গেলেন। বহু অনুসন্ধানেও আর তাঁহার কোন উদ্দেশ পাওয়া গেল না। দাসের প্রতি প্রভুর এই ছলনাটুকু চকিতে ঘটিয়া গেল। এত দুঃখের মধ্যেও কোন এক অজ্ঞাত অনুভূতির স্পর্শে শ্রীনিবাসের হৃদয়ে পুলকের তরঙ্গ খেলিয়া গেল, মুখে হাসির মৃদুরেখা ফুটিয়া উঠিল। সাগ্রহে প্রসাদ গ্রহণ করিয়া শ্রীনিবাস পুনরায় নাম সঙ্কীর্ত্তনে রত হইলেন এবং নাম করিতে করিতে কিছুক্ষণ পরে পুনরায় নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন। শ্রীনিবাস স্বপ্নে দেখিলেন,—শ্রীমন্মহাপ্রভু সপরিকরে বসিয়া আছেন, আর তাঁহার সম্মুখে বসিয়া গদাধর পণ্ডিত শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও বাখ্যা করিতেছেন। বক্তার ও শ্রোতাগণের দেহে অশ্রু কম্প পুলকাদির তরঙ্গ বহিয়া চলিয়াছে, দেখিতে দেখিতে স্বপ্ন মিলাইয়া গেল, তন্দ্রাও সঙ্গে সঙ্গে ছুটিয়া গেল, শ্রীনিবাস পুনরায় উঠিয়া বসিয়া কাতর কণ্ঠে নাম করিতে লাগিলেন। সমস্ত রাত্রি এই ভাবেই অতীত হইল। শেষরাত্রে সামান্য একটু নিদ্রাকর্ষণ হইলে প্রভু পুনরায় অপরূপ মূর্ত্তিতে আসিয়া দর্শন দিলেন। শ্রীনিবাস চরণে পতিত হইলে প্রভু স্নেহ ভ'রে তাঁহাকে

উঠাইয়া বলিলেন "তুমি দুঃখ করিও না, আমি সর্ব্বদা তোমার নিকটই আছি,"—বলিতে বলিতে প্রভু অন্তর্হিত হইলেন। শ্রীনিবাসের নিদ্রাও ছুটিয়া গেল। দেখিলেন রাত্রি প্রভাত হইয়াছে।

গদাধর-মিলন

শ্রীমন্মহাপ্রভু তখন গঙ্গাদাস পণ্ডিতের ছাত্র, তাঁহার চাঞ্চল্য এবং ঔদ্ধত্যের পীড়নে নদীয়ার পণ্ডিত সমাজ সন্ত্রস্ত, 'ফাঁকি' জিজ্ঞাসার ভয়ে সহপাঠী এবং অন্যান্য ছাত্রবৃন্দ পারতপক্ষে কেহ নিমাইয়ের ত্রিসীমানার মধ্যে যাইতে চায় না। নিমাইয়ের মনে কিন্তু কোন সঙ্কোচ নাই। ছাত্র দেখিলেই ধরিয়া ফেলেন এবং 'ফাঁকি' জিজ্ঞাসা করেন। এই ক্ষুরধার মেধা সম্পন্ন ছাত্রটীর সহিত কেহই পারিয়া উঠে না। সূক্ষ্ম শাস্ত্র বিচার এবং তীক্ষ্ণ প্রশ্নোত্তরের স্রোতে পড়িয়া তাহারা ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠে। যে ছাত্রটী নিরীহ এবং ভক্তিমান অথবা যে তাঁহার অধিক স্নেহের পাত্র, তাহার প্রতি আক্রমণটা যেন আরও একটু তীব্রভাবে প্রকাশ পাইতে থাকে।

নবদ্বীপের নিকটবর্ত্তী চাঁপাহাটী গ্রামের মাধব মিশ্রের কনিষ্ঠ পুত্র গদাধর নিমাই অপেক্ষা বয়সে কিছু ছোট ছিলেন।* গদাধর তখন নবদ্বীপে থাকিয়া ন্যায় পাঠ করিতেন। পরম ভক্তিমান

* ১৪০৮ শকের বৈশাখী অমাবস্যায় গদাধর অবতীর্ণ হন। ইনি শ্রীরাধিকার অবতার এবং গৌরলীলায় গৌর প্রেয়সী। যথা :— গৌরগণোদ্দেশ দীপিকায় —

শ্রীরাধা প্রেমরূপা যা পুরা বৃন্দাবনেশ্বরী।
সা শ্রীগদাধরো গৌর বল্লভঃ পণ্ডিতাখ্যকঃ॥
নির্ণীতঃশ্রী স্বরূপৈর্যো ব্রজলক্ষ্মীতয়া যথা।
পুরা বৃন্দাবনে লক্ষ্মীঃ শ্যামসুন্দর বল্লভা॥
সাদ্য গৌরপ্রেমলক্ষ্মীঃ শ্রীগদাধর পণ্ডিতঃ।
রাধামনুগতা যত্তল্ললিতাপ্যনুরাধিকা॥

ও অপরূপ রূপলাবণ্যময় এই মুখচোরা ছাত্রটীকে নিমাই প্রাণাধিক স্নেহ করেন। কিন্তু সেই স্নেহের বাহ্য প্রকাশ ঘটিত পূর্ব্বোক্ত নিয়মে। পথে দেখা হইলেই তিনি গদাধরের হাত দুইটি ধরিয়া তাঁহাকে আটকাইয়া ফেলিতেন। তাহার পর 'ফাঁকি' এবং শাস্ত্রের কূট প্রশ্নে তাঁহাকে বিব্রত করিয়া ফেলিতেন। পরে তাঁহার অবস্থা দেখিয়া হাত দুইটী ছাড়িয়া দিয়া সশব্দে হাসিয়া উঠিতেন। গদাধর পরিত্রাণ পাইয়া এক প্রকার পলাইয়া আত্ম-রক্ষা করিতেন। এই পরাজয়ে কিন্তু তাঁহার মনে বিন্দুমাত্র গ্লানি ছিল না। পরন্তু সেইটুকু না ঘটিলেই যেন কোথায় একটা ত্রুটী থাকিয়া যাইত বিজয়ীর সম্মানটী পরম শ্রদ্ধার সহিত নিমাইয়ের প্রতি সমর্পণ করিয়া গদাধর পুলকিত চিত্তে চলিয়া যাইতেন। চলিয়া যাইতেন বটে, কিন্তু নিমাইয়ের প্রতি একটা প্রবল আকর্ষণ সর্ব্বদাই তাঁহাকে যেন অভিভূত করিয়া রাখিত। এই কিশোরের গোপন প্রেমের বহির্বিকাশ ছিল না। তাহা নীরবে অন্তঃসলিলা ফল্গুধারার ন্যায় সর্ব্বদা অন্তরেই প্রবাহিত হইত। তিনি নিজেও বোধ হয় হৃদয়স্থ এই গোপন প্রেমের স্বরূপটী তখনও বেশ বুঝিয়া উঠিতে পারেন নাই। গয়া হইতে ফিরিয়া আসিয়া নিমাই যখন মহাপ্রেমোন্মাদ দশা প্রাপ্ত হইলেন, গদাধর তখন ছুটিয়া আসিয়া তাঁহার পরিচর্য্যার সকল ভার স্বহস্তে তুলিয়া লইলেন। তাঁহার সর্ব্বাধিক প্রেমের পাত্রটীর হৃদয়ে যে বস্তুটীর অভাব দর্শন করিয়া ব্যথা পাইতেন, সেই প্রার্থিত বস্তুটী এমনি বিপুল আকারে আবির্ভূত হইয়া নিমাইকে অভিভূত করিয়া ফেলিবে, গদাধর তাহা স্বপ্নেও কল্পনা করেন নাই। গদাধর নিশিদিন ছায়ার ন্যায় প্রভুর সঙ্গে সঙ্গে ফিরিতে লাগিলেন প্রভু যখন নিদ্রা যান গদাধর তখন তাঁহার চরণযুগল হৃদয়ে ধরিয়া পড়িয়া থাকেন।

প্রভুর কৃপায় নদীয়া প্রেমে উন্মত্ত হইল. অনেকে সাক্ষাৎভাবে প্রভুর নিকটে প্রার্থনা করিয়া প্রেম ভক্তি লাভ করিতে লাগিলেন। দেখিয়া শুনিয়া গদাধরের বড়ই ইচ্ছা হইল যে তাঁহাদের ন্যায় তিনিও

প্রভুর নিকটে শ্রীকৃষ্ণপ্রেম চাহিয়া লইবেন। সঙ্কল্প করিলেন বটে, কিন্তু সাহস করিয়া কিছু বলিতেও পারিলেন না। একদিন রাত্রিকালে প্রভু নিদ্রিত হইলে পর গদাধর তাঁহার চরণ দুইটী কোলের উপর রাখিয়া বসিয়া বসিয়া কাঁদিতেছিলেন। তাঁহার নয়ন হইতে কয়েক বিন্দু অশ্রু প্রভুর চরণে ঝরিয়া পড়িতেই প্রভুর নিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেল। তিনি উঠিয়া বসিয়া গদাধরকে বুকের নিকট টানিয়া আনিলেন এবং স্নেহ ভ'রে জিজ্ঞাসা করিলেন—'কি হইয়াছে গদাধর, আমায় বলিবে না?' বহুক্ষণ পর ক্রন্দনের বেগ অতিকষ্টে সংবরণ করিয়া গদাধর মৃদু কণ্ঠে বলিলেন—'প্রেম ভক্তি লাভ করিয়া সকলেই ধন্য হইল, কিন্তু আমার কিছুই হইল না',—বলিতে বলিতে ক্রন্দনের আবেগে পুনরায় কণ্ঠরোধ হইল। প্রভু সস্নেহে তাঁহার অঙ্গে হাত বুলাইতে বুলাইতে স্মিত হাস্যে বলিলেন 'তুমিও পাইবে, আগামী কাল প্রাতে গঙ্গাস্নান করিবার পর তোমার মনস্কামনা পূর্ণ হইবে।' শুনিয়া গদাধর কৃতার্থ হইলেন। পরদিন প্রত্যূষে গদাধর গঙ্গাস্নান সমাপনান্তে টলিতে টলিতে প্রভুর সম্মুখে আসিতেই প্রভু সকৌতুকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—'গদাধর! শ্রীকৃষ্ণপ্রেম পাইলে?' গদাধরের চিত্ত তখন আনন্দে অবশ, প্রভুর কথায় তাঁহার হৃদয়ে আনন্দের আর একটী তরঙ্গ উঠিল, আর ভাব সংযত করিতে না পারিয়া তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া প্রভুর চরণপ্রান্তে পড়িয়া গেলেন। প্রভু স্মিত মুখে প্রেমপূর্ণ দৃষ্টিতে তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিলেন।

গদাধরের চিরদিনের সাধ পূর্ণ হইল, শয়নে, ভোজনে, ভ্রমণে, উপবেশনে গদাধর এখন প্রভুর অন্তরঙ্গ সহচর, একান্ত ক্রীতদাস। মুখ তুলিয়া কথা বলেন না। প্রভু যখন তাঁহাকে জোর করিয়া নিকটে বসান, তখন গদাধর বাধা দিতে পারেন না, ক্ষণকাল পরে অলক্ষ্যে ধীরে ধীরে সরিয়া গিয়া মাথানত করিয়া নীচে গিয়া উপবেশন করেন। শ্রীবাস অঙ্গনে নৃত্যকালে প্রভু তাঁহাকে বামে রাখিয়া তাঁহার দক্ষিণ হস্তটী আপন হস্তে ধরিয়া নৃত্য করেন। প্রভুর স্পর্শে গদাধর আনন্দে

জড় প্রায় হইতেন। শ্রীমতী রাধার শুদ্ধ প্রেম গৌর-লীলায় গদাধর-রূপে মূর্ত্তি পরিগ্রহ করেন। সেই প্রেম এতদিনে পরিপূর্ণ রূপ লইয়া প্রকাশিত হইল, সেই প্রেম স্বাভাবিক গতিতেই মধুর ভাবের রূপ লইয়া প্রভুর প্রতি প্রবাহিত হইতে লাগিল।* ক্রমে তাহা এমনই গাঢ়তা প্রাপ্ত হইল যে মুহূর্ত্ত কালও প্রভুর বিচ্ছেদ সহ্য করিবার ক্ষমতা গদাধরের রহিল না।

প্রভু সন্ন্যাস অবলম্বন করিয়া নীলাচলে আসিলে পর প্রথম যে বৎসর গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ প্রভুকে দর্শন করিতে আসেন সেই বৎসর তাঁহাদের সহিত গদাধরও প্রভুর নিকটে চলিয়া আসেন এবং তাঁহার ইঙ্গিত ক্রমে ক্ষেত্র সন্ন্যাস অবলম্বন পূর্ব্বক নগর প্রান্তে যমেশ্বর টোটায়, শ্রীগোপীনাথের সেবা প্রকাশ করিয়া সেইখানেই অবস্থান করিতে থাকেন। প্রভু আসিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইতেন। পরম পণ্ডিত

---

* 'গদাধরের-মধুর ভাব', সম্পর্কে বহু পদাবলী আছে কয়েকটী উদ্ধৃত হইল :—

নাচয়ে গৌরাঙ্গ গদাধর রসে।
গদাধর নাচে পুন গৌরাঙ্গ বিলাসে॥

—নয়নানন্দ—

হোলি খেলত গৌর কিশোর।
রসবতী নারী গদাধর কোর॥

—শিবানন্দ—

গদাধর অঙ্গজিনি অঙ্গ হেলাইয়া।
বৃন্দাবন গুণ গান বিভোর হইয়া॥

—মুরারী গুপ্ত—

পূরব আবেশে ত্রিভঙ্গ হইয়ে।
পীত বসন আর মুরলী চাহে॥
প্রিয় গদাধর করিয়া কোলে।
কোথাছিলে কোথাছিলে গদ গদ বোলে।
ভাব বুঝি পণ্ডিত রহে বাম পাশে।
না বুঝিয়ে এই রঙ্গ নরহরি দাসে॥

গদাধর শ্রীমদ্ভাগবত খুলিয়া পাঠ করিতে বসিতেন। প্রভু হইতেন শ্রোতা। পাঠ করিতে করিতে গদাধরের বাহ্য জ্ঞান অন্তর্হিত হইত। শ্রোতা ও বক্তার নয়ন জলে শুষ্ক ভূমি কর্দ্দমাকার ধারণ করিত। আজ প্রভু লোক চোক্ষের অন্তরালে। গদাধরের প্রাণ, আজ নিত্যলীলায় প্রবিষ্ট। শুধু শূন্য দেহটী লইয়া গদাধর, প্রভুদত্ত টোটা গোপীনাথের মন্দিরে একাকী পড়িয়া আছেন। মধুর স্বরের ঝঙ্কার তুলিয়া 'গদাধর, ও গদাধর' বলিয়া টোটার দ্বার প্রান্ত হইতে আর কেহ ডাকেন না। সেই ডাকটুকুর অপেক্ষায় উদ্‌গ্রীব হইয়া থাকার প্রয়োজনও এইবারের মত শেষ হইয়া গিয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করাও তাঁহার শেষ হইয়াছে। পাঠ করিয়া শ্রবণ করাইবার জন্য আদেশ করিতেও আর কেহ নাই। অতএব এ জগতের সকল কাজই তাঁহার ফুরাইয়া গিয়াছে। তথাপি প্রভুর বিরহের বেদনা সহ্য করিয়া গদাধর কোন্ সুখের আশায় এখনও দেহ প্রকট করিয়া রাখিয়াছেন কেহ জানে না। তাঁহার অবস্থা এক প্রকার গ্রহ গ্রস্তের ন্যায় হইয়াছে, কখনও ঘণ্টার পর ঘণ্টা স্তব্ধ হইয়া বসিয়া থাকেন। কখনও বা করুণ সুরে ক্রন্দন করিতে থাকেন আর নয়ন বহিয়া অশ্রুর স্রোত বহিতে থাকে। কখনও বা থাকিয়া থাকিয়া উচ্চ হাস্য করিয়া উঠেন। এক একবার শ্রীমদ্ভাগবত খুলিয়া পাঠ করিতে বসেন, আর সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব্বস্মৃতি জাগিয়া উঠে। আর পাঠ করা হয় না। গ্রন্থ সরাইয়া রাখিয়া ক্রন্দন করিতে বসেন। জড় প্রায় হইয়া যখন বসিয়া থাকেন, তখন সময়ে সময়ে শ্বাস বন্ধ হইয়া যায়। শরীর দিয়া ঘর্ম্মের ধারা নামিতে থাকে। কখনও বা 'গোরা' নাম উচ্চারণ করিতে গিয়া 'গো' 'গো' বলিতে বলিতে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়েন। বাহ্য জ্ঞান নাই। আহার নিদ্রার চেষ্টা নাই। বহু যত্নে কেহ হয়ত কোনও দিন কিছু আহার করায়, কোনও দিন তাহাও হয় না।

এদিকে শ্রীনিবাস অতি প্রত্যূষে মার্কণ্ডেয় সরোবরে স্নানাদি সমাপন করিয়া জনৈক ব্রাহ্মণের সহায়তায় যমেশ্বর টোটায় গদাধরের

দ্বার প্রান্তে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। গদাধরের বসতি ভূমিতে আগমনের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার অন্তরে গৌর বিরহানল তীব্রভাবে পুনরায় জ্বলিয়া উঠিল। হৃদয়ের বেগ সংযত করিয়া কোনও প্রকারে শ্রীগোপীনাথের সম্মুখে আসিয়া ভূলুণ্ঠিত হইয়া প্রণাম করিতে করিতে উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিলেন। গদাধরের নিকটে সংবাদ পৌঁছিল শ্রীনিবাস আসিয়াছেন। সে সংবাদ তাঁহার কর্ণে পৌঁছিল কিনা বুঝা গেল না। তিনি যেমন বসিয়াছিলেন তেমনই বসিয়া রহিলেন। এদিকে কাঁদিতে কাঁদিতে হৃদয়ের ভার কিছুটা লঘু হইলে শ্রীনিবাস উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং গদাধরের চরণ দর্শনার্থে তদীয় কুটিরে প্রবেশ করিলেন। সম্মুখেই গদাধর স্তব্ধ হইয়া বসিয়া আছেন। তাঁহার অবস্থা দেখিয়া শ্রীনিবাসের হৃদয় যেন বিদীর্ণ হইতে লাগিল। চোখে অশ্রু নাই, ক্রন্দনের শক্তিও বুঝি লোপ পাইল। তিনি কাষ্ঠ-পুত্তলিকার ন্যায় এক পার্শ্বে করজোড়ে দাঁড়াইয়া রহিলেন। অন্যান্য ভক্তবৃন্দ শ্রীনিবাসের মুখের দিকে তাকাইয়া শঙ্কিত হইয়া পড়িলেন। এখনই হয়ত একটা অনর্থ ঘটিবে, এই আশঙ্কা করিয়া তাঁহারা মূর্চ্ছিত প্রায় শ্রীনিবাসকে কৌশলে সেখান হইতে সরাইয়া আনিলেন।* পরে বহু চেষ্টায় প্রকৃতিস্থ করিয়া শ্রীজগন্নাথ দর্শনে পাঠাইয়া দিলেন। দর্শনান্তে ফিরিয়া আসিলে তাঁহারা সযত্নে প্রসাদ সেবন করাইয়া বিশ্রামের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন।

পরদিন প্রভাতে শ্রীনিবাসকে সুযোগমত গদাধরের সম্মুখে লইয়া যাওয়া হইল। তিনি শ্রীমন্মহাপ্রভু ও শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর জয় দিতে দিতে তাঁহার নিকটে আসিয়া ভূলুণ্ঠিত হইয়া প্রণাম করিলেন। প্রভুর নাম কর্ণে প্রবিষ্ট হইবা মাত্রই গদাধরের আচ্ছন্ন ভাবটা যেন মুহূর্ত্ত-মধ্যে কাটিয়া গেল। "প্রভুর নাম কে শোনাইলে, কে তুমি ! কে তুমি", বলিতে বলিতে গদাধর তড়িৎ গতিতে উঠিয়া শ্রীনিবাসকে একেবারে বুকে জড়াইয়া ধরিলেন। তাঁহার নয়ন দিয়া অশ্রুর ধারা

* অনুরাগ বল্লী—২য় মঞ্জরী।

নামিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পর তিনি শ্রীনিবাসকে নিকটে বসাইলেন এবং তাঁহার মুখের প্রতি সাগ্রহে দৃষ্টিপাত করিয়া তাঁহাকে যেন চিনিতে চেষ্টা করিলেন। চিনিতে না পারিলেও তাঁহার মুখ দেখিয়া বুঝিলেন, ইনিও তাঁহার ন্যায় গৌর বিরহিগণের মধ্যে অবশ্যই কেহ হইবেন। গদাধর সস্নেহে তাঁহার অঙ্গে হাত বুলাইতে বুলাইতে পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। শ্রীনিবাসও বিনীতভাবে আত্ম-পরিচয় দিলেন। পরিচয় পাইয়া গদাধর বাৎসল্যরসে আত্ম-হারা হইয়া তাঁহাকে পুনরায় আলিঙ্গন দান করিলেন। পরে ক্রোড়ের নিকটে বসাইয়া তাঁহার সারা অঙ্গে হাত বুলাইতে বুলাইতে সস্নেহে বলিলেন— 'তুমি আসিবে, আমি তাহা স্বপ্নযোগে পূর্ব্ব হইতেই অবগত আছি।' অতঃপর গদাধর একে একে গৌড়বাসী ভক্তগণের সমাচার লইলেন। প্রভুর প্রসঙ্গ উঠিলে তিনি প্রেমাশ্রুবিগলিত কণ্ঠে গৌর কথা কহিতে লাগিলেন।

শ্রীনিবাসকে পাইয়া গদাধরের বাহ্যাবেশ যেন অনেকটা ফিরিয়া আসিল। তাঁহার সহিত নিরন্তর গৌর প্রসঙ্গে মত্ত থাকার ফলে তাঁহার আচ্ছন্ন ভাবটীও অনেকাংশে কাটিয়া গেল। শ্রীনিবাসের আগমন সংবাদ ইতিমধ্যে সর্ব্বত্র প্রচারিত হইয়াছে, ভক্তগণ তাঁহার সহিত মিলিত হইবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া আছেন। গদাধর জনৈক ভক্তের সহিত শ্রীনিবাসকে তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য পাঠাইয়া দিলেন। এখন নীলাচল গৌর-বিরহে যেন শোক রাজ্যে পরিণত হইয়াছে। প্রভুর অদর্শন বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া স্বরূপ দামোদর মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া ছিলেন, সে মূর্চ্ছা আর ভাঙ্গে নাই।* রঘুনাথ দাস গোস্বামী যখন প্রথমে শ্রীক্ষেত্রে আসেন তখন প্রভু তাঁহাকে স্বরূপের হাতে সমর্পণ করিয়াছেন এবং সেই হইতে প্রভু

* ১৪৫৫ শকের আষাঢ়ী শুক্লা দশমীতে শ্রীস্বরূপ দামোদর অপ্রকট হ'ন।

—মধুসূদন তত্ত্ববাচস্পতি 'কৃত-গৌড়ীয় বৈষ্ণব ইতিহাস।'

তাঁহাকে আদর করিয়া 'স্বরূপের রঘু' বলিয়া ডাকিতেন। আজ প্রভু অপ্রকট, স্বরূপও তাঁহাকে ছাড়িয়া প্রভুর সহিত অন্তর্হিত হইয়াছেন। এইরূপ অবস্থায় নিরাশ্রয় রঘুনাথের পক্ষে শ্রীক্ষেত্র বাস কোনক্রমেই সম্ভব হইল না। প্রভু দত্ত গুঞ্জামালা এবং শ্রীগোবর্দ্ধন শিলা হৃদয়ে ধারণ করিয়া তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে ইতঃপূর্ব্বেই নীলাচল ত্যাগ করিয়া শ্রীবৃন্দাবনের পথে যাত্রা করিয়াছেন। রাজা প্রতাপরুদ্র প্রভুর অদর্শনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া শিরে করাঘাত করিতে করিতে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়েন। রায় রামানন্দের যত্নে কোনও প্রকারে তাঁহার প্রাণ রক্ষা হয় বটে, কিন্তু শ্রীক্ষেত্রবাস অসহ্য হওয়ায় পুত্রের উপরে রাজ্য পরিচালনার ভার ছাড়িয়া দিয়া স্থানান্তরে গমন পূর্ব্বক ভজন সাধনে অভিনিবিষ্ট হইয়াছেন। শ্রীনিবাস সার্ব্বভৌমের গৃহ অভিমুখে যাত্রা করিলেন। রায় রামানন্দ ও সার্ব্বভৌম তখন নিভৃতে বসিয়া গৌর কথার মগ্ন, বিরহ সন্তাপে উভয়ের দেহ ক্ষীণ হইয়াছে, অবিরত ক্রন্দনে দৃষ্টি হইয়াছে দুর্ব্বল। শ্রীনিবাস দূর হইতে তাঁহাদিগকে দেখিয়া ব্যাকুলভাবে কাঁদিতে কাঁদিতে অগ্রসর হইয়া আসিলেন এবং সম্মুখে আসিয়া তাঁহাদের চরণ তলে দণ্ডবৎ হইয়া পড়িলেন। শ্রীনিবাসের আগমন সংবাদ তাঁহারা পূর্ব্বেই পাইয়াছেন, এখন দেখিয়াই বুঝিলেন এই সেই শ্রীনিবাস, তাঁহার করুণ অবস্থা দেখিয়া উভয়ের হৃদয় বেদনায় আলোড়িত হইল, নীরবে অশ্রু মোচন করিতে করিতে উভয়ে উঠিয়া আসিয়া তাঁহাকে ভূমি হইতে তুলিলেন। পরম স্নেহে আলিঙ্গন দান পূর্ব্বক নিকটে বসাইয়া বহু যত্নে তাঁহাকে প্রবোধ দিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু কে কাহাকে প্রবোধ দিবেন? শ্রীনিবাসের নয়নের অশ্রু মুছাইয়া দিতে যাইয়া তাঁহাদের চোখে জলের বন্যা প্রবাহিত হইতে লাগিল। বহুক্ষণ পর সকলে অপেক্ষাকৃত সংযত হইয়া কিছুক্ষণ প্রভুর প্রসঙ্গ আলোচনায় অতিবাহিত করিলেন। তাঁহাদের নিকট হইতে বিদায় লইয়া শ্রীনিবাস একে একে পরমানন্দ পুরী, বাণীনাথ, শিখি মাইতি, শঙ্কর, গোবিন্দ, বক্রেশ্বর পণ্ডিত ও গোপীনাথ আচার্য্য

প্রভৃতি প্রভুর পরিকরগণের সহিত মিলিত হইলেন। বিরহ-ব্যাকুল গৌর পরিকরগণের সহিত শ্রীনিবাসের মিলন প্রসঙ্গ বর্ণনা করিবার সামর্থ্য কাহারও নাই, সে চেষ্টাও করিব না। সেই হৃদয় বিদারক দৃশ্য ভক্তবৃন্দ হৃদয়ের দ্বারা অনুভব করিবেন। সকলের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া শ্রীনিবাস কাঁদিতে কাদিতে হরিদাস ঠাকুর মহাশয়ের ভজনক্ষেত্রের সিদ্ধ বকুল এবং স্বর্গদ্বারে গিয়া তাঁহার সমাধি দর্শন করিলেন। পরে তিনি স্বরূপ দামোদর এবং দাস গোস্বামীর ভজন-কুটীর দর্শন করিয়া রজে গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন। প্রভুর পরিকরগণের মধ্যে অনেকেই তাঁহার সঙ্গে সঙ্গেই ছিলেন। তাঁহার বেদনাময় অবস্থা দেখিয়া সকলের হৃদয় বিদীর্ণ হইতে লাগিল। অবশেষে তাঁহাকে লইয়া সকলে প্রভুর আবাস কুটীর 'গম্ভীরা' অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। শ্রীনিবাস ব্যাকুলভাবে প্রভুকে ডাকিতে ডাকিতে গম্ভীরার দ্বারদেশে আসিয়া গড়াগড়ি দিতে দিতে বিরহ বেদনায় কাতর হইয়া পড়িলেন। ভক্তগণও তাঁহার সহিত ব্যাকুল-ভাবে কাঁদিতে লাগিলেন। প্রভুকে লক্ষ্য করিয়া তাঁহারা কাতর কণ্ঠে বলিতে লাগিলেন—'প্রভু, তোমার আদরের শ্রীনিবাস আসিয়াছে, তোমার শ্রীচরণ দর্শনের জন্য বহু আশা লইয়া আসিয়াছে, একবার দেখা দিয়া উহার প্রাণরক্ষা কর,—বলিতে বলিতে তাঁহারা কাঁদিয়া আকুল হইলেন। গম্ভীরার দ্বারে ক্রন্দনের রোল উঠিল। বহুক্ষণ পর সকলে অশ্রু মুছিতে মুছিতে শ্রীনিবাসকে উঠাইয়া গম্ভীরা দর্শন করাইলেন। পরে শ্রীজগন্নাথ দর্শন করাইয়া তাঁহাকে গদাধরের নিকটে পাঠাইয়া দিলেন। শ্রীনিবাস অবনত শিরে কাঁদিতে কাঁদিতে টোটায় ফিরিয়া আসিলেন।

শ্রীনিবাসকে পাইয়া গদাধরের এবং অন্যান্য ভক্তবৃন্দের প্রাণের শীতলতা এবং প্রফুল্লতা অনেকাংশে ফিরিয়া আসিল। তাঁহাকে লইয়া তাঁহারা গৌর-প্রসঙ্গে দিন অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। কোনও দিন গদাধর শ্রীনিবাসকে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করিয়া শ্রবণ করান।

প্রভুকে পাঠ শ্রবণ করাইয়া গদাধর যে তৃপ্তি লাভ করিতেন শ্রীনিবাসকে শ্রবণ করাইয়া সেই তৃপ্তির অনুভবে আবিষ্ট হইয়া যাইতেন। একদিন শ্রীনিবাস ধরিয়া বসিলেন 'আমাকে শ্রীমদ্ভাগবত অধ্যয়ন করাইতে হইবে।' গদাধর ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া বেদনাসিক্ত কণ্ঠে বলিলেন—'আমার খুবই ইচ্ছা ছিল যে, তোমাকে শ্রীমদ্ভাগবত পড়াইব। কিন্তু এখানের গ্রন্থটীর সাহায্যে পাঠ দেওয়া আর সম্ভব হইবে না। এই গ্রন্থ অবলম্বনে আমি প্রভুকে প্রত্যহ পাঠ শ্রবণ করাইতাম। প্রভু নিজেও সময়ে সময়ে এই গ্রন্থই দেখিতেন। তাঁহার নয়নজলে গ্রন্থের অক্ষরগুলি স্থানে স্থানে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে, পত্রগুলিও জীর্ণপ্রায়। তুমি শ্রীধামে গমন করিয়া শ্রীজীবের নিকটে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ কর ইহাই আমার ইচ্ছা।' গদাধর অতঃপর গ্রন্থখানি আনিয়া শ্রীনিবাসকে দেখাইলেন। গ্রন্থখানি গদাধরের স্বহস্তে লিখিত। শ্রীনিবাস সযত্নে গ্রন্থের ডোর খুলিয়া দেখিলেন অক্ষরগুলি যেন মুক্তার ন্যায় ঝলমল করিতেছে। তবে স্থানে স্থানে সেগুলি মুছিয়া গিয়াছে। শ্রীনিবাস গ্রন্থখানি একবার মস্তকে আর একবার হৃদয়ে ধারণ করিতে লাগিলেন। অবিরল নয়নধারায় বুক ভাসিয়া যাইতে লাগিল। তাঁহার অবস্থা দর্শন করিয়া গদাধরও চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। অতি কষ্টে আত্মসংবরণ করিয়া তিনি শ্রীনিবাসকে শান্ত করিলেন।

ভক্ত-সঙ্গ, শ্রীজগন্নাথ দর্শন ও ভগবৎ প্রসঙ্গে কিছুদিন অতিবাহিত হইল। অতঃপর গদাধর একটী শুভদিন দেখিয়া শ্রীনিবাসকে গৌড়ে পাঠাইতে মনস্থ করিলেন। শ্রীনিবাসকে নিকটে বসাইয়া একদিন বলিলেন—"তোমার দ্বারায় প্রভু অনেক কার্য্য সাধন করিবেন। তোমার আর এখানে থাকিবার প্রয়োজন নাই। এখান হইতে গৌড়মণ্ডল হইয়া শ্রীধামে চলিয়া যাইবে, সেইখানে গিয়া শ্রীজীবের নিকটে শ্রীমদ্ভাগবত এবং অন্যান্য ভক্তি শাস্ত্র অধ্যয়ন করিবে।" শ্রীনিবাস নতশিরে গদাধরের আদেশ বাক্য শ্রবণ করিলেন।

এই সুখময় সঙ্গ ত্যাগ করিয়া যাইতে হইবে মনে করিয়া শ্রীনিবাস বেদনায় মুহ্যমান হইয়া পড়িলে গদাধর পরম স্নেহে তাঁহাকে আলিঙ্গন দিয়া স্বহস্তে নয়নবারি মুছাইয়া দিলেন।

যাত্রার দিন প্রভাতে শ্রীনিবাসকে বুকে জড়াইয়া গদাধর অনেকক্ষণ কাঁদিলেন, তাঁহাকে পাইয়া এই কয়দিন তিনি প্রভুর বিরহ তাপও ভুলিয়া ছিলেন, সেই বিরহ পুনরায় যেন নূতন করিয়া অনুভূত হইতে লাগিল। শ্রীনিবাস তাঁহার চরণে পড়িয়া নয়ন জলে চরণ যুগল ধৌত করিয়া দিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে অশ্রু মুছিতে মুছিতে শ্রীনিবাস যখন উঠিয়া দাঁড়াইলেন তখন গদাধর তাঁহার নিকটে অগ্রসর হইয়া মৃদু কণ্ঠে বলিলেন—গৌড়ে গিয়া দাস গদাধরকে* বলিবে যে—'তোমার মিতা অন্যবাড়ী যাইবেন।' এই কথার তাৎপর্য্য কিছু বুঝিতে না পারিয়া শ্রীনিবাস বিস্ময়ের দৃষ্টিতে তাঁহার প্রতি মুখ তুলিয়া চাহিলেন। গদাধরের বদনে এক রহস্য ব্যঞ্জক হাসি খেলিয়া গেল। কিন্তু মুখে কিছু বলিলেন না, শ্রীনিবাসও এ বিষয়ে আর কিছু জিজ্ঞাসা করিতে সাহস পাইলেন না। অতঃপর গদাধরের নিকট হইতে বিদায় লইয়া শ্রীনিবাস অন্যান্য ভক্তবৃন্দের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন, তাহার পর চোখের জল মুছিতে মুছিতে জনৈক পথ প্রদর্শকের সহিত গৌড় অভিমুখে যাত্রা করিলেন। ভক্তগণের মধ্যে অনেকেই বহুদূর পর্য্যন্ত তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে আসিলেন। পরে শূন্য হৃদয়ে কাঁদিতে কাঁদিতে নিজ নিজ আবাসে ফিরিয়া গেলেন।

---

* শ্রীল দাস গদাধর শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পরিকর ছিলেন এবং সর্ব্বদা গোপী-ভাবে মত্ত থাকিতেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আদেশে তিনি শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর সহিত গৌড়ে আসিয়া যুগধর্ম্ম শ্রীশ্রীনামসংকীর্ত্তন প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন। ইনি শ্রীরাধার বিভূতিস্বরূপ ছিলেন।

যথা :—গৌরগণোদ্দেশ দীপিকায়—

রাধা বিভূতিরূপা যা চন্দ্রকান্তিঃ পুরাস্থিতা।
সাদ্য গৌরাঙ্গ নিকটে দাসবংশো গদাধরঃ॥

গদাধর নিত্যানন্দ প্রভু ও অদ্বৈত প্রভুর লীলা সঙ্গোপন।

শ্রীনিবাস যথা সময়ে গৌড় মণ্ডলে উপনীত হইয়া দেখিলেন প্রভুর অন্তর্ধানের সংবাদ এখানে বহু পূর্ব্বেই পৌঁছিয়াছে। প্রভুর পরিকরগণের অবস্থা দেখিয়া শ্রীনিবাস ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। এমন সময় সরকার ঠাকুর মহাশয়ের কথা মনে পড়িল। তিনি বৃদ্ধ হইয়াছেন। সেই নিদারুণ সংবাদ শ্রবণের পর তাঁহার অবস্থা কি রূপ হইতে পারে কল্পনা করিতেই তিনি শঙ্কিত হইয়া উঠিলেন এবং কাল বিলম্ব না করিয়া দ্রুত গতিতে শ্রীখণ্ডে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সরকার ঠাকুর মহাশয়ের নিকটে আসিয়া তাঁহার অবস্থা যাহা দেখিলেন তাহা বর্ণনার অতীত। তাঁহার শীর্ণ দেহ শীর্ণতর হইয়াছে। প্রাণটী কোনও প্রকারে ধরিয়া আছেন মাত্র। শ্রীনিবাস আসিয়া হাহাকার করিয়া তাঁহার চরণ তলে লুটাইয়া পড়িলেন। সরকার ঠাকুর মহাশয় তাঁহার শীর্ণ কর যুগল দ্বারা শ্রীনিবাসের মস্তকটি ভূমি হইতে তুলিয়া আপনার বুকে চাপিয়া ধরিলেন। প্রবল আবেগে তাঁহার সমস্ত অঙ্গ কম্পিত হইতে লাগিল। তাঁহার নয়ন বারিতে শ্রীনিবাসের মস্তক ধৌত হইতে লাগিল। শ্রীনিবাস তাঁহার বক্ষে মস্তক রাখিয়া ব্যাকুলভাবে কাঁদিতে লাগিলেন। বহুক্ষণ এই ভাবে অতীত হইলে পর উভয়ে অতিকষ্টে মনকে সংযত করিয়া স্থির হইয়া বসিলেন। সরকার ঠাকুর মহাশয় মৃদু কণ্ঠে নীলাচলবাসী ভক্ত-বৃন্দের সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন। শ্রীনিবাসও কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁহাদের অবস্থার কথা বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা করিতে লাগিলেন। গদাধরের কথা বলিতে গিয়া অবশেষে ভাবাবেগে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন।

সেইদিন শ্রীনিবাস সরকার ঠাকুর মহাশয়ের নিকটেই রহিলেন এবং সুযোগ মত শ্রীখণ্ডবাসী অন্যান্য ভক্তগণের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আসিলেন। সরকার ঠাকুর মহাশয়ের নিকটে শ্রীনিবাস একখানি শ্রীমদ্ভাগবত প্রার্থনা করিলে, তিনি তাহা সংগ্রহ করিয়া দিলেন। রাত্রে একাকী শয়ন করিয়া শ্রীনিবাস নিজের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে চিন্তা করিতে লাগিলেন। বুঝিলেন গদাধরকে ছাড়িয়া থাকা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব। অতএব শ্রীধামে না গিয়া তিনি পুনরায় শ্রীক্ষেত্রে গমন করিয়া তাঁহার নিকটে থাকিয়াই শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করিবেন, মনে মনে ইহাই স্থির করিয়া তিনি পরদিন প্রাতঃকালে পুনরায় নীলাচল অভিমুখে যাত্রা করিলেন। ক্ষিপ্র গতিতে চলিতে চলিতে শ্রীনিবাস অতি অল্প সময়ের মধ্যেই যাজপুরে আসিয়া উপনীত হইলেন। আর কয়েক দিনের মধ্যেই গদাধরের দর্শন পাইব এই আশায় মন উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। কিন্তু শ্রীনিবাসের কামনা আর পূর্ণ হইল না। যাজপুরে আসিয়া নীলাচল হইতে প্রত্যাগত যাত্রিগণের মুখে তিনি শুনিলেন 'গদাধর প্রকটলীলা সঙ্গোপন করিয়াছেন।' সংবাদটী কর্ণগোচর হইবামাত্র শ্রীনিবাস গভীর মূর্চ্ছায় আক্রান্ত হইয়া ঢলিয়া পড়িলেন। তাঁহার সহচর এবং যাত্রিগণের চেষ্টায় বহুক্ষণ পর সংজ্ঞালাভ করিলেন। তখন উঠিয়া বসিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। কাঁদিতে কাঁদিতে আবার মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। এইরূপ পুনঃ পুনঃ মূর্চ্ছা হইতে লাগিল। তাঁহার অবস্থা দেখিয়া সকলে বিশেষ চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। কিন্তু যে নির্দ্দিষ্ট কার্য্য সম্পাদনের জন্য তিনি অবতীর্ণ হইয়াছেন, সেই কাজটী এখনও সম্পন্ন হয় নাই। এত দুঃখের মধ্যেও বোধ হয় সেই কারণেই তাঁহার প্রাণ দেহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হয় হয় নাই। শ্রীনিবাস হাহাকার করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। এক একবার শিরে করাঘাত করিতেছেন। কখনও বা ভূমিতে ঘর্ষণ করিয়া মুখ ক্ষত বিক্ষত করিতেছেন। কিজন্য গদাধর তাঁহাকে তাড়াতাড়ি এক প্রকার জোর করিয়া বিদায় দিলেন তাহা এইবার তিনি

বুঝিতে পারিলেন। আবার মনে পড়িল, বিদায়কালে তিনি দাস গদাধরের নাম করিয়া বলিয়াছিলেন—'তাহাকে বলিও তোমার মিতা অন্য বাড়ী যাইবেন।' তখন ইহার অর্থ বুঝিতে না পারিলেও আজ তাহা জলের মত স্বচ্ছ হইয়া গেল, কিন্তু ইহাও তাঁহার বুঝিতে বিলম্ব হইল না যে প্রভুর অদর্শনের পর দুঃসহ বিরহ যন্ত্রণা সহ্য করিয়া তিনি যে কয়টা দিন প্রকট ছিলেন, তাহা শুধু তাঁহাকে দর্শন দিবার জন্যই। শ্রীনিবাস কাঁদিতে কাঁদিতে উঠিয়া বসিলেন, ভাবিতে লাগিলেন প্রভুর প্রকটলীলা দর্শনের সাধ চিরদিনের মত তাঁহার অপূর্ণই রহিয়া গেল। গদাধরের চরণ তলে বসিয়া প্রভুর গুণানুবাদ শ্রবণ করিতে করিতে তাঁহার নিকটে শ্রীমদ্ভাগবত অধ্যয়ন করিবেন, মনের এই আশাটুকুও চিরদিনের জন্য তিরোহিত হইয়া গেল। শ্রীনিবাস জ্ঞানহারা হইয়া উন্মত্তের ন্যায় পথে বিপথে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। একদিন রাত্রে তিনি তন্দ্রাচ্ছন্নভাবে পড়িয়া আছেন এমন সময় স্বপ্নযোগে গদাধর আবির্ভূত হইয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা দিয়া গেলেন। ইহাতে শান্তি লাভ করা দূরে থাক, বিরহ যন্ত্রণা আরও যেন বাড়িয়া গেল। অবশেষে পুনরায় একদিন গদাধরকে লইয়া প্রভু স্বয়ং আবির্ভূত হইলেন এবং নানাপ্রকারে তাঁহাকে প্রবোধ দিয়া বলিলেন 'তুমি গৌড়দেশ হইয়া শ্রীধামে যাও, সেইখানে তোমার সকল বাসনা পূর্ণ হইবে আর দুঃখ করিও না'—বলিতে বলিতে তাঁহারা অন্তর্হিত হইলে শ্রীনিবাসও কাঁদিতে কাঁদিতে উঠিয়া বসিলেন। প্রভুর আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া পরদিন প্রভাতে দুঃখভারাক্রান্ত হৃদয়ে তিনি পুনরায় গৌড় দেশের উদ্দেশ্যে ধীর গতিতে অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

আশার মুকুলগুলি বিকশিত হইতে না হইতেই প্রতিকুল ভাগ্য আসিয়া পুনঃ পুনঃ বৃন্তচ্যুত করিয়া দিয়া শ্রীনিবাসের সকল উদ্যমকে ব্যর্থ করিয়া দিতেছে। ব্যর্থতা ও হতাশার দুঃসহভার হৃদয়ে ধারণ করিয়া শ্রীনিবাস ফিরিয়া চলিয়াছেন। মন হইতে আরও একটি

ভবিষ্যতের নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মসূচি মুছিয়া ফেলিয়া দিয়া লক্ষ্যহীন ভাবেই অগ্রসর হইতেছেন। এইবার আরও একটি দুঃসহ আঘাত কিশোর শ্রীনিবাসের কোমল হৃদয়টীকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দিবার জন্য অনতি দূরেই অপেক্ষা করিতে ছিল। পথে আসিতে আসিতে নীলাচল গামী কয়েক জন গৌড়ীয় ভক্তের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু এবং শ্রীমৎ অদ্বৈত প্রভুর সঙ্গোপন বার্ত্তা তাঁহারাই শ্রীনিবাসকে শ্রবণ করাইয়া দিলেন।* এই মর্ম্মান্তিক সংবাদ শ্রবণ করিবামাত্র শ্রীনিবাস হত চেতন হইয়া ভূমিতে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। সেই অসহনীয় করুণ দৃশ্য আর বর্ণনা করিব না। সে সামর্থ্যও নাই। সংসারের সকল কামনা ও সুখ সাচ্ছন্দকে বিসর্জ্জন দিয়া প্রেমের গ্রন্থিতে আবদ্ধ করিয়া কিশোর হৃদয়টীতে সর্ব্বান্তঃকরণে যাঁহাদিগকে প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয় বোধে হৃদয়ের সিংহসনে পরম আদরে বসাইয়া রাখিয়াছিলেন, প্রেমাশ্রুর উপহার দিয়া যাঁহাদিগকে অর্চ্চনা করিয়া আসিয়াছলেন আশৈশব, এত পরিশ্রমেও একবার তাঁহাদের শ্রীচরণ দর্শন করিতে না পাওয়ার যে কঠিন আঘাত এই কোমল হৃদয়ে কি মর্ম্মান্তিক হইয়া বাজিবে, কাহার সাধ্য যে তাহা বর্ণনা করিয়া বুঝাইয়া দিবে? সমস্ত দিবস ও রাত্রি তাঁহার ক্রন্দনের মধ্যেই কাটিয়া গেল। শেষ রাত্রে তাঁহার তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থার মধ্যে শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু ও শ্রীঅদ্বৈত প্রভু আবির্ভূত হইয়া নানা প্রকার স্নেহ বাক্যে তাঁহাকে প্রবোধ দিতে দিতে বলিলেন—'আমরা সর্ব্বদা তোমার সঙ্গে সঙ্গেই রহিলাম, শোক পরিত্যাগ কর। তোমার এই দেহ দ্বারা প্রভুর বহু কার্য্য সাধিত হইবে। অতএব সাবধানে এই দেহ রক্ষা করিতে হইবে। তুমি অবিলম্বে গৌড় মণ্ডল দর্শন করিয়া শ্রীবৃন্দাবনে চলিয়া যাও'—এইরূপে তাঁহারা তাঁহার কর্ত্তব্য আদেশ

* অদ্বৈত প্রকাশের মতে শ্রীল অদ্বৈত প্রভুর অপ্রকট কাল ১৪৭৯ শকাব্দ। কিন্তু নানা কারণে এই মত নির্ভুল বলিয়া মনে হয় না। দীনেশ সেন মহাশয়ও উক্ত তারিখ বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন।

করিয়া অন্তর্হিত হইলেন। পরদিন প্রত্যূষে তাঁহাদের আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া শ্রীনিবাস পুনরায় উঠিয়া দাঁড়াইলেন। শোক তাপের বেদনাকে সংযমের কঠোর আবরণে আবদ্ধ করিয়া অশ্রু মুছিতে মুছিতে গৌড়ের পথে পুনরায় অগ্রসর হইয়া চলিলেন।

গৌড় মণ্ডল ভ্রমণ।

শ্রীনিবাস কয়েক দিনের মধ্যেই শ্রীখণ্ডে সরকার ঠাকুর মহাশয়ের সমীপে উপনীত হইলেন। পুনঃ পুনঃ আঘাতের ফলে তাঁহার দেহ আরও যেন শীর্ণ হইয়া পড়িয়াছিল। তাঁহার দেহের ও মনের অবস্থা দেখিয়া শ্রীনিবাস সবিশেষ চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। এখানে আসিবার পর শ্রীনিবাস সুযোগ মত স্থানীয় ভক্তগণের চরণ দর্শনাদি করিয়া আসিলেন। এই সময় শ্রীনিবাস কয়েকদিন সরকার ঠাকুর মহাশয়ের নিকট অবস্থানও করিয়াছিলেন। পরে তিনি শ্রীখণ্ড হইতে বিদায় লইয়া নবদ্বীপে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।* নদীয়ার দ্বারদেশে আসিয়া শ্রীনিবাসের মন ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিল। এই সেই নদীয়া! যাহার প্রত্যেকটি পথ সংকীর্ত্তনোন্মত্ত সপরিকর শ্রীমন্মহাপ্রভুর চরণ-চিহ্ন বুকে ধারণ করিয়া রহিয়াছে। প্রভুর প্রেম-কণ্ঠের ঝঙ্কারে একদিন নদীয়ার আকাশ বাতাস তরঙ্গায়িত হইয়া উঠিয়াছিল। তাঁহার প্রণয় বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া এখানের প্রতিটি প্রাণী একদিন সেই সঙ্কীর্ত্তন-তরঙ্গে পরমানন্দে সাঁতার দিয়াছিল। কিন্তু আজ; আজ প্রভু অন্তর্হিত সেই আনন্দের হাট ভাঙ্গিয়াছে। শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু ও শ্রীমৎ অদ্বৈত

* সম্ভবতঃ এই সময় শ্রীনিবাস গৌড় মণ্ডলে যান নাই। প্রেম বিলাসের মতে অদ্বৈত প্রভুর অপ্রকটের ১৩ বৎসর পর, অর্থাৎ প্রায় ১৪৬৯ শকে, ২৮ বৎসর বয়সে তিনি গৌড় যাত্রা করেন। এই সিদ্ধান্ত অযৌক্তিক নহে। মধ্যবর্ত্তী কালে তিনি সম্ভবতঃ যাজিগ্রামেই ছিলেন এবং মধ্যে মধ্যে শ্রীখণ্ড প্রভৃতি যাতায়াত করিতেন। —ইতিহাস-প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য।

প্রভুও আজ অন্তর্হিত। যে কয়জন পরিকর প্রকট থাকিয়া এখনও নবদ্বীপে বাস করিতেছেন, তাঁহারা সেই লীলার স্মৃতিটুকু হৃদয়ে ধরিয়াই যেন পড়িয়া আছেন এবং প্রভু কবে তাঁহাদিগকে শ্রীচরণ সমীপে ডাকিয়া লইবেন সেই আশায় দিন গুনিতেছেন। দুঃখে এবং হতাশায় কাতর হইয়া শ্রীনিবাস পথের পার্শ্বে একস্থানে আসিয়া বসিয়া পড়িলেন। তাঁহার দুই নয়ন বহিয়া অবিরল ধারে অশ্রু ঝরিতে লাগিল। এইরূপ বসিয়া বসিয়া ক্রন্দন করিতে করিতে অকস্মাৎ শ্রীনিবাস এক সময় ভাবনেত্রে যেন প্রত্যক্ষের ন্যায় দেখিলেন—"সঙ্কীর্ত্তন তরঙ্গে ভাসিতে ভাসিতে প্রভু সপরিকরে সেই পথ ধরিয়া যেন আগাইয়া আসিতেছেন।" চকিতে দর্শন ঘটিয়া গেল, তাহার পর আবার সেই অন্ধকার, আর কোথাও কিছু নাই। পথের পার্শ্বে পড়িয়া পড়িয়া শ্রীনিবাস বহুক্ষণ কাঁদিলেন। পরে ঈষৎ শান্ত হইয়া পুনরায় উঠিলেন এবং ধীরে ধীরে প্রভুর গৃহাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। ধৈর্য্য ধরিয়া শ্রীনিবাস কোনও প্রকারে প্রভুর গৃহের দ্বারদেশ পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়া আসিলেন; কিন্তু আর পারিলেন না। প্রবল বেদনার ভারে সেইখানেই পড়িয়া গেলেন এবং পড়িয়া পড়িয়া কাতর স্বরে কাঁদিতে লাগিলেন। প্রথমেই বংশীবদনের সহিত দেখা হইল, তাহার পর ক্রন্দনের শব্দ পাইয়া জননী শচী দেবীর সেবক ঈশান বাহির হইয়া আসিলেন। নিকটে আসিতেই শ্রীনিবাস তাঁহাদের চরণ বন্দনা করিলেন। পরিচয় পাইয়া তাঁহারাও তাঁহাকে বুকে ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে আলিঙ্গন করিলেন।

বংশীবদন শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া ঠাকুরাণীর শিষ্য এবং বর্ত্তমানে দেবীর অন্তরঙ্গ সেবকগণের অন্যতম। আর ঈশান হইলেন প্রভুর বাল্যকালের সখা এবং অন্তরঙ্গ ভৃত্য। এই গৃহে থাকিয়াই তিনি বিশ্বরূপের সন্ন্যাস দেখিলেন। প্রভুর বিবাহের সময় এই গৃহে থাকিয়া কতই না আনন্দ করিলেন। প্রভুর যখন পিতৃ বিয়োগ হয় তখন তাহাও দেখিলেন। তাহার পর প্রভু সন্ন্যাস লইলেন। আনন্দের মেলা ভাঙ্গিয়া গেল।

শচীর অঙ্গণ শূন্য হইল। বৃদ্ধা জননী শ্রীশচী দেবীর মুখ চাহিয়া ধৈর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক তাঁহার সেবা লইয়া তিনি দিন কাটাইতে লাগিলেন। এখন প্রভু অন্তর্হিত জননী শ্রীশচী দেবীও নিত্যলীলায় প্রবিষ্টা। ঈশান কিন্তু এখনও এই গৃহেই রহিয়া গিয়াছেন। সর্ব্বহারা প্রিয়াজীকে শূন্য গৃহে ফেলিয়া যাইতে তাঁহার মন স'রে নাই। তাই তিনি এখনও প্রিয়াজীর শ্রীচরণ সান্নিধ্যে নির্জ্জন গৃহের একান্তে পড়িয়া আছেন।

শ্রীনিবাসকে আশ্বস্ত করিয়া ঈশান, দেবীর নিকটে তাঁহার আগমন সংবাদ জ্ঞাপন করিলে, দেবী তাঁহাকে অন্তঃপুরে লইয়া যাইবার জন্য আদেশ দিলেন। কথিত আছে পূর্ব্বরাত্রে প্রভু দেবীকে স্বপ্নে আবির্ভূত হইয়া বলিয়াছিলেন,—'আমার শ্রীনিবাস বহুতাপ পাইয়া তোমার নিকটে যাইতেছে, তাহাকে শান্ত করিয়া সযত্নে পালন করিবে।' ইতিপূর্ব্বে বাহিরের আর কোনও পুরুষ দেবীর অন্তঃপুরে প্রবেশাধিকার লাভ করেন নাই। সেবকেরা সময়ে সময়ে পর্দ্দার অন্তরাল হইতে শ্রীচরণ দর্শন পাইয়া ধন্য হইতেন। শ্রীনিবাস দ্বার প্রান্তে আসিয়া দেবীর উদ্দেশ্যে সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ হইয়া পড়িলে ঈশান দেবীকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন—'শ্রীনিবাস প্রণাম করিতেছেন,' দেবী দূর হইতে শ্রীনিবাসকে দেখিয়া বাৎসল্যরসে আপ্লুত হইলেন। আর অন্তরালে থাকিতে না পারিয়া তাঁহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন এবং পরম স্নেহ-সম্ভাষণে তাঁহার সকল বেদনা মুছাইয়া দিলেন। অতঃপর তাঁহাকে নিকটে বসাইয়া তাঁহার ভ্রমণ বিষয়ক সকল কথা শুনিতে লাগিলেন। প্রভুর দর্শনের আশায় নীলাচল যাত্রা এবং পথিমধ্যে অদর্শন সংবাদ প্রাপ্তির কাহিনী শ্রবণ করিতে করিতে তাঁহার প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠিল। কিন্তু অদ্ভুত সংযম শক্তির দ্বারা দেবী এই সন্তান তুল্য শ্রীনিবাসের নিকটে অন্তরের ভার বিন্দুমাত্র প্রকাশ পাইতে দিলেন না। শুধু তাঁহার অলক্ষ্যে সিক্ত নয়ন অঞ্চল দ্বারা মুছিয়া ফেলিলেন। অতঃপর দেবী শ্রীনিবাসকে পরম যত্ন সহকারে স্নানাহার করাইয়া বিশ্রামার্থে ঈশানের সহিত বহির্বাটীতে পাঠাইয়া দিলেন।

প্রভু যেদিন সন্ন্যাস গ্রহণ করেন, সেইদিন হইতে দেবীর কৃচ্ছ্র সাধনার সূচনা হয়। এখন তাহা চরমে উঠিয়াছে। ঈশান ব্যতীত তিনি অপর কোন পুরুষের মুখাবলোকন করিতেন না। পরে প্রভু যখন জননী ও বধূর সেবা পরিচর্য্যার জন্য দামোদর পণ্ডিতকে প্রেরণ করেন, তখন হইতে প্রভুর ইঙ্গিত বুঝিয়া তাঁহার নিকটে বহির্গত হইতে সঙ্কোচ করিতেন না। পরে আসিলেন বংশীবদন। পরম বাৎসল্যে নিমগ্ন হইয়া দেবী তাঁহাকে শিষ্যরূপে গ্রহণ করিলেন। শ্বশ্রূমাতা যতদিন প্রকট ছিলেন, দেবী ততদিন রাত্রিশেষে তাঁহার সহিত গঙ্গাস্নান করিয়া আসিতেন এবং তৎপরে সমস্ত দিনের মধ্যে আর কোন কারণেই বাহিরে আসিতেন না। ঠাকুরাণীর অপ্রকটের পর হইতে দেবী গৃহ হইতে বাহির হওয়া সম্পূর্ণ বন্ধ করিয়া দেন এবং নিরন্তর অন্তঃপুর প্রকোষ্ঠে নিজেকে অন্তরীণ রাখিয়া দাসীগণ পরিবৃতা হইয়া কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। এই অন্তঃপুর উচ্চ প্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিল। বহির্দ্বার সম্পূর্ণ অবরুদ্ধ থাকিত, প্রাচীরের গাত্রে কাঠের সিঁড়ি লাগাইয়া দাসীগণ যাতায়াত করিতেন। দামোদর পণ্ডিত নিজ স্কন্ধে করিয়া দেবীর ব্যবহার্য্য জল, গঙ্গা হইতে বহিয়া আনিয়া দিতেন। সেই জলে স্নানাদি যাবতীয় কার্য্য সম্পন্ন করিতেন। দেবী প্রত্যহ স্নানান্তে সম্মুখে দুইটী ঘট লইয়া জপ করিতে বসিতেন। একটি ঘট শূন্য এবং অপরটি আতপ চাউল দ্বারা পূর্ণ থাকিত। একবার হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র নাম জপ করিতেন আর চাউল-পূর্ণ ঘট হইতে একটী তণ্ডুল তুলিয়া লইয়া অপরটীতে রাখিতেন। এইরূপে সংখ্যা রাখিয়া জপ করিতে করিতে দিবা দ্বিতীয় প্রহর অতিক্রম করিয়া তৃতীয় প্রহর সমাগত হইলে সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট সামান্য যে চাউল কয়টী জমা হইত সেইগুলি স্বহস্তে পাক করিয়া গৃহ দেবতা এবং প্রভুকে নিবেদন করিয়া তাহারই কিয়দংশ গ্রহণ করিতেন, পরে প্রসাদ সেবনান্তে পুনরায় জপে বসিতেন। সমস্ত দিবস এই ভাবেই অতিবাহিত হইত। বিনিদ্রভাবে জপ করিতে করিতে রাত্রিও কাটিয়া যাইত। এইরূপে জপ

করিতে করিতে সময়ে সময়ে ভাবোদয় হইত। কম্প অশ্রু পুলকাদিতে বিভূষিত হইয়া কখনও হাস্য আবার কখনও বা ক্রন্দন করিতেন। অত্যন্ত ক্লান্তি বোধ করিলে কোনও কোনও দিন প্রভুর পর্য্যঙ্কের নীচে ভূমি-শয্যা আশ্রয় করিয়া কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়া লইতেন। এই প্রকার অসহনীয় কঠোরতায় দেবীর দেহ ক্রমেই ক্ষীণ হইয়া আসিতে লাগিল, তাঁহার শরীরের অবস্থা দেখিয়া সেবকগণ সাক্ষাতে কিছু বলিতে সাহস পাইতেন না, শুধু গোপনে পরস্পর আলোচনা করিতেন এবং অশ্রুবর্ষণ করিয়া হৃদয়ের ভার লাঘব করিতেন।

প্রভুর পরিকরগণের মধ্যে শ্রীবাস, দাস গদাধর, মুরারি গুপ্ত প্রভৃতি কয়েকজন এখনও কোনও রূপে প্রাণ ধারণ করিয়া নবদ্বীপেই রহিয়াছেন। অবিরত হা-হুতাশ এবং বিরহ যন্ত্রণায় তাঁহাদের দেহের যেরূপ অবস্থা হইয়াছে, তাহাতে দেখিলে সহসা তাঁহাদিগকে চিনিতে পারা যায় না। শ্রীনিবাস একে একে সকলের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। শ্রীবাস-গৃহিণী মালিনী দেবী শ্রীনিবাসকে পাইয়া স্নেহ ভ'রে কোলে লইলেন এবং ভাবাবেগে কাঁদিতে লাগিলেন। দাস গদাধরের নিকটে আসিতেই গদাধর পণ্ডিতের উক্ত সেই প্রহেলিকার কথা তাঁহার মনে পড়িয়া গেল। দুঃখের তরঙ্গে পড়িয়া এতদিন শ্রীনিবাস সে কথা বিস্মৃত হইয়া গিয়াছিলেন। এখন শ্রীনিবাস দাস গদাধরকে সেই প্রহেলিকার কথা এবং পণ্ডিতের অদর্শন বার্ত্তাও শ্রবণ করাইলেন। সেই সকল কথা শ্রবণ করিয়া তিনি অধীর হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন—'তুমি একথা পূর্ব্বে জানাইলে আমি হয়ত একবার তাঁহার দর্শন পাইতাম, তুমি আমাকে সেই সুখ হইতে বঞ্চিত করিলে,—'বলিতে বলিতে গভীর অভিমান ভরে বলিলেন—'যাও আমি আর তোমার মুখ দর্শন করিব না।' শ্রীনিবাস কাঁদিতে কাঁদিতে দেবীর নিকটে ফিরিয়া আসিলেন। বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী সমস্ত ঘটনা অবগত হইয়া দাস গদাধরকে বলিয়া পাঠাইলেন—'শ্রীনিবাস নিতান্ত

বালক, অতএব তোমার ক্রোধের যোগ্য নহে, তুমি তাহাকে ক্ষমা করিবে।' দেবীর আদেশে তিনি শ্রীনিবাসকে ক্ষমা করিলেন।*

দেবীর শ্রীচরণ সমীপে শ্রীনিবাস কয়েকদিন কাটাইলেন, পরে একদিন শ্রীবৃন্দাবন যাত্রার সঙ্কল্প করিয়া করযোড়ে অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। তখন দেবী সস্নেহে বলিলেন 'নানা কারণে তোমার শরীর দুর্ব্বল হইয়া গিয়াছে, অতএব আরও কিছুদিন আমার নিকটে থাক, তাহার পর সুযোগ মত শ্রীধামে যহিলেই চলিবে'। তাঁহার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিতে না পারিয়া শ্রীনিবাস আরও কিছুদিন নবদ্বীপে বাস করিতে মনস্থ করিলেন। কয়েকদিন পর তিনি দেবীর আদেশে গৌড়মণ্ডলের ভক্তগণের শ্রীচরণ দর্শনার্থে ঈশানের সহিত বহির্গত হইয়া প্রথমেই শান্তিপুর অভিমুখে রওনা হইলেন। বিদায় গ্রহণ-কালে দেবী বলিলেন,—'তুমি কোনরূপ দুঃখ করিও না। শান্তিপুরে গিয়া অবশ্যই অদ্বৈত প্রভুর দর্শন লাভ করিবে'। শ্রীনিবাস ইতিপূর্ব্বে একদিন স্বপ্নযোগে শচীমাতা ঠাকুরাণীর দর্শন লাভ করিয়াছিলেন। এখন অদ্বৈত প্রভু কিভাবে দর্শন দিবেন তাহা অনুমান করিতে না পারিলেও তিনি সেই আশা হৃদয়ে ধরিয়াই বহির্গত হইলেন।

যথা সময়ে শ্রীনিবাস শান্তিপুরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এখানে আগমন করিয়াই তিনি দেখিলেন আজানুলম্বিত বাহুযুগলে পরিশোভিত একজন মহাপুরুষ, তাঁহার তেজোময় প্রশান্ত গম্ভীর মূর্ত্তি লইয়া সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। শ্রীনিবাস তাঁহাকে অদ্বৈত প্রভু বলিয়া চিনিতে পারিলেন এবং তৎক্ষণাৎ তাঁহার চরণে পড়িয়া ব্যাকুলভাবে কাঁদিয়া উঠিলেন। অদ্বৈত প্রভু পরম স্নেহে তাঁহাকে হাতে ধরিয়া উঠাইলেন এবং মস্তকে হস্তার্পণ করিয়া বলিলেন 'আমি যে তোমাকে দর্শন দিলাম একথা কাহারও নিকট প্রকাশ করিও না। তোমাকে এইবার শ্রীবৃন্দাবন যাত্রা করিতে হইবে। প্রভু তোমার জন্যই গোপাল ভট্টকে সেইখানে রাখিয়াছেন। তাঁহার নিকটে দীক্ষা

* অনুরাগবল্লী ২য় মঞ্জরী।

গ্রহণ করিয়া তুমি শ্রীজীবের নিকটে ভক্তিশাস্ত্র অধ্যয়ন করিবে। কিছুমাত্র দুঃখ করিও না। আমরা সর্ব্বদা তোমার সঙ্গে সঙ্গেই রহিলাম জানিবে'—বলিতে বলিতে তিনি অন্তর্হিত হইলেন। শ্রীনিবাস অদ্বৈত প্রভুর কৃপা অনুভব করিয়া নিজেকে কৃতার্থ জ্ঞান করিলেন। তাঁহার নয়ন বহিয়া অবিরল ধারে অশ্রু ঝরিতে লাগিল কিছুক্ষণ পর ঈষৎ সংযত হইয়া তিনি ধীরে ধীরে শ্রী ও সীতাদেবীর চরণ দর্শনার্থে অদ্বৈত প্রভুর গৃহ অভিমুখে রওনা হইলেন। সেখানে আসিয়া শ্রীনিবাস দেবীগণের এবং অচ্যুতানন্দাদি প্রভু-সন্তানগণের চরণ বন্দনা করিয়া আপনাকে ধন্য জ্ঞান করিতে লাগিলেন। সীতাদেবী পরম স্নেহে বিগলিত হইয়া স্বহস্তে রন্ধন করিলেন এবং ভোগ নিবেদন পূর্ব্বক তাঁহাকে নিকটে বসাইয়া প্রসাদ সেবন করাইলেন। শ্রীনিবাস অতঃপর শান্তিপুর হইতে বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক খড়দহের উদ্দেশ্যে যাত্রা করিলেন। শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর বিরহে তখন খড়দহ এক প্রকার শোক নগরীতে পরিণত হইয়াছে। শ্রীনিবাস আসিয়া অশ্রুত্যাগ করিতে করিতে একেবারে শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শ্রীমন্নিত্যানন্দ তনয় বীরভদ্র প্রভুর দর্শনলাভ করিয়া শ্রীনিবাস তাঁহার চরণ বন্দনা করিলেন। পরিচয় অবগত হইয়া বীরভদ্র প্রভু তাঁহাকে উঠাইয়া সাদরে আলিঙ্গন করিলেন, এবং তৎপরে তাঁহার হস্ত ধারণ পূর্ব্বক জননী জাহ্নবা ও বসুধা ঠাকুরাণীর নিকটে লইয়া গিয়া তাঁহার পরিচয় করাইয়া দিলেন, বলিলেন—'মা, প্রভুর আদেশে শ্রীনিবাস শ্রীধামে যাইতে মনস্থ করিয়াছে, আপনারা আশীর্ব্বাদ করুন যেন ইহার মনস্কামনা পূর্ণ হয়।' শ্রীনিবাস প্রণাম করিলে তাঁহারা স্নেহভরে তাঁহার শিরে হস্ত দিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। জাহ্নবা দেবী শ্রীনিবাসকে এখান হইতে খানাকুল কৃষ্ণনগরে অভিরাম গোপাল গোস্বামী প্রভুর দর্শনার্থে প্রেরণ করেন। বীরভদ্র প্রভু পরিচয় পত্র লিখিয়া দিলে, শ্রীনিবাস তাহা লইয়া যাত্রা করিলেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর পরিকরগণের মধ্যে অভিরাম অতি তেজস্বী পুরুষ ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ লীলায় দ্বাদশ গোপালের অন্যতম শ্রীদামই গৌর-লীলায় অভিরাম গোপাল নামে খ্যাত হন। জীব-সমাজ চর্ম্ম-চক্ষে তাঁহাদের জন্মাদি দর্শন করিলেও প্রকৃতপক্ষে প্রাকৃত দেহধারী জীবের ন্যায় জন্ম ও দেহ পরিবর্ত্তনাদি তাঁহাদের নাই। প্রাকৃত জীবের জন্মাদির অনুকরণে অভিনয়ের ন্যায় নিত্য দেহ লইয়াই তাঁহারা আবির্ভূত হন। শ্রীমন্মহাপ্রভু ও তাঁহার পরিকরগণ সকলেই জন্মাদির অনুকরণে আবির্ভূত হইয়া ছিলেন। কিন্তু অভিরাম তাহার ব্যতিক্রম। কথিত আছে শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর আহ্বানে শ্রীদাম সেই দ্বাপর যুগের সপ্তহস্ত পরিমিত মূর্ত্তিতেই গিরি গোবর্দ্ধনের গুহা হইতে নির্গত হইয়া আসেন। পরে শ্রীমন্মহাপ্রভু ও শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর ইচ্ছায় সেই দেহ চতুর্হস্ত পরিমাণে অবস্থান করিতে থাকেন। প্রায় সর্ব্বদার তরে তিনি ব্রজগোপালগণের অনুরূপ বেশ ধারণ করিয়া সখ্য রসে আবিষ্ট থাকিতেন। তাঁহার নিকটে শ্রীজয়মঙ্গল নামক একটী চাবুক থাকিত, কাহারও প্রতি শক্তি সঞ্চার করিবার ইচ্ছা হইলে তাহার অঙ্গে এই চাবুক দ্বারা আঘাত করিতেন; আর সেই ব্যক্তি সঙ্গে সঙ্গে প্রেমে উন্মত্ত হইতেন। কৃষ্ণনগরে অভিরাম কর্ত্তৃক স্থাপিত 'শ্রীগোপীনাথ বিগ্রহ' অদ্যাপিও বিরাজ করিতেছেন। শ্রীঅভিরাম লীলামৃত প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থে অভিরামের বিস্ময়কর অলৌকিক লীলা-কাহিনী সকল বিস্তারিত ভাবেই বর্ণিত আছে।

শ্রীনিবাস যথা সময়ে আসিয়া তাঁহার চরণ বন্দনা করিলে অভিরাম তাঁহাকে মাত্র দশটী কড়ি দিয়া তাহার দ্বারা রন্ধন সামগ্রী সংগ্রহ পূর্ব্বক আহার করিতে আদেশ করিলেন। শ্রীনিবাস উহাতেই যৎসামান্য বস্তু যাহা পাওয়া গেল সংগ্রহ করিয়া রন্ধন পূর্ব্বক ভোগ নিবেদন করিয়া আহারে বসিবার উদ্‌যোগ করিতেছেন, এমন সময় অভিরাম কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া চারিজন বৈষ্ণব অতিথি আসিয়া তাঁহার সমীপে উপস্থিত হইলেন। শ্রীনিবাস পরম সমাদরে তাঁহাদিগকে

বসাইলেন এবং সেই সামান্য মাত্র অন্নের দ্বারায় তাঁহাদিগকে পরিতোষ পূর্ব্বক আহার করাইয়া যাহা অবশেষ ছিল নিজে গ্রহণ করিলেন। বৈষ্ণবগণ অভিরামের নিকটে আসিয়া এই অসাধারণ ঘটনা যথাযথ প্রকাশ করিলে অভিরাম সকল কথা শুনিয়া পরম তৃপ্তি লাভ করিলেন। এদিকে আহারাদি সমাপন পূর্ব্বক শ্রীনিবাস আসিয়া পুনরায় তাঁহার চরণ বন্দনা করিলেন। তখন অভিরাম তাঁহাকে 'গৌর-প্রেমময়'* বলিয়া সম্বোধন করিলেন, পরে আনন্দে উন্মত্ত হইয়া শ্রীজয়মঙ্গলকে স্বহস্তে তুলিয়া লইলেন এবং তাঁহার অঙ্গে আঘাত করিতে লাগিলেন। দ্বিতীয়বার আঘাত করিতেই শ্রীনিবাস প্রেমে একেবারে উন্মত্ত হইয়া উঠিলেন; কিন্তু অভিরামের সেদিকে দৃষ্টি নাই। তিনি পুনরায় যখন বেত্র তুলিলেন তখন তাঁহার পত্নী মালিনী দেবী ছুটিয়া আসিয়া বেত্রখানি ধরিয়া ফেলিলেন, বলিলেন—'আর নহে, ইহার এই দেহ দ্বারা প্রভুর বহু কার্য্য সম্পাদিত হইবে, এখনই যদি শ্রীনিবাস উন্মত্ত হইয়া যায় তবে প্রভুর কার্য্য কিরূপে উদ্ধার হইবে?' দেবীর যুক্তিপূর্ণ বাক্য শুনিয়া অভিরাম ক্ষান্ত হইলেন। শ্রীনিবাস অতঃপর তাঁহার আদেশে স্থানীয় ভক্তবৃন্দের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আসিলেন। মালিনী দেবীর আদেশ অনুসারে সে দিবসে তাঁহাকে তাঁহাদের আলয়েই থাকিতে হইল। দেবী পরম যত্ন সহকারে আহারাদি করাইলেন। পরদিন প্রভাতে শ্রীনিবাস উভয়ের চরণে প্রণাম করিয়া বিদায় প্রার্থনা করিলে অভিরাম বলিলেন— 'শ্রীখণ্ডে সরকার ঠাকুর মহাশয় তোমার জন্য চিন্তিত হইয়া পথ চাহিয়া বসিয়া আছেন। অতএব তুমি সর্ব্বাগ্রে শ্রীখণ্ডে গিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবে। পরে তাঁহার আদেশ গ্রহণ করিয়া শ্রীধামে চলিয়া যাইবে। গোপাল ভট্টের চরণ আশ্রয় গ্রহণ

* 'গৌর প্রেমময়' ব'লে—
কৈলেন দুই বেত্রাঘাত—"
শ্রীনিবাস সূচকে শ্রীল রামদাস বাবাজী মহারাজের উক্তি।

করিয়া সেখানে ভক্তিশাস্ত্র অধ্যয়নে মনোনিবেশ করিও।' অভিরামের আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া শ্রীনিবাস সেখান হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন এবং অবিলম্বে শ্রীখণ্ডে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এখানে আসিয়া তিনি সরকার ঠাকুর মহাশয়ের নিকটে কয়েকদিন অবস্থান করিলেন। পরে একদিন তাঁহার নিকট হইতে শ্রীধাম গমনের অনুমতি গ্রহণ করিয়া মাতৃচরণ দর্শনেচ্ছায় যাজিগ্রামের দিকে অগ্রসর হইলেন।

শ্রীধাম গমন ও শ্রীরূপ সনাতনের অদর্শনে শ্রীনিবাসের বিলাপ।

পতিহারা লক্ষীপ্রিয়া দেবীর শ্রীনিবাসই একমাত্র সম্বল। সরলা ও স্নেহমুগ্ধা জননী পুত্রের উৎকণ্ঠা দেখিয়া একপ্রকার নিরুপায় হইয়াই ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। শ্রীনিবাস অতি সুকুমার এবং ভাবাবেশে বাহ্যজ্ঞান রহিত। এই অবস্থায় তাঁহাকে ছাড়িয়া দিয়া দেবীর মনে দুশ্চিন্তার অবধি ছিল না। অশান্ত হৃদয়ে তিনি দিবারাত্র তাঁহার প্রত্যাবর্ত্তনের পথ চাহিয়া দিন কাটাইতেছিলেন। উদ্বেগ ও চিন্তায় তাঁহার শরীর ক্রমে শীর্ণ হইয়া উঠিল। দীর্ঘদিনব্যাপী সন্তানের কোন সংবাদ না পাইয়া তিনি একেবারে বিহ্বলা হইয়া পড়িয়াছিলেন। শ্রীনিবাস ফিরিয়া আসিয়া জননীর দেহের অবস্থা দেখিয়া বিশেষ চিন্তিত হইয়া পড়িলেন এবং শ্রীধাম গমনের সঙ্কল্প কিছুদিনের জন্য স্থগিত রাখিতে বাধ্য হইলেন। জননীর নিকটে অবস্থান করিয়া তাঁহার চরণ সেবায় কিছুকাল অতিবাহিত করিলেন, কিন্তু প্রাণ ক্রমেই যেন চঞ্চল হইয়া উঠিতে লাগিল। গৃহের বন্ধন আর সহ্য হইতে ছিল না। ইতিমধ্যে শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু ও শ্রীমন্মহাপ্রভু একদিন স্বপ্নযোগে আবির্ভূত হইয়া তাঁহাকে শ্রীবৃন্দাবন

যাইবার জন্য পুনরায় আদেশ করেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু সেইদিন শ্রীনিবাসকে শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর নিকটে সমর্পণ করিয়া দিয়াছিলেন। প্রভু তাঁহার নাম ও প্রেম প্রচারের ভার একদিন শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুকে অর্পণ করিয়াছিলেন। শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু আজ শক্তিসঞ্চার পূর্ব্বক শ্রীনিবাসকে সেই কার্য্যে ব্রতী করিলেন। এই ঘটনার পর হইতেই শ্রীনিবাস যেন আরও ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। আর থাকিতে না পারিয়া একদিন জননী দেবীর চরণযুগল ধারণ করিয়া কাতর কণ্ঠে বলিলেন—'আজ আমাকে স্বচ্ছন্দমনে শ্রীধাম গমনের অনুমতি দান করুন নচেৎ শীঘ্রই বোধ হয় আমার প্রাণ বাহির হইয়া যাইবে। লক্ষীপ্রিয়া দেবী তাঁহার অবস্থা দেখিয়া একপ্রকার নিরুপায় হইয়াই অনুমতি দিতে বাধ্য হইলেন। ক্রন্দনরতা বৃদ্ধা জননীর চরণে প্রণাম কারয়া শ্রীনিবাস একাকী গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন (১)

দুর্গম পথ, মধ্যে মধ্যে শ্বাপদ সঙ্কুল গভীর অরণ্য, কিন্তু সেকালে পথে ইহা অপেক্ষাও ভয়ঙ্কর বস্তু ছিল, তাহা রক্তলোলুপ তস্করগণের ভীষণ উপদ্রব। আহার ও বাসস্থানের কোন নিরাপদ ব্যবস্থা নাই, কিন্তু এই সকল বাধা শ্রীনিবাসের ব্যাকুলতার প্রবল স্রোতে পড়িয়া তৃণখণ্ডের ন্যায় তুচ্ছ হইয়া গেল। দ্রুতগতি চলিতে চলিতে তিনি অবিলম্বে অগ্রদ্বীপে (২) আসিয়া উপস্থিত হইলেন। স্থানীয় ভক্তগণের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া শ্রীনিবাস সেখান হইতে কাটোয়াতে আসিলেন। এখানে প্রভুর সন্ন্যাসক্ষেত্র দেখিয়া তিনি সেই পবিত্র ভূমিতে পড়িয়া পড়িয়া বহুক্ষণ কাঁদিলেন। পরে ঈষৎ

(১) গৌড়মণ্ডল ভ্রমণের প্রায় ২৬ বৎসর কাল শ্রীনিবাস মাতৃসন্নিধানেই ছিলেন পরে তিনি বৃন্দাবন যাত্রা করেন এবং ১৪৯৫ শকে ২০শে বৈশাখ ৫৪ বৎসর বয়সে বৃন্দাবনে উপনীত হন। জননী লক্ষ্মীপ্রিয়া দেবী ও বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর অনুরোধই এই বিলম্বের কারণ বলিয়া অনুমিত হয়। ইতিহাস প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য।

(২) অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত শ্রীনিবাস আচার্য্য চরিত্র হইতে গৃহীত বিবরণ।

সংযত হইয়া আবার উঠিয়া দাঁড়াইলেন। কাটোয়া পশ্চাতে পড়িয়া রহিল তিনি দ্রুতপদে হাঁটিয়া চলিলেন। আহারাদির কোন চেষ্টা নাই। কেহ অযাচিতভাবে কিছু দিলে, তাহাদের একান্ত অনুরোধে কিছু গ্রহণ করেন মাত্র। ক্লান্তিতে দেহ যখন একান্ত অচল হইয়া পড়ে. তখন পথিপার্শ্বে কোন স্থানে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করেন। এইরূপে চলিতে চলিতে কয়েক দিনের মধ্যে বীরভূম জেলায় শ্রীময়ূরেশ্বর শিব দর্শন করিয়া শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর জন্মভূমি একচক্রায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর বিরহে ব্যাকুল হইয়া পুণ্য ভূমিতে পড়িয়া পড়িয়া শ্রীনিবাস কাঁদিতে লাগিলেন। এই সময় শ্রীনিবাস স্বপ্নযোগে সপরিকর শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর দর্শন লাভ করেন। একচক্রা হইতে তাঁহার ব্যাকুলতা যেন আরও তীব্র আকার ধারণ করিল। অঙ্গ ধূলি-মলিন। অনাহারে ও অনিদ্রায় দেহ শীর্ণ। আর মুখে শুধু হা রূপসনাতন, রঘুনাথ, হা শ্রীগোপাল ভট্টপ্রভু, আর কত দিনে তোমাদের দর্শন পাইব ? এই বুলি! আর কোন কথা নাই। তাঁহার অবস্থা দেখিয়া পথিকগণ দাঁড়াইয়া পড়ে, গ্রামবাসিগণ বিস্ময়ে স্তব্ধ হইয়া যায়। অরণ্যের হিংস্র পশুগণ ব্যস্তভাবে পথ ছাড়িয়া দাঁড়ায়। অবিরাম চলিতে চলিতে শ্রীনিবাস অবিলম্বেই 'গয়া ধামে' আসিয়া পৌঁছিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর দীক্ষা ভূমি গয়া, ইহার প্রতিটী পথ প্রভুর চরণের পূতরজ অঙ্গে ধারণ করিয়া রহিয়াছে। শ্রীনিবাস প্রভুর অশ্রুধৌত শ্রীগদাধরের পদচিহ্ন দর্শন করিলেন। তাঁহার প্রেমাশ্রু ধারায় সেই চরণ-চিহ্ন আরও একবার স্নাত হইলেন। কিন্তু বিলম্ব করিবার সময় নাই। শ্রীনিবাস অবিলম্বে আবার পথে আসিয়া নামিলেন। ক্রমে কাশীধাম নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল। সেই সঙ্গে শ্রীনিবাসের চরণের গতিবেগও বাড়িতে লাগিল। অবশেষে একদিন কাশীধামে উপনীত হইলেন। এখানে চন্দ্রশেখরের ভবনই প্রভুর নিবাস কুটীর, একথা তাঁহার অগোচর ছিল না। চন্দ্রশেখর এখন আর নাই। তাঁহার অপ্রকটে তাঁহার একজন সুযোগ্য

শিষ্য তাঁহারই আদেশে এই পবিত্র ভূমির পরিচর্য্যায় নিযুক্ত আছেন। তিনি শ্রীনিবাসকে পরম সমাদরে গ্রহণ করিলেন। গৃহ ত্যাগের পর দরবেশের ছদ্মবেশে সনাতন দ্বার প্রান্তের যে স্থানটীতে আসিয়া প্রথম উপবেশন করিয়াছিলেন, স্মৃতি রক্ষাকল্পে সেই পবিত্র ভূমির উপর একটি তুলসী মঞ্চ স্থাপিত হইয়াছে। সম্মুখস্থ গৃহেই প্রভু মাসাবধি কাল বাস করিয়া সনাতনকে সাধ্য-সাধন বিষয়ে শিক্ষা দান করেন। প্রভুর সেই উপবেশন স্থানটিও সযত্নে রক্ষিত রহিয়াছে। শ্রীনিবাস তুলসী মঞ্চে দণ্ডবৎ ও পরিক্রমা করিলেন। পরে প্রভুর উপবেশন স্থানটীতে পড়িয়া পড়িয়া প্রাণের আবেগে বহুক্ষণ ক্রন্দন করিলেন। পূর্ব্বোক্ত ভক্তটি তাঁহার শরীরের এইরূপ শীর্ণ ও ক্লান্ত অবস্থা দেখিয়া বিশ্রামের জন্য তাঁহাকে জোর করিয়া কয়েক দিন রাখিবার চেষ্টা কারলেন, কিন্তু শ্রীনিবাসের প্রাণ শ্রীধামের পথে ছুটিয়া চলিয়াছে, বিশ্রাম করিবার সময় নাই। একান্ত অনুরোধে পড়িয়া কোনও প্রকারে দুই একদিন রহিলেন। ইতিমধ্যে শ্রীবিশ্বনাথ এবং অন্যান্য দেবদেবীগণকে দর্শন করিয়া আসিলেন। পরে 'হা রূপ সনাতন! বলিতে বলিতে পুনরায় শ্রীধামের উদ্দেশ্যে ছুটিলেন। কয়েকদিনের মধ্যেই শ্রীনিবাস প্রয়াগ ও অযোধ্যা অতিক্রম করিলেন। মথুরা নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল। শ্রীরূপ সনাতনাদির সহিত আসন্ন সম্মিলনের সম্ভাবনায় তাঁহার শ্রম ও উপবাসক্লিষ্ট বদন আশা ও আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। দেহে আসিল অসীম বল, মনে আসিল অদম্য উত্তেজনা, আর চরণে আসিল দ্রুতগামী মৃগের গতি!

আর মাত্র চারিদিনের পথ অবশিষ্ট আছে। শ্রীনিবাস ক্লান্তি ও পিপাসায় কাতর হইয়া এক সময় পথ পার্শ্বে একটি কূপের নিকটে আসিয়া বসিলেন। শ্রীধাম হইতে কয়েক জন ব্রজবাসী ইতিমধ্যে সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলে শ্রীনিবাস প্রবল আগ্রহ সহকারে তাঁহাদিগকে শ্রীরূপ সনাতন প্রভৃতি গোস্বামিগণের কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। তাঁহারা শ্রীনিবাসের প্রশ্নের কোন জবাব না দিয়া অধোবদনে

বসিয়া বসিয়া নিঃশব্দে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের ভাব পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিয়া কোন দুঃসংবাদের আশঙ্কায় বিচলিত হইয়া শ্রীনিবাস অকস্মাৎ সোজা হইয়া বসিলেন এবং পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন—'আপনারা কাঁদিতেছেন কেন ? কি হইয়াছে বলুন ?' অবশেষে তাঁহারা ব্যথিত কণ্ঠে তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন—'আপনি কি শুনেন নাই যে, কিছুদিন পূর্ব্বে শ্রীপাদ সনাতন অন্তর্হিত হইয়াছেন ?' সনাতন প্রভু অন্তর্হিত ! এই কথা অনশনক্লিষ্ট শ্রান্ত শ্রীনিবাসের কর্ণে প্রবেশ করিল। তিনি সঙ্গে সঙ্গে গভীর মূর্চ্ছায় আক্রান্ত হইয়া ভূমিতে ঢলিয়া পড়িলেন। যাঁহার শ্রীচরণ দর্শনের আশায় ভারতের এক প্রান্ত হইতে আর এক প্রান্ত পর্য্যন্ত শ্রীনিবাস উল্কার বেগে ছুটিয়া আসিলেন মাত্র আর চারিটি দিন পরেই অভীষ্ট পূর্ণ হইবে, এই উল্লাসে উৎফুল্ল হইয়া তিনি পথ চলিতে ছিলেন, সেই আশা আজ নির্ম্মূল হইল। ব্রজবাসী পথিকগণের যত্নে, বহুক্ষণ পর শ্রীনিবাসের সংজ্ঞা ফিরিয়া আসিল। 'হা সনাতন প্রভু, তোমার দর্শন পাইলাম না যদি আর কয়েকদিন পূর্ব্বে আসিতাম তবে অবশ্য দেখিতে পাইতাম, হা প্রভু কি অপরাধে বঞ্চিত করিলে ?' —বলিতে বলিতে আপনার বক্ষে ও মস্তকে আপন কর দ্বারা নির্ম্মমভাবে আঘাত করিতে লাগিলেন। তাঁহার করুণ বিলাপে সকলের চোখে ধারা নামিল। ব্রজবাসিগণ বহু যত্নে তাঁহাকে প্রবোধ দিলেন এবং বলিলেন—'শ্রীরূপ, শ্রীজীব, শ্রীগোপাল ভট্ট প্রভু প্রভৃতি সকলেই রহিয়াছেন, আপনি যাইয়া তাঁহাদের চরণ দর্শন করুন। ক্রন্দনে আর কোনই লাভ নাই।' তাঁহারা বহু চেষ্টায় শ্রীনিবাসকে প্রবোধিত করিয়া সযত্নে শ্রীধামের পথে পাঠাইয়া দিলেন। তাঁহার সকল উৎসাহ একেবারে নিভিয়া গেল, তথাপি যাইতেই হইবে। শ্রীনিবাস চোখের ধারা মুছিতে মুছিতে পুনরায় মন্থর গতিতে যাত্রা করিলেন। কিন্তু আরও একটী দুর্বিবষহ সংবাদ শ্রীনিবাসের বেদনাহত কোমল হৃদয়টীকে লক্ষ্য করিয়া অগ্রসর হইয়া আসিল।

শ্রীনিবাস মথুরার বিশ্রাম ঘাটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অত্যন্ত শ্রান্তি বশতঃ স্নান করিয়া একটী বৃক্ষতলে আসিয়া বিমর্ষভাবে বসিয়া পড়িলেন। ইতিমধ্যে কয়েকজন বৈষ্ণব আসিয়া সেইখানে উপবেশন করিলে তিনি তাঁহাদের সহিত বাক্যালাপ করিতে লাগিলেন। প্রসঙ্গ ক্রমে গোস্বামিগণের কথা উঠিলে তাঁহারা দুঃখিতভাবে বলিলেন —'এখন ব্রজধামে বড়ই দুঃসময় চলিতেছে। শ্রীসনাতন প্রভু অপ্রকট হইয়াছেন, কিছুকাল পূর্ব্বে শ্রীরঘুনাথ ভট্ট প্রভুও অদর্শন হইয়াছেন, আবার এখন শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভুও লীলা সংবরণ করিলেন।' বৈষ্ণবগণের উক্তি শ্রীনিবাসের কর্ণে প্রবেশ করিল। তিনি বেত্রাঘাত খাইয়া যেন সোজা হইয়া বসিলেন। নিজের কর্ণকেও যেন বিশ্বাস হইল না; ব্যাকুল হইয়া পুনরায় বলিলেন 'কি হইয়াছে? কে লীলা সংবরণ করিয়াছেন বলিলেন?" তখন অবিশ্বাস্য সংবাদ আবার একবার তাঁহার কর্ণগোচর হইল। মাথা ঘুরিতে লাগিল, চোখে অন্ধকার দেখিলেন, অবশেষে সম্বিৎ হারাইয়া ভূমিতে ঢলিয়া পড়িলেন।

শ্রীনিবাসের জীবন যেন আগাগোড়া বিরহের উপাদনেই গঠিত, এই বিরহটী ভোগ করিবার জন্যই যেন তিনি আবির্ভূত হইয়া ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবন বিহারের কালটুকু বাদ দিয়া ব্রজরামাগণের জীবন যেমন আগাগোড়াই বিরহময়, শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলার শেষ দ্বাদশ বৎসরের প্রতিটী মুহূর্ত্তও সেইরূপ তীব্র বিরহের নয়ন জলে সিক্ত। প্রেম যেখানে দুর্ব্বল সেখানে বিরহ আসিয়া বিস্মৃতির আবির্ভাব ঘটায়, কিন্তু প্রেম যেখানে রন্ধ্রহীন এবং অকপট, সেখানে বিরহ আসিয়া অন্তর্জগতে নব-নবায়মান মিলনানন্দের সম্ভাবনা আনিয়া দেয়। যে প্রেমের সূচনা হয় মিলনে, বিরহ আসিয়া সেই প্রেমের পূর্ণ এবং পরিপুষ্ট রূপটীকে প্রকটিত করিয়া দেয়। অতএব এই বিরহ, বিচ্ছেদ নহে, ইহা গভীর প্রেমের নিবিড় আলিঙ্গন মাত্র। বাহ্য দৃষ্টিতে ইহাকে বেদনাময় বলিয়া মনে হইলেও প্রকৃত পক্ষে ইহা দুঃখময় নহে। ইহা নব নব মিলনানন্দের

উৎসমূল, পরম মঙ্গলপ্রদ এবং করুণাময়ের আশীর্ব্বাদ স্বরূপ। গৌর এবং গৌরগণের প্রতি প্রেম শ্রীনিবাসের সহজাত সম্পত্তি। স্মরণ মনন এবং প্রসঙ্গাদির দ্বারায় তাহা ক্রমে পরিপুষ্টি লাভ করিয়াছে এবং সেই প্রেমই এখন বিরহ দশায় আসিয়া পূর্ণাঙ্গতা এবং পরিপুষ্টি লাভ করিতেছে। শ্রীনিবাসের বিরহ-সন্তপ্ত জীবনের ইহাই তাৎপর্য্য বলিয়া মনে হয়।

আগন্তুক ব্যক্তিগণের চেষ্টায় শ্রীনিবাস কিছুক্ষণ পরে চৈতন্য লাভ করিয়া বহুক্ষণ ব্যাকুলভাবে বিলাপ করিলেন। তিনি ভাবিতে লাগিলেন "আমি যখনই যাঁহাদের চরণ দর্শন লাভের জন্য উদ্‌যোগী হই, তখনই তাঁহারা অন্তর্হিত হইয়া যান। মনে হয় আমার দুর্ভাগ্য দোষেই এই সমস্ত অনর্থ ঘটিতেছে। আমিই সাক্ষাৎ অমঙ্গল স্বরূপ অতএব আমার পক্ষে শ্রীবৃন্দাবনে প্রবেশ না করাই শ্রেয়ঃ"—মনে মনে ইহাই স্থির করিয়া শ্রীনিবাস উঠিয়া দাঁড়াইলেন। গৌড় প্রত্যাগমনের চিন্তা মনেও উঠিল না। শুধু উদ্দেশ্যহীনভাবে উদ্‌ভ্রান্তের ন্যায় জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। সমস্ত দিন এইরূপে অতিবাহিত হইল, রাত্রির অন্ধকার নামিয়া আসিল। তিনি হাঁটিয়াই চলিয়াছেন। পথের দিকে দৃষ্টি মাত্র নাই। ঘন জঙ্গলের মধ্যে দৃষ্টিও চলে না। কণ্টকে ও প্রস্তরের আঘাতে কোমল চরণ যুগল ক্ষতবিক্ষত হইয়া গিয়াছে। বেদনার উপলব্ধি নাই। এইরূপে রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর অতিক্রান্ত হইল। দেহে আর বিন্দুমাত্র শক্তি নাই। এক সময় হাঁটিতে হাঁটিতে শ্রীনিবাস অবশ হইয়া এক বৃক্ষতলে উপবেশন করিলেন এবং কাঁদিতে কাঁদিতে কিয়ৎক্ষণ পরে নিদ্রা দেবীর কৃপায় শান্তি লাভ করিলেন। শেষ রাত্রে শ্রীরূপ ও সনাতন-প্রভু স্বপ্নে আবির্ভূত হইয়া তাঁহাকে দর্শন দান করিলে শ্রীনিবাস তাঁহাদের চরণে পড়িয়া পড়িয়া বহুক্ষণ কাঁদিলেন। শ্রীপাদ সনাতন তাঁহাকে উঠাইয়া হৃদয়ে ধারণ পূর্ব্বক নানা প্রকার স্নেহপূর্ণ বাক্যে প্রবোধ দিয়া বলিলেন, "তুমি অবিলম্বে শ্রীধামে গমন কর, আমার অভিন্নাত্মা গোপাল

ভট্ট সেখানে তোমার পথ চাহিয়া বসিয়া আছেন। তুমি গিয়া তাঁহার নিকট হইতে দীক্ষা গ্রহণ করিবে, প্রভু কৃপা পূর্ব্বক আমাদের দ্বারায় যে সমস্ত গ্রন্থ লিখাইয়াছেন, তাহা যত্ন পূর্ব্বক অধ্যয়ন করিবে। গৌড় মণ্ডলে গ্রন্থ প্রচার তোমাকেই করিতে হইবে। প্রভুর ইহাই আদেশ। তুমি তাঁহার আদেশ পালন করিয়া ধন্য হও, আমরা ইহাই কামনা করি। কোন দুঃখ করিও না। আমরা নিরন্তর তোমার সঙ্গে সঙ্গেই থাকিব"—বলিতে বলিতে তাঁহারা অদর্শন হইলেন। আর সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার নিদ্রা ভঙ্গ হইল। সেই নির্জ্জন বৃক্ষতলে পড়িয়া শ্রীনিবাস বহুক্ষণ কাঁদিলেন। প্রভুর স্বপ্নাদেশের কথাও আজ আবার তাঁহার নূতন করিয়া মনে পড়িল। যেমন করিয়াই হোক তাঁহার আদেশ পালন করিতে হইবে। বহু চেষ্টায় আর একবার ধৈর্য্য ধারণ করিয়া শ্রীনিবাস উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং টলিতে টলিতে পুনরায় শ্রীবৃন্দাবন অভিমুখে অগ্রসর হইলেন।

শ্রীনিবাস ব্রজের পথে চলিয়াছেন। ব্রজবনের অপরূপ শোভা দেখিয়া তিনি ভাবরাজ্যে প্রবেশ করিলেন। স্থানে স্থানে কেকা ধ্বনি সহকারে ময়ূর ময়ূরীর শ্রেণীবদ্ধ নৃত্য, বিভিন্ন জাতীয় পক্ষীর বিচিত্র কলরব, ফল পুষ্পময় জঙ্গলের পথ দিয়া শ্রীনিবাস বিভোর হইয়া চলিয়াছেন। বাহ্যস্মৃতি মাত্র নাই। মাঝে মাঝে পদস্খলন হইতেছে। এক একবার পড়িয়া যাইতেছেন, আবার তখনই উঠিয়া দাঁড়াইতেছেন। এইরূপে দিবারাত্র এবং পরদিন সমস্ত দিবস ব্যাপী হাঁটিয়া সন্ধ্যাকালে ব্রজধামে প্রবিষ্ট হইলেন। সেদিন ২০শে বৈশাখ পূর্ণিমা তিথি। সন্ধ্যার আগমনের সঙ্গে সঙ্গে নির্ম্মল আকাশে পূর্ণচন্দ্র উদিত হইয়া ধামের স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যকে যেন অধিকতর মনোরম করিয়া তুলিয়াছে।* শ্রীনিবাস ভাবাবেগে টলিতে টলিতে ধামের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। শ্রীবৃন্দাবনের অভ্যন্তরে আসিয়া অনুসন্ধান করিতে

* 'বৈশাখ মাসের এই বিংশতি দিনেতে'—ভক্তিরত্নাকর।
বৈশাখী পূর্ণিমা নিশি শোভা চমৎকার—ভক্তিরত্নাকর।

করিতে শ্রীনিবাস শ্রীগোবিন্দজীর মন্দিরের দ্বার প্রান্তে আসিয়া যখন উপস্থিত হইলেন, তখন সন্ধ্যারতি আরম্ভ হইয়াছে। শ্রীমন্দিরের দ্বার হইতে সাষ্টাঙ্গ দিয়া শ্রীনিবাস একেবারে শ্রীবিগ্রহের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং শ্রীগোবিন্দের অপরূপ লাবণ্যময় মূর্ত্তি দর্শন করিতে করিতে প্রেমাবেশে অচৈতন্য হইয়া ভূমিতলে লুটাইয়া পড়িলেন।

শ্রীজীব ও গোপাল ভট্ট প্রভু।

শ্রীমন্মহাপ্রভু তখনও অন্তর্হিত হন নাই। শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতন তাঁহার আদেশে সবে মাত্র শ্রীবৃন্দাবনে আসিয়াছেন। এক এক বৃক্ষতলে এক এক রাত্রি বাস, পরিধানে জীর্ণ বহির্ব্বাস ও কৌপীন। দিবারাত্র নিশ্ছিদ্র ভজনে তাঁহাদের দিন অতিবাহিত হয়। একদিন সনাতন স্থানান্তরে গিয়াছেন। শ্রীরূপ একটী বৃক্ষতলে বসিয়া গ্রন্থ রচনায় নিযুক্ত। অনতিদূরে একটী অল্পবয়স্ক পরম রূপবান সেবক অতি দীন বেশে হাতে পাখা লইয়া তাঁহাকে অল্পে অল্পে বাতাস করিতেছেন। এমন সময় একজন দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত আসিয়া শ্রীরূপের সম্মুখে উপবেশন করিলেন। শ্রীরূপ ও তরুণ সেবক তাঁহার চরণ বন্দনা করিলেন। পণ্ডিত শ্রীরূপের সহিত শাস্ত্র যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত আসিয়াছেন। তিনি বলিলেন—'হয় আপনি বিচার করুন, নচেৎ জয় পত্র লিখিয়া দিন'। শ্রীরূপ তাঁহার দ্বারাতেই জয় পত্র লিখাইয়া নিজে অতি বিনীত ভাবে তাহাতে স্বাক্ষর করিয়া দিলেন। পণ্ডিতের হৃদয় বিজয় গর্ব্বে পূর্ণ হইল। অতঃপর পণ্ডিত সম্মুখস্থ গ্রন্থের প্রাত অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন—'কি লিখিতেছেন?' শ্রীরূপ সবিনয়ে যথোচিত পরিচয় দিয়া বলিলেন—'এখন মঙ্গলাচরণটী মাত্র লেখা হইয়াছে, ভালই হইল, আপনি আসিয়াছেন, আপনার দ্বারায় সংশোধন করাইয়া লইব।' পণ্ডিত সানন্দে স্বীকৃত হইয়া স্নানার্থে যমুনায় চলিয়া

গেলেন। সেবক নীরবে সমস্তই লক্ষ্য করিতে ছিলেন। পণ্ডিত মহাশয় অকারণে শ্রীগুরুদেবের রচনা সংশোধন করিবেন এবং তিনি অকারণে জয় পত্রও লিখাইয়া লইলেন, ইহা তরুণের প্রাণে সহ্য হইল না। শ্রীজীব ধীরে ধীরে পাখা নামাইয়া রাখিলেন এবং জলপাত্রটী হাতে তুলিয়া লইয়া যমুনার পথে অগ্রসর হইলেন। যমুনায় পরস্পরের সাক্ষাৎ হইল। যথারীতি শাস্ত্র যুদ্ধ আরম্ভ হইল। অবশেষে সেই তরুণ বৈরাগীর নিকটে প্রবীন দিগ্বিজয়ীর পরাজয় ঘটিল। কিন্তু তরুণের বিনয় নম্র ব্যবহারে তাঁহার মনে কিছু মাত্র ক্রোধের উদয় হইল না। তিনি পরম তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া চলিয়া গেলেন। কিছুক্ষণ পরে জলপাত্র যথাস্থানে রাখিয়া তরুণ আবার শ্রীরূপের নিকটে আসিয়া পাখা লইয়া বসিলেন। কিন্তু ইতঃপূর্ব্বে পণ্ডিতজী যে আবার আসিয়া শ্রীগুরুদেবের নিকট বসিয়াছিলেন, তাঁহার পরিচয় লইয়া গিয়াছেন এবং তাঁহার পাণ্ডিত্যের ও দৈন্য ব্যবহারের প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন, তাহা তরুণ ধারণা করিতে পারেন নাই। পণ্ডিত মহাশয়কে কিছু জিজ্ঞাসা না করিয়াও শ্রীরূপ যে অনুমানে সমস্ত ঘটনাই বুঝিতে পারিয়াছেন, শিষ্য তাহাও বুঝিতে পারেন নাই। তিনি শ্রীগুরুদেবের বদনে অস্বাভাবিক গাম্ভীর্য্য দেখিয়া সবিশেষ চিন্তিত ও বিচলিত হইয়া উঠিলেন। কিন্তু উৎকণ্ঠা বাহিরে প্রকাশ না করিয়া স্থিরভাবে বসিয়া রহিলেন। কিছুক্ষণ পর শ্রীরূপ তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া গম্ভীর কণ্ঠে বলিলেন—'শ্রীজীব, দৈন্য আমার প্রভুর প্রিয়বস্তু, সেই দৈন্যে তুমি আঘাত করিয়াছ, তুমি গৃহে ফিরিয়া যাও।' কিন্তু শ্রীজীব আপনার পাণ্ডিত্য দেখাইবার জন্যই যে দিগ্বিজয়ীর সহিত শাস্ত্র বিচার করিয়াছিলেন তাহা নহে, শ্রীগুরুদেবের অমর্য্যাদা হইতেছে, তাহা সহ্য করিতে না পারিয়াই তাহাতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তথাপি সে বিষয়ে কিছু না বলিয়া তিনি অপরাধ স্বীকার করিয়া লইলেন এবং শ্রীগুরুদেবের চরণে পড়িয়া ব্যাকুলভাবে কাঁদিতে লগিলেন, কিন্তু ক্ষমা হইল না। অবশেষে নিরুপায় হইয়া শ্রীজীব তাঁহার আদেশ শিরোধার্য্য

করিয়া লইয়া শ্রীধাম ত্যাগ করিয়া চলিলেন। তবে গৃহের পথে নহে, তিনি শ্রীবৃন্দাবনের বহির্দেশে যমুনার তীরে, নন্দ ঘাটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। প্রায়োপবেশনে দেহ ত্যাগ করিবেন, ইহাই তাঁহার মনের সঙ্কল্প। ঘটনাচক্রে কিছু দিন পর একদিন শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামী প্রভু উক্ত অঞ্চলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং লোক মুখে সংবাদ পাইয়া তাঁহাকে দেখিতে আসিলেন। আসিয়া দেখিলেন, শ্রীজীবের দেহ অনশনে অস্থি চর্ম্মসার হইয়া গিয়াছে, বৃক্ষতলে পড়িয়া পড়িয়া তিনি কাঁদিতেছেন। শ্রীপাদ সনাতন প্রভুকে দেখিয়া শ্রীজীব তাঁহার চরণে পড়িয়া বহুক্ষণ কাঁদিলেন। শ্রীপাদ সনাতন কিন্তু কিছু মাত্র সান্ত্বনা না দিয়াই সেখান হইতে চলিয়া আসিলেন। পরে শ্রীরূপের নিকটে আসিয়া আলোচনা প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করিলেন 'জীবের প্রতি কর্ত্তব্য কি ?' শ্রীরূপ স্বাভাবিক ভাবেই বলিলেন—'দয়াই জীবের প্রতি শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য।' তখন সুযোগ পাইয়া সনাতন বলিলেন—'জীবে দয়াই যদি তোমার বিবেচনায় শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য হয়, তবে আচরণে তাহা দেখা যাইতেছে না কেন ?' শ্রীপাদ সনাতন পরে বলিলেন—'শ্রীজীবকে দেখিয়া আসিলাম। বর্ত্তমানে সে অনশনে দিন যাপন করিতেছে, মনে তার দেহ ত্যাগের সঙ্কল্প। তবে এখনও প্রাণটুকু দেহ ছাড়িয়া যায় নাই এইমাত্র। তোমার নিকটে ক্ষমা পাইবার আশা এখনও ছাড়িতে পারে নাই বলিয়াই হয়ত এখনও দেহ ত্যাগ হইতেছে না।' সংবাদ শ্রবণ করিয়া শ্রীরূপ অতি কষ্টে ধৈর্য্য ধারণ করিলেন এবং তৎক্ষণাৎ লোক পাঠাইয়া তাঁহাকে লইয়া আসিলেন। শ্রীজীব গুরুদেবের নিকটে আসিয়া ব্যাকুলভাবে কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁহার চরণ জড়াইয়া পড়িলেন। নয়ন জলে শ্রীরূপের চরণ-যুগল ধৌত হইতে লাগিল। মহা গম্ভীর, ও সংযতমনাঃ শ্রীরূপের নয়নেও তখন প্রেমের ধারা নামিয়াছে। শ্রীজীবকে উঠাইয়া লইয়া তিনি আপন বক্ষে জড়াইয়া ধরিলেন এবং বিরহ সন্তপ্ত হৃদয় শান্ত করিলেন। (১)

(১) উক্ত ঘটনা, শ্রীজীবের সূচকে শ্রীল রামদাস বাবাজী মহাশয়ের উক্তি এবং

এই সেই শ্রীজীব, শ্রীরূপ-সনাতন যাঁহাকে সতর্কতা সহকারে মনের মত করিয়া গড়িয়া রাখিয়া গিয়াছেন। যাবতীয় বৈষ্ণব গ্রন্থকারের রচনা শ্রীজীব কর্ত্তৃক স্বীকৃত না হইলে সে গ্রন্থ বৈষ্ণব সমাজে মর্য্যাদা পায় না। আজ শ্রীরূপ-সনাতন নিত্য লীলায় প্রবিষ্ট। সমগ্র বৈষ্ণব সমাজ এখন সর্ব্বসম্মতিক্রমে শ্রীজীবকে তাঁহাদের আসনে বসাইয়াছেন। তত্ত্ব শাস্ত্রে অসাধারণ পাণ্ডিত্য এবং জ্ঞান-প্রতিভার গুণে পণ্ডিত সমাজও তাঁহাকে আচার্য্যরূপে বরণ করিয়া লইয়াছেন। শ্রীবৃন্দাবনের সেবিত বিগ্রহগণের তত্ত্বাবধান, সেবা পরিচালনা এবং আগন্তুক ভক্তবৃন্দের পরিপালন করার যাবতীয় দায়িত্ব এখন তাঁহার উপরে ন্যস্ত হইয়াছে। তাহা ব্যতীত পণ্ডিত সমাজের যাবতীয় শাস্ত্রীয় সমস্যার এবং অন্যান্য যাবতীয় সমস্যার সমাধান এখন তাঁহাকেই করিতে হয়।

শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রথমে যখন শ্রীবৃন্দাবনে যাইবার উদ্দেশ্য লইয়া রামকেলী গ্রামে আসেন এবং শ্রীরূপ-সনাতনকে দর্শন দান করেন, তখন শ্রীজীব শিশু মাত্র। শ্রীরূপ ও সনাতনের সহিত এই শিশু শ্রীজীবও তাঁহার চরণে আত্ম-সমর্পণ করেন। প্রভুর কৃপায় তখন হইতেই তাঁহার অন্তরে ভক্তির বীজ অঙ্কুরিত হয়। প্রভুর দাক্ষিণাত্য ভ্রমণের সময় প্রভু সেইরূপ আরও একটী বালকের হৃদয়ে বৈরাগ্য এবং প্রেম-ভক্তির উন্মেষ ঘটাইয়া দিয়া আসিয়াছিলেন। সেই বালকই শ্রীগোপাল ভট্ট প্রভু। শ্রীরঙ্গম ক্ষেত্রের বলংগুণ্ডী গ্রামে ত্রিমল্ল, বেঙ্কট ও প্রবোধানন্দ এই তিন ভ্রাতা বসবাস করিতেন। উত্তরকালে এই প্রবোধানন্দই প্রকাশানন্দ নামে পরিচিত হইয়া বারাণসীতে মায়াবাদী দণ্ডি পরমহংসগণের নেতৃত্ব লাভ করিয়াছিলেন। (২) পরে প্রভুর

বিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকা ৪০৭ গৌরাঙ্গাব্দের ১লা বৈশাখ সংখ্যায় প্রকাশিত বিবরণ অবলম্বনে লিখিত।

(২) ভক্তি রত্নাকরে এই প্রবোধানন্দকেই সরস্বতী আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। শ্রীনিবাস চরিত রচয়িতা অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়, গৌড়ীয় বৈষ্ণব জীবন রচয়িতা মধুসূদন তত্ত্ব বাচস্পতি প্রভৃতি অধিকাংশ ঐতিহাসিকের মতে এই প্রবোধানন্দই উত্তরকালে কাশীতে মায়াবাদিগণের নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন।

কৃপায় প্রেমভক্তি লাভে কৃতার্থ হইয়া 'প্রকাশানন্দ' নাম ত্যাগ করিয়া বৃন্দাবনে গমন করতঃ ভক্তি যাজনে নিযুক্ত হন। বেঙ্কটের পুত্র গোপাল ১৪২২ শকে জন্মগ্রহণ করেন।* অতি শৈশবাবস্থা হইতেই তাঁহার সূক্ষ্মমেধা এবং কোমল চরিত্রের খ্যাতি সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। প্রবোধানন্দ নিজেই আগ্রহ সহকারে বালকের অধ্যাপনার ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। গোপালের বয়স যখন একাদশ বৎসর মাত্র, তখন গ্রামে একদিন সংবাদ আসিল, নীলাচল হইতে দাক্ষিণাত্যে ভ্রমণ উপলক্ষে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীরঙ্গম ক্ষেত্রে আসিয়াছেন। সংবাদ পাইয়া বেঙ্কট ভট্ট পরম ভক্তি ভ'রে প্রভুকে আপন গৃহে লইয়া আসিলেন। ইতিমধ্যে চাতুর্ম্মাস্যের কাল সমাগত হইলে প্রীতির টানে আবদ্ধ হইয়া প্রভু তাঁহার গৃহে থাকিয়াই এই ব্রত উদ্‌যাপন করিয়াছিলেন। সেই সময়ে গোপাল চিরদিনের জন্য তাঁহার চরণে আত্ম-সমর্পণ করেন। ভক্তিমান বেঙ্কট ভট্ট, প্রভুর প্রতি পুত্রের অনুরক্তি দেখিয়া তাঁহার যাবতীয় সেবা পরিচর্য্যার ভার পরম আনন্দের সহিত গোপালের হাতে তুলিয়া দেন। দীর্ঘ চারিমাস কাল প্রভুর নিকটে থাকিয়া গোপাল তাঁহার সেবা করেন। প্রভু কিন্তু কখনও কাহাকেও কোনও রূপ আদেশ করিতেন না। ইঙ্গিতে ভাব বুঝিয়া সেবা করা সাধারণ লোকের কার্য্য নহে। কিন্তু এই বালকের সেবা চাতুর্য্য দেখিয়া সময়ে সময়ে তিনি বিস্মিত হইতেন। প্রভু এই সময় গোপালকে একদিন স্বপ্নযোগে সমগ্র নদীয়া লীলা দর্শন করাইয়া ছিলেন। ভট্ট পরিবারের তখন শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ-সেবা প্রচলিত ছিল। প্রভু তাঁহাদিগকে শ্রীকৃষ্ণ সেবায় অনুরাগী করেন। গোপাল সেই সময় ব্যাকরণাদি অধ্যয়ন শেষ করিয়া প্রবোধানন্দের নিকটে শ্রীমদ্ভাগবত

* গৌড়ীয় বৈষ্ণব জীবন গ্রন্থের মতানুসারে শ্রীল গোপাল ভট্ট প্রভুর জন্ম ১৪২২ শকাব্দায়। ১৪৩২ শকে চাতুর্ম্মাস্য কালে শ্রীমন্মহাপ্রভু বেঙ্কট ভট্টের গৃহে বাস করেন। তখন গোপালের বয়স ১০।১১ বৎসর। সুতরাং উক্ত সিদ্ধান্তে ঐতিহাসিক অসামঞ্জস্য কিছু নাই।

অধ্যয়ন করিতে ছিলেন, সেই সময় প্রভু একদিন বেঙ্কটকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন, 'তোমারা গোপালকে পরম যত্নে ভক্তি গ্রন্থ অধ্যয়ন করাও, আর বিবাহ দিবে না।' গোপালকেও একদিন গোপনে বলিলেন—"তুমি এখন সর্ব্বান্তঃকরণে পিতামাতার সেবা করিতে থাক এবং সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যাভাস কর। পরে পিতামাতর অপ্রকটের পর শ্রীধাম বৃন্দাবনে চলিয়া যাইবে ও সেখানে শ্রীরূপ ও সনাতনের আশ্রয়ে থাকিবে। পরে প্রভু মৃদু কণ্ঠে বলিলেন তুমি দেখিবে পরবর্ত্তীকালে তোমার শিষ্য শ্রীনিবাসের দ্বারায় গৌড়দেশে প্রেমধর্ম্ম প্রচারিত হইবে। এখন এই কথা কাহারও নিকটে প্রকাশ করিও না।" প্রভু তাঁহার আপন ডোর-কৌপীন ও বহির্ব্বাস তাঁহাকে দান করিলেন পরে পুনরায় বলিলেন "তুমি শ্রীধামে গমন করিলে পর আমি তোমার জন্য ডোর এবং আসন প্রেরণ করিব। সেই ডোর গলায় দিয়া এবং আসনে বসিয়া তুমি শ্রীনিবাসকে দীক্ষা দিবে। তোমার কৃপাতেই সে আমার কৃপা লাভ করিবে *" অতঃপর প্রভু একদিন বিদায় গ্রহণ করিয়া রামেশ্বরমের উদ্দেশ্যে যাত্রা করিলেন।

প্রভু চলিয়া গেলেন, কিন্তু যাইবার পূর্ব্বে গোপালের ভবিষ্যৎ জীবনের লক্ষ্যটীকে একমুখী করিয়া বাঁধিয়া দিয়া গেলেন। গোপাল বুঝিলেন যে সংসার ধর্ম্ম তাঁহার জন্য নহে। যে জীবন ও আদর্শের ইঙ্গিত প্রভু তাঁহাকে দিয়া গেলেন, সেই পথে দৃঢ় সঙ্কল্পের সহিত অগ্রসর হওয়াই এখন তাঁহার কর্ত্তব্য। কিছুকালের মধ্যেই গোপাল ছাত্রজীবন অতিক্রম করিলেন। এই অল্প বয়সেই তিনি তীক্ষ্ণ যুক্তি এবং প্রমাণ সহকারে বৌদ্ধবাদ ও মায়াবাদ খণ্ডন পূর্ব্বক বিশুদ্ধ ভক্তিবাদ প্রচার করিতে লাগিলেন। এইরূপে কিছুকাল স্বদেশে ভক্তিবাদ প্রচার করিয়া তিনি মাতা পিতার লোকান্তর গমনের পর ১৪৫৩ শকে ৩১ বৎসর বয়সে, গৃহ ত্যাগ করিয়া শ্রীধামে চলিয়া আসিলেন এবং শ্রীরূপ ও সনাতনের আশ্রয়ে থাকিয়া কঠোর ভজনে

* কর্ণানন্দ ৫ম নির্য্যাস।

আত্মনিয়োগ করিলেন। গোপালের বৃন্দাবনে আগমনের সংবাদ পাইয়া প্রভু পরম আনন্দিত হইলেন এবং নীলাচল হইতে কৃপাচিহ্ন স্বরূপ ডোর-কৌপীন ও আসন প্রেরণ করিলেন। গোপাল সেই প্রভুদত্ত ডোর ও আসন শ্রদ্ধাভরে হৃদয়ে ধারণ করিয়া ভাবাবেশে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়েন। সেই ডোর ও আসনটীকে নিত্য পূজা করিবার অভিপ্রায় করিয়া গোপাল শ্রীরূপের নিকটে অনুমতি প্রার্থনা করিলে তিনি বলিলেন 'নিজের সুখের প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া অবিচারে প্রভুর আজ্ঞা পালন করাই আমাদের কর্ত্তব্য, অতএব তাঁহার আদেশ অনুসারে তুমি এই ডোর গলায় দিয়া আসনে উপবেশন পূর্ব্বক ভজন করিবে এবং দীক্ষা মন্ত্র প্রদান করিবে।' এই সময়ে শ্রীধামের বৈষ্ণব সমাজ তাঁহাকে গোস্বামী আখ্যা প্রদান করেন।

উত্তর প্রদেশে, ভ্রমণ কালে এক সময় ভট্ট প্রভু এক মূর্ত্তি শালগ্রাম শিলা প্রাপ্ত হন। শ্রীধামে আসিয়া সেই শালগ্রাম প্রতিষ্ঠিত করিয়া তিনি নিত্য পূজা করিতেন। কোনও সময়ে একজন ধনবান ব্যক্তি ঠাকুরের উদ্দেশ্যে কিছু অলঙ্কার আনিয়া তাঁহার নিকটে দিয়া যান। ভট্ট প্রভু তখন সেই অলঙ্কারগুলি ঠাকুরকে পরাইবার ইচ্ছা করিলেন, কিন্তু শিলা মূর্ত্তিতে সেই সাধ মিটিবার কোনও সম্ভাবনা নাই জানিয়া তিনি ঠাকুরের সম্মুখে ব্যাকুল প্রাণে কাঁদিতে কাঁদিতে আবেদন জানাইতে থাকিলে, ভক্তের ইচ্ছা পূরণের জন্য সেই শালগ্রামমূর্ত্তি বৈশাখী পূর্ণিমার দিন শ্রীরাধারমণ রূপ পরিগ্রহ করেন। পূর্ব্বের শালগ্রাম সেই নব প্রকাশিত মূর্ত্তির পৃষ্ঠদেশে সংলগ্ন হইয়া রহিলেন। এই মূর্ত্তিই শ্রীধামের বিখ্যাত শ্রীশ্রীরাধারমণ দেব। ইঁহার বামে শ্রীমতী নাই। তৎ পরিবর্ত্তে শ্রীমতীর প্রতিভূ স্বরূপে একটী রৌপ্য মুকুট বিরাজিত আছেন। মুসলমান আক্রমণের ভয়ে শ্রীধাম হইতে গোস্বামি-গণের সেবিত বহু বিগ্রহকেই স্থানান্তরিত করা হইয়াছিল, কিন্তু শ্রীরাধারমণ জীউ স্থান ত্যাগ করেন নাই। তবে সেই প্রাচীন মন্দির আর নাই, লক্ষ্মৌ নিবাসী সাহকন্দন নামক জনৈক ব্যবসায়ী ও তাঁহার

ভ্রাতা কর্ত্তৃক নির্ম্মিত এক বিরাট মন্দিরে বর্ত্তমানে শ্রীরাধারমণ জীউ অবস্থান করিতেছেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তর্দ্ধানে ভট্ট প্রভু অন্তর্ব্বেদনায় অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়েন। বলংগুণ্ডি গ্রামে প্রভুর আগমন, তাঁহার প্রতি প্রভুর স্নেহপূর্ণ ব্যবহার এবং অন্যান্য সকল কথা স্মরণে উদ্দিত হইলেই তিনি বিরহে অধীর হইয়া উঠিতেন। তখন প্রায়ই তাঁহার মনে পড়িত কথায় কথায় একদিন প্রভু বলিয়াছিলেন,—'গোপাল! শ্রীনিবাস তোমার নিকটে আসিবে, তুমি তাহাকে দীক্ষা দিবে, গৌড়দেশে তাহার দ্বারায় প্রেম ধর্ম্ম প্রচারিত হইবে।' প্রভুর সেই আদেশবাক্যটি মাঝে মাঝে তাঁহার এখনও মনে পড়িয়া যায় বটে, কিন্তু কই, সে ত এখনও আসিল না। আমারও আর বেশী সময় নাই। শ্রীসনাতন অদর্শন হইয়াছেন। শ্রীরূপের প্রতি প্রভুর আদেশ ছিল, শ্রীনিবাস আসিলে তাঁহাকে ভক্তি শাস্ত্র অধ্যয়ন করাইতে হইবে, তাহার আশায় আশায় থাকিয়া তিনিও অদর্শন হইলেন। অদর্শনের পূর্ব্বে একদিন শ্রীরূপ তাঁহাকে আহ্বান করিয়া বলিয়াছিলেন, 'প্রভু কৃপা ইঙ্গিত করিয়া বহু গ্রন্থ রচনা করাইলেন, শ্রীনিবাস সময় থাকিতে থাকিতে যদি আসিত, তবে আমি নিজে তাহাকে অধ্যয়ন করাইতাম, তাহার উপর গ্রন্থ প্রচারের ভার অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইতাম। শ্রীরূপের সেই ইচ্ছা পূর্ণ হয় নাই, তৎপূর্ব্বেই তিনি প্রকটলীলা আবৃত করিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু ও শ্রীরূপ সনাতনের বিরহ-শেল হৃদয়ে বহন করিতে করিতে প্রভুর সেই শেষ আদেশটুকু পালন করিবার জন্য ভট্ট প্রভু এখন শ্রীনিবাসের আগমন পথের দিকে চাহিয়া বসিয়া আছেন এবং আশায় আশায় দিন গুণিতেছেন। কিছুদিন এইরূপে গত হইল।

একদিন রাত্রে ভট্ট প্রভু শয়ন করিয়া আছেন, কিছুক্ষণ পর প্রায় শেষ রাত্রে সামান্য মাত্র নিদ্রার আবেশ আসিয়াছে, এমন সময় শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতন প্রভু স্বপ্নে দর্শন দিয়া তাঁহাকে বলিলেন—'আগামী কল্য শ্রীনিবাস আসিবে, তুমি তাহাকে যত্ন পূর্ব্বক দীক্ষা দান

করিও' —এই কথা বলিয়া তাঁহারা অদর্শন হইলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার নিদ্রাও ছুটিয়া গেল ; তখন রাত্রিও শেষ হইয়াছে। অকস্মাৎ শ্রীরূপ ও সনাতন প্রভুর দর্শন লাভ করিয়া এবং শ্রীনিবাসের আগমন সংবাদ পাইয়া ভট্ট প্রভু হর্ষে, বিষাদে অভিভূত হইয়া বসিয়া বসিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। এমন সময় শ্রীজীব গোস্বামী প্রভু তাঁহার নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ভট্ট প্রভু শুনিলেন যে, গত রাত্রে একই কালে শ্রীজীবের প্রতিও শ্রীরূপ সনাতনের এইরূপ স্বপ্নাদেশ হইয়াছে। তাঁহারা আবির্ভূত হইয়া শ্রীজীবকে বলিয়াছেন—আগামী কল্য সন্ধ্যায় শ্রীনিবাস বৃন্দাবনে উপনীত হইবে। শ্রীগোবিন্দ মন্দিরে সন্ধ্যারতি কালে তাহার সহিত তোমার সাক্ষাৎকার হইবে। সে বহুতাপে জর্জ্জরিত হইয়া আসিতেছে, তুমি তাহাকে সযত্নে পালন করিও। গোপাল ভট্টের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করাইয়া, তুমি তাহাকে ভক্তি শাস্ত্র অধ্যয়ন করাইবে। প্রভু তাহার দ্বারায় বহু কার্য্য সাধন করিবেন।' স্বপ্ন দর্শনের কথা বলিতে বলিতে উভয়েই কাঁদিয়া আকুল হইলেন। তাঁহারা উভয়েই অতি স্থির ও গম্ভীর প্রকৃতির। কিন্তু এই ঘটনায় তাঁহাদের মনে শ্রীরূপ ও সনাতন প্রভুর বিরহ যেন পুনরায় নূতন রূপে আবির্ভূত হইয়া তাঁহাদিগকে অধীর করিয়া তুলিল। তাঁহারা বসিয়া বসিয়া বহুক্ষণ কাঁদিলেন, তাহার পর অতিকষ্টে আত্মসংবরণ করিলেন। অতঃপর শ্রীজীব তাঁহার নিকট হইতে বিদায় লইয়া স্বীয় কুটীরে ফিরিয়া আসিলেন।

শ্রীজীব ও গোপাল ভট্ট প্রভুর সহিত মিলন।

শ্রীনিবাস যখন শ্রীগোবিন্দজীর মন্দিরে আসিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেলেন, তখন স্থানীয় ভক্তগণ হাহাকার করিয়া উঠিলেন এবং পূজারী ও সেবকগণ আসিয়া পরিচর্য্যার দ্বারা তাঁহাকে সচেতন করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এই নবীন প্রেমিকের পরিচয় কি,

কোথা হইতেই বা আসিয়াছেন কেহ তাহা জানেন না। এক বিরাট জনতা তাঁহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল এবং বিস্মিত ভাবে তাঁহার ভাবাবেশ লক্ষ্য করিতে লাগিল। শ্রীজীব এমন সময়ে মন্দিরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সম্মুখে জনতা দেখিয়া তাঁহার মনে কৌতুহল জাগিল। তিনি ভিতরে প্রবেশ করিতে উদ্যত হইলে সকলে সসম্ভ্রমে পথ ছাড়িয়া দাঁড়াইল। ইতঃপূর্ব্বে শ্রীজীব শ্রীনিবাসকে কখনও দেখেন নাই। ভিতরে প্রবেশের পর মূর্চ্ছিত শ্রীনিবাসের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়াই তিনি বিস্ময়ে ও আনন্দে শিহরিয়া উঠিলেন। শ্রীজীব দেখিয়াই বুঝিলেন 'এই সেই শ্রীনিবাস।' অনশন ও অনিদ্রায় তাঁহার শরীর কৃশ ও ধূলি-মলিন; কিন্তু তথাপি মেঘাবৃত চন্দ্রের ছটার ন্যায় সেই দেহ হইতে সুনির্ম্মলতেজ নির্গত হইতেছে। শ্রীনিবাস এক পার্শ্বে পড়িয়া আছেন এবং তাঁহার নয়ন দিয়া তখনও অশ্রুর প্রবাহ ছুটিতেছে, এক একবার শরীর বিবর্ণ হইয়া যাইতেছে, কখনও বা প্রবল কম্প আসিয়া দেহকে অধিকার করিতেছে। শ্রীজীব ব্যগ্র ভাবে আসিয়া নিকটে বসিলেন এবং তাঁহার মস্তক আপন ক্রোড়ের উপর স্থাপন করিয়া তাঁহাকে নানা প্রকারে সচেতন করিয়া তুলিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন; কিন্তু বহু চেষ্টাতেও যখন কৃতকার্য্য হইতে পরিলেন না, তখন উপস্থিত ভক্তগণের সাহায্যে তাঁহাকে তুলিয়া আপন কুটীরে লইয়া চলিলেন। সেখানে রাত্রি দ্বিপ্রহরের পর শ্রীনিবাসের চৈতন্য হইল। প্রকৃতিস্থ হইয়াই তিনি সম্মুখে শ্রীজীবকে দেখিলেন। তাঁহার পরিচয় অবগত হইয়া শ্রীনিবাস চরণে পড়িলেন। তখন শ্রীজীব তাঁহাকে বন্ধু সম্বোধনে আপ্যায়িত করিয়া পরম সমাদরে হাত ধরিয়া উঠাইলেন এবং সপ্রেমে গভীরভাবে আলিঙ্গনে আবদ্ধ করিলেন। উভয়ের নয়ন ধারায় উভয়ের অঙ্গ সিক্ত হইতে লাগিল। অতঃপর ঈষৎ শান্ত হইয়া বসিয়া বসিয়া উভয়ে কিছুক্ষণ কথা প্রসঙ্গে অতিবাহিত করিলেন। পরে তাঁহাকে শ্রীগোবিন্দজীর সেবাধিকারী শ্রীকৃষ্ণ পণ্ডিত কর্ত্তৃক প্রেরিত প্রসাদীমালা, মহাপ্রসাদ এবং তাম্বুল দেওয়া

হইল। রাত্রি অধিক হওয়ায় শ্রীনিবাস শ্রীজীবের আদেশ ক্রমে পার্শ্ববর্ত্তী কুটীরে বিশ্রামার্থে গমন করিলেন। উৎকণ্ঠা ও আনন্দের আতিশয্যে তাঁহার চোখে নিদ্রা অসিল না। এক প্রকার বিনিদ্র ভাবেই রাত্রি কাটিয়া গেল।

অতি প্রত্যুষে স্নান ও প্রাতঃকৃত্যাদি সমাধা করিয়া শ্রীনিবাস শ্রীজীবের সহিত শ্রীরাধাদামোদর দর্শন করিয়া শ্রীরূপের সমাধি ভূমিতে উপস্থিত হইলেন। সমাধি দর্শন করিয়া তাঁহার প্রাণের বিরহ যেন দ্বিগুণ বেগে জ্বলিয়া উঠিল। শ্রীনিবাস কাতর কণ্ঠে ক্রন্দন করিতে করিতে সেই সমাধি ভূমিতে গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন। পরে শ্রীজীব তাঁহাকে শান্ত করিয়া সেখান হইতে গোপাল ভট্ট প্রভুর ভজন কুটীরে লইয়া আসিলেন। কুটীরের দ্বারে আসিয়াই শ্রীনিবাস স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া পড়িলেন। দেখিলেন, সম্মুখেই তাঁহার পরমারাধ্য ইষ্টদেব আবিষ্টভাবে বসিয়া আছেন। মৃদু মৃদু নাম উচ্চারণ করিতেছেন আর নয়ন দিয়া অশ্রুর ধারা বহিয়া যাইতেছে। শ্রীনিবাস তাঁহার প্রতি চাহিয়া আছেন আর তাঁহার শরীর মুহুর্মুহু কম্পিত ও পুলকিত হইতেছে। কয়েক মুহূর্ত্ত এইভাবে কাটিল, তাহার পর তিনি অকস্মাৎ অধীর আবেগে ছুটিয়া আসিয়া ভট্ট প্রভুর চরণ তলে লুটাইয়া পড়িলেন। ইঙ্গিতে শ্রীজীবের নিকট হইতে পরিচয় পাইয়া ভট্ট প্রভু ব্যগ্র হইয়া তাঁহাকে ভূমি হইতে তুলিয়া বুকে জড়াইয়া ধরিলেন। তিনি দীর্ঘ দিনের আকাঙ্ক্ষিত বস্তু লাভ করিয়া আনন্দে আত্মহারা হইলেন। তাঁহার চোখেও তখন অশ্রুর ধারা নামিল। ভট্ট প্রভু পরম স্নেহে বার বার শ্রীনিবাসের মুখে, মস্তকে, সর্ব্বাঙ্গে, হাত বুলাইতে বুলাইতে আনন্দে ভাসিতে লাগিলেন। অপূর্ব্ব বাৎসল্যের বশবর্ত্তী হইয়া তিনি সন্তানের মঙ্গল কামনায় নিজের চরণ ধূলি তুলিয়া লইয়া শ্রীনিবাসের মস্তকে পুনঃ পুনঃ অর্পণ করিতে করিতে প্রাণ ভরিয়া আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন। শ্রীজীব দঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া গুরু শিষ্যের এই অপূর্ব্ব মিলন দেখিতেছেন আর নীরবে অশ্রু মুছিতেছেন।

অতঃপর ভট্ট প্রভু আসনে আসিয়া বসিলেন, শ্রীনিবাসকেও নিকটে বসাইলেন। পরে অশ্রুসিক্ত কণ্ঠে বলিলেন—'শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতন প্রভু তোমাকে দেখিবার জন্য বড়ই আগ্রহ প্রকাশ করিতেন, কিন্তু তুমি যথা সময়ে আসিলে না। তাঁহারাও চলিয়া গেলেন, দর্শনাদি কিছুই হইল না। যাইবার সময় আমারও নিকটবর্ত্তী হইয়া আসিতেছে, দেহও ক্রমে অপটু এবং ক্ষীণ হইয়া পড়িতেছে। তোমার আগমনের পথ চাহিয়া কোনও প্রকারে দিন কাটাইতে ছিলাম। বাবা, এত বিলম্ব করিয়া কি আসিতে হয়?' ভট্ট প্রভু পুনরায় বলিলেন—'তোমাকে দীক্ষামন্ত্র প্রদান করিবার জন্য প্রভু নীলাচল হইতে পত্র দিয়াছিলেন, সেই পত্র এখনও আমি সযত্নে তুলিয়া রাখিয়াছি',—বলিতে বলিতে তিনি উঠিয়া পত্র খানি লইয়া আসিলেন। শ্রীনিবাস, প্রভুর সেই হস্তাক্ষর দেখিলেন এবং তাঁহার অহৈতুকী করুণার কথা স্মরণ করিয়া ব্যাকুলভাবে কাঁদিতে কাঁদিতে পত্রখানি একবার মস্তকে ও একবার হৃদয়ে ধারণ করিতে লাগিলেন। অতঃপর ভট্ট প্রভু, প্রভু দত্ত সেই আসন ও ডোর-কৌপীন খানিও আনিয়া দেখাইলেন। পরে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, 'প্রভু অন্তর্হিত হইলেন, শ্রীরূপ ও সনাতন প্রভুও চলিয়া গেলেন। শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু ও শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর চরণ দর্শনও আমার ভাগ্যে হইল না। তাঁহারাও একে একে ছাড়িয়া গেলেন। সরকার ঠাকুর মহাশয় এবং ঠাকুরাণীগণ রহিয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদেরও চরণ দর্শন করিতে পাইলাম না। প্রভু আর কতদিন আমাকে এইরূপভাবে ফেলিয়া রাখিবেন, তিনিই জানেন। এখন তুমি আসিয়াছ, এইবার তোমার দীক্ষা কার্য্যটী সমাধা করিয়া প্রভুর আজ্ঞাটী সফল করিতে পারিলেই আমার কর্ত্তব্য শেষ হয়।'

ভট্ট প্রভু গৌড়ীয় ভক্তগণের সংবাদাদি জিজ্ঞাসা করিলে শ্রীনিবাসও যথোচিত উত্তর দিলেন। বিষ্ণুপ্রিয়া ঠাকুরাণীর কঠোর ভজন নিষ্ঠার কথা শ্রবণ করিতে করিতে তিনি নীরবে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। অতঃপর বিবিধ প্রসঙ্গে আলোচনান্তে ভট্ট প্রভু

পরদিন অর্থাৎ ২২শে বৈশাখ দ্বিতীয়া দিবসে শ্রীনিবাসের দীক্ষার দিন ধার্য্য করিয়া দিলে শ্রীনিবাস আনন্দে আত্মহারা হইলেন। কিছুক্ষণ পর শ্রীনিবাস তাঁহার চরণে দণ্ডবৎ করিয়া বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক শ্রীজীবের সহিত আসিয়া শ্রীরাধারমণ দর্শন করিলেন। তৎপরে লোকনাথ গোস্বামী ও ভূগর্ভ গোস্বামীর কুটিরে আসিয়া তাঁহাদের চরণ বন্দনা করিলেন। পরিচয় পাইয়া তাঁহারা শ্রীনিবাসকে উঠাইয়া বাৎসল্য ভরে আলিঙ্গন দান করিলেন। সেখান হইতে বিদায় লইয়া শ্রীনিবাস শ্রীরাধাবিনোদ, শ্রীগোপীনাথ, শ্রীমদনমোহন প্রভৃতি বিগ্রহগণকে দর্শন করিয়া এবং অন্যান্য ভক্তবৃন্দও ব্রজবাসিগণের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া একেবারে সনাতন প্রভুর সমাধিস্থলে আসিয়া উপনীত হইলেন। সমাধি দর্শনে ব্যাকুল হইয়া শ্রীনিবাস কাঁদিতে কাঁদিতে সেই পবিত্র ভূমিতে গড়াগড়ি দিলেন। তাঁহার ব্যাকুলতা দেখিয়া সকলে অশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিলেন। শ্রীজীব অবশেষে বহু প্রকারে প্রবোধ দিয়া তাঁহাকে শান্ত করিলেন এবং সাবধানে তাঁহাকে কুটিরে লইয়া আসিয়া প্রসাদ সেবন করাইলেন ও বিশ্রামের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। আগামী কল্য শ্রীনিবাসের দীক্ষা হইবে, এই সংবাদ শ্রীজীব বিশিষ্ট ভক্তগণের নিকট প্রেরণ করিলেন।

শ্রীনিবাসের দীক্ষা।

আজ ২২শে বৈশাখ, শ্রীনিবাসের সারাজীবনের সাধ আজ পূর্ণ হইবে। অদীক্ষিত জীবনের গ্লানি বহনের অনুশোচনায় তাঁহার কতরাত্রি বিনিদ্রভাবে কাটিয়া গিয়াছে, খেদে, দুঃখে রোদন করিয়া কত দীর্ঘ দিন অতিবাহিত হইয়াছে, সেই দুঃখের আজ অবসান ঘটিবে। আনন্দে ও উৎকণ্ঠায় রাত্রিটী বিনিদ্রভাবে কাটাইয়া তিনি ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে স্নান করিয়া আসিলেন এবং আনন্দাশ্রু মুছিতে মুছিতে আসিয়া

শ্রীজীবের চরণে দণ্ডবৎ করিলেন। অল্পক্ষণ পরেই উষার রক্তিম আভায় পূর্ব্ব দিগন্ত আলোকিত হইয়া উঠিল। শ্রীজীব তাঁহাকে ভট্ট প্রভুর কুটির অভিমুখে লইয়া চলিলেন। শ্রীনিবাস আসিয়া ভট্ট প্রভুর চরণ বন্দনা করিলে, তিনিও উঠাইয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন দিলেন। অতঃপর সকলে একত্র হইয়া শ্রীরাধারমণজীর মন্দিরে আসিলেন। শ্রীবিগ্রহের সম্মুখে প্রভুদত্ত ডোর গলায় দিয়া ভট্টপ্রভু সেই প্রভুদত্ত আসনে আসিয়া বসিলেন। তাঁহার বাম পার্শ্বে শ্রীনিবাসকে বসান হইল। তখন শ্রীনিবাসের আর দেহ-স্মৃতি নাই। নয়নে অবিরল ধারায় অশ্রু ঝরিতেছে। তিনি ভট্ট প্রভুর চরণ দুইখানি হৃদয়ে ধরিয়া বসিয়া রহিলেন। আজ আপনার দেহ মন ইন্দ্রিয় প্রভৃতি সমস্ত কিছু শ্রীগুরুদেবের চরণে উৎসর্গ করিয়া দিয়া প্রাণে প্রাণে আত্ম-সমর্পণ করিতে করিতে শ্রীনিবাস ভাবাবেগে অস্থির হইয়া পড়িলেন। শ্রীনিবাসের নয়ন জলে ভট্ট প্রভুর চরণ দুইখানি ধৌত হইতেছিল। ভট্ট প্রভুও সেই অবস্থায় বসিয়া বসিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে উভয়ে কিছু সংযত হইলে পর মাল্য, চন্দন ও তুলসী আনয়ন করাইয়া শ্রীনিবাসের হস্তে তুলিয়া দেওয়া হইল। শ্রীনিবাস তখন আবিষ্ট চিত্তে শ্রীরাধারমণের চরণে অঞ্জলি প্রদান করিলেন। তৎপরে তাঁহাকে ভট্ট প্রভুর নিকটে উপবেশন করাইয়া দিলে, ভট্ট প্রভু তাঁহাকে যথাবিধি দীক্ষা প্রদান করিলেন। মন্ত্রাত্মক বর্ণের এক একটি শব্দ তাঁহার কর্ণে প্রবিষ্ট হইতেছে আর সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার দেহে পুলক ও কম্পের তরঙ্গ বহিয়া যাইতেছে। মন্ত্র প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে শ্রীনিবাস মূর্চ্ছিত প্রায় হইয়া শ্রীগুরুদেবের চরণে পড়িলেন। কিছুক্ষণ পর শ্রীনিব স ঈষৎ শান্ত হইয়া ভট্ট প্রভুর সম্মুখে উপবেশন করিলে তিনি একে একে মন্ত্র পুরশ্চরণ বিধি ও ভজনের রহস্য এবং তাহার ক্রমগুলি বলিয়া দিলেন।

মায়ার বন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া জীবসমাজকে অবিনশ্বর আনন্দ রসে নিমগ্ন করিবার নিমিত্তই বেদাদিশাস্ত্র, ঋষি ও মহাপুরুষগণ

ভগবৎ ভজনের উপদেশ করিয়াছেন। ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও পুরুষোত্তম এই তিন স্বরূপেই শ্রীভগবান নিত্য প্রকাশিত রহিয়াছেন। তাঁহার নাম, রূপ, গুণ ও লীলাদির প্রকাশ একমাত্র পুরুষোত্তম স্বরূপেই অভিব্যক্ত আছে বলিয়া এই স্বরূপই সাধকগণের নিকটে অধিক আকর্ষণীয়, এই আনন্দ সম্ভোগের চমৎকারিতাও এখানে সর্ব্বাধিক। শ্রীপুরুষোত্তমের বিভিন্ন রূপ ও লীলার মধ্যে একমাত্র শ্রীকৃষ্ণ স্বরূপেই সেই রূপ গুণাদির পূর্ণতম বিকাশ ঘটিয়াছে। সমগ্র শ্রীকৃষ্ণলীলার মধ্যে আবার শ্রীবৃন্দাবনলীলায় তাহার অভিব্যক্তি সর্ব্বাধিক। অতএব ব্রজকিশোর শ্রীকৃষ্ণ স্বরূপকে লাভ করাই জীবের চরম ও পরম পুরুষার্থ, ভক্তির আশ্রয়ে থাকিয়া তাঁহার সহিত কোন একটি 'রসের সম্বন্ধ' স্থাপন পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণ অনুশীলন করাই ভজনের রীতি। দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর ভেদে এই রস চতুর্ব্বিধ। সর্ব্বরসের আশ্রয় বলিয়া সবগুলির মধ্যে মধুর রসই শ্রেষ্ঠতম। সেই রস স্বকীয়া ও পরকীয়া ভেদে দ্বিবিধ হইলেও পরকীয়াতে স্বাদাধিক্য দৃষ্ট হয়। অতএব মধুর রসে পরকীয়াভাবে ব্রজরামাগণের আনুগত্যময়ী রাগানুগার আশ্রয় অবলম্বন পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণ উপাসনাই চরম ভাব, এবং চরম প্রাপ্তি। শ্রীকৃষ্ণের সহিত শ্রীমতীর সম্মিলন ঘটাইয়া শ্রীকৃষ্ণ সেবা করাই ব্রজরামাগণের কার্য্য। সেই সেবা অধিকার আবার সখীগণ অপেক্ষা মঞ্জরীগণের অধিক বলিয়া সেবাজনিত আনন্দ সম্ভোগের সম্ভাবনাও তাঁহাদের অধিকতর। সেবাধিকার অনুসারে মঞ্জরীগণের মধ্যে বিভিন্ন 'যুথ' বা দল আছে। যুথেশ্বরী অর্থাৎ যুথের প্রধানা মঞ্জরীর আনুগত্যে থাকিয়া অপরাপর মঞ্জরীগণ তাঁহারই ইঙ্গিতক্রমে সেবায় নিযুক্ত থাকেন। এই মঞ্জরী স্বরূপ প্রাপ্তিই জীবের চরম পুরুষার্থ, তদপেক্ষা প্রাপ্তির বিষয় আর কিছু নাই। ভাব ও প্রকৃতির গতি লক্ষ্য করিয়া অন্তর্যামী শ্রীগুরুদেব শিষ্যকে কোন একটী বিশেষ মঞ্জরীর আনুগত্যে অন্তঃচিন্তিত একটী মঞ্জরী স্বরূপে ধারণা করিতে আদেশ করেন। সেই দেহ ভাবনা করিয়া শ্রীকৃষ্ণসেবা

লালসাযুক্ত হইয়া ভজন করিতে করিতে সখীগণের কৃপায় উপাসক একদিন যুগল সেবাধিকার লাভ করিয়া কৃতার্থ হ'ন।

গোপাল ভট্ট প্রভু শ্রীনিবাসকে শ্রীরূপ মঞ্জরীর যুথে এবং শ্রীগুণ মঞ্জরীর (গুণ মঞ্জরী—শ্রীগোপাল ভট্ট প্রভু স্বয়ং) আশ্রয়ে শ্রীমণি মঞ্জরী স্বরূপে এবং শ্রীরতি মঞ্জরী ও শ্রীমঞ্জুলালি প্রভৃতি সঙ্গিনীগণের সহিত মননের দ্বারায় অবস্থিত হইয়া স্মরণে শ্রীকৃষ্ণ-সেবাদিতে নিযুক্ত করিয়া দিলেন। বলিলেন—'অনুরাগ যত বেশী তীব্র হইবে, সিদ্ধিও ততই নিকটবর্ত্তী হইবে। অতএব অনুরাগযুক্ত হইয়াই ভজন করিবে। যে ভাব এবং যে স্বরূপ ভাবনা করিয়া সাধন করা যায় সিদ্ধাবস্থায় সেই ভাব এবং স্বরূপই লাভ হইবে। আনুগত্য ব্যতীত লক্ষ্যে উপনীত হওয়া যায় না। ভাবের প্রতিকুল বিষয়সমূহ বর্জ্জনপূর্ব্বক অনুকুল অবস্থায় থাকিয়া ভজনে অগ্রসর হইতে হয়। নাম অপরাধ ও সেবা অপরাধ হইতে সর্ব্বদা সাবধান থাকিবে। অন্য ভজন প্রণালীর অথবা অন্য কোন দেব দেবীর নিন্দা করিবে না। শ্রীমন্মহাপ্রভু ও শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রকে অভেদ বলিয়া জানিবে। ব্রজলীলা অনুভব হইলে পর গৌরলীলা রহস্য অবগত হওয়া যায়।' ভট্ট প্রভু এইরূপে শ্রীনিবাসকে বহু উপদেশ করিলেন। শ্রীভগবান যখন ভক্তভাব অবলম্বন করিয়া অবতীর্ণ হ'ন তখন তিনি স্বয়ং, স্বেচ্ছায় ভজন পথ অনুসরণ করিয়া সাধকগণকে ভক্ত-জীবনের আদর্শ দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করেন। প্রভুর প্রেমাবতার শ্রীনিবাসের সাধন প্রচেষ্টারও ইহাই তাৎপর্য্য বলিয়া মনে হয়।

শ্রীনিবাসের স্বভাব সুন্দর দেহটী কুঙ্কুম ও চন্দনাদির দ্বারা অপরূপভাবে সাজাইয়া দেওয়া হইয়াছে। একটী বড় পুষ্পমাল্য গলদেশে দুলিতেছে। ভক্তির মাধুর্য্যে এবং আত্মসমর্পণের গরিমায় তাঁহার মুখমণ্ডল এক অপূর্ব্ব লাবণ্যের আভায় উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে। তাঁহার অঙ্গসকল মুহুর্ম্মুহুঃ পুলকিত হইতেছে এবং তিনি উদ্গত নয়নবারি অতিকষ্টে নিরুদ্ধ করিবার চেষ্টা করিতেছেন।

শ্রীনিবাস উঠিয়া সর্ব্বাগ্রে শ্রীগুরুদেবের চরণে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিলেন, পরে শ্রীজীব ও অন্যান্য সমাগত ভক্তগণের চরণে প্রণাম করিলেন।

দীক্ষা গ্রহণের পর হইতেই শ্রীনিবাস ভট্ট প্রভুর শ্রীঅঙ্গ সেবার কার্য্যটী আপন হস্তে তুলিয়া লইলেন। কোনও কোনও দিন নিজেই রন্ধন করিতেন এবং ভোগ নিবেদন করিয়া শ্রীগুরুদেবের সম্মুখে বসিয়া তাঁহাকে সেবা করাইতেন। গুরুসেবা, ব্রজবাসী ও বৈষ্ণবগণের সঙ্গ, শ্রীমূর্ত্তি দর্শন, দণ্ডবৎ, পরিক্রমা এবং একনিষ্ঠ ভজনে তাঁহার দিনগুলি অতিবাহিত হইতে লাগিল। তাঁহার অন্তরের সকল ক্ষোভ এবং সকল অভাবের নিবৃত্তি ঘটিল। তিনি যেন আনন্দ তরঙ্গে সাঁতার দিতে লাগিলেন।

শ্রীপাদ দাস গোস্বামী ও শ্রীকবিরাজ গোস্বামীর সহিত মিলন।

দীক্ষা গ্রহণের পর ভট্ট প্রভু এবং শ্রীজীবের আদেশে শ্রীনিবাস একদিন শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী ও শ্রীকবিরাজ গোস্বামী এবং অন্যান্য মহাত্মগণের শ্রীচরণ দর্শনার্থে শ্রীরাধাকুণ্ডে গমন করিলেন। প্রভুর প্রকটকালে নীলাচলে গিয়া রঘুনাথ ১৬ বৎসর তাঁহার সান্নিধ্যে থাকিয়া সেবায় ও ভজনানন্দে কাল কাটাইয়াছিলেন। প্রভু ও স্বরূপের অন্তর্ধানের পর তাঁহাদের বিরহ সহ্য করিতে না পারিয়া তিনি প্রভুদত্ত শ্রীগোবর্দ্ধন শীলা এবং গুঞ্জামালা লইয়া নীলাচল হইতে বিদায় গ্রহণ করেন। শ্রীরূপ সনাতনের চরণ দর্শন পূর্ব্বক শ্রীগোবর্দ্ধন হইতে 'ভৃগুপাতে' দেহত্যাগ করিয়া এই বিরহ যন্ত্রনার অবসান ঘটাইবেন, এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া তিনি শ্রীধামে আসিয়াছিলেন। কিন্তু শ্রীরূপ সনাতন তাঁহার উদ্দেশ্য অবগত হইয়া তাঁহাকে বহু চেষ্টায়

নিরস্ত করেন। তাঁহার জীবনরক্ষা হইল বটে, কিন্তু তাহার পর তিনি সেই বিরহ যন্ত্রণা হইতে পরিত্রাণের আশায় কঠোর ভজনে আত্মনিয়োগ করিলেন। রঘুনাথের বয়স এখন প্রায় আশী বৎসর অতিক্রম করিয়াছে, কৃচ্ছ্রতায় দেহ ক্ষীণ, দৃষ্টিশক্তিও দুর্ব্বল হইয়া আসিয়াছে।

শ্রীনিবাস রাধাকুণ্ডে আসিয়াই রঘুনাথের চরণে পড়িলেন। তিনি শ্রীনিবাসকে চিনেন না। কিন্তু তাঁহার ব্যাকুলতা দেখিয়া রঘুনাথ বিচলিত হইলেন এবং স্নেহভরে উঠাইয়া তাঁহাকে যেন চিনিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু পারিলেন না। তখন শ্রীনিবাস আপনি উঠিয়া আত্ম পরিচয় প্রদান করিলে রঘুনাথ, শীর্ণ বাহুযুগলের দ্বারায় আকর্ষণ করিয়া তাঁহাকে বুকের উপর টানিয়া লইলেন। গৌর-বিরহী রঘুনাথ প্রভুর প্রেম-মূর্ত্তিকে হৃদয়ে ধরিয়া যেন সেই অভাবটী নিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তিনি শ্রীনিবাসকে নিকটে বসাইয়া একে একে গৌড় ও নীলাচলবাসী ভক্তগণের কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। শ্রীনিবাসও যথাযোগ্য উত্তর দিলেন। অতঃপর রঘুনাথ তাঁহাকে প্রভুদত্ত গুঞ্জামালা এবং শ্রীগোবর্দ্ধন শীলা দর্শন করাইলেন। দর্শন করিয়া শ্রীনিবাস পুনঃ পুনঃ দণ্ডবৎ করিতে করিতে ব্যাকুলভাবে কাঁদিতে লাগিলেন। শ্রীনিবাস অতঃপর শ্রীকবিরাজ গোস্বামীর সহিত মিলিত হইলেন এবং রাধাকুণ্ডবাসী অন্যান্য মহাত্মগণের শ্রীচরণ দর্শনাদি করিয়া তিন দিন পর সেখান হইতে বিদায় লইয়া শ্রীধামে ফিরিয়া আসিলেন।

শ্রীধামে ফিরিয়া আসিবার পর হইতে শ্রীনিবাস নিয়ম অবলম্বন পূর্ব্বক ভজন, শ্রীগুরু সেবা এবং শ্রীজীবের নিকট অধ্যয়নে মনোনিবেশ করিলেন। শ্রীগুরুদেবের কৃপা ইঙ্গিতে লীলা স্মরণ করিতে করিতে শ্রীনিবাস সময়ে সময়ে ধ্যানের গভীরতার মধ্যে একেবারে আত্মহারা হইয়া যাইতেন। একদিন তিনি ধ্যানযোগে গৌরলীলায় প্রবেশ করিলেন, তিনি দেখিলেন প্রভু বসিয়া আছেন, তিনি প্রভুকে সুগন্ধি তৈল, মাল্য ও চন্দনাদির দ্বারায় সজ্জিত করিয়া দিয়া অদূরে দাঁড়াইলেন

এবং দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া চামর ব্যজন করিতে লাগিলেন। তখন আর একজন সেবক প্রভুর ইঙ্গিতে তাঁহার গলার মালাটী খুলিয়া লইয়া শ্রীনিবাসের গলায় পরাইয়া দিলেন। শ্রীনিবাস সেই প্রসাদী মালা গলায় পরিয়া পরমানন্দে চামর সেবা করিতে লাগিলেন, কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই তাঁহার বাহ্যজ্ঞান ফিরিয়া আসিল। তখন আপন দেহের প্রতি দৃষ্টি পড়িতেই হর্ষে বিস্ময়ে আত্মহারা হইয়া শ্রীনিবাস দেখিলেন প্রভুর কৃপা-দত্ত সেই ধ্যানরাজ্যের মালা স্থূলরাজ্যে চলিয়া আসিয়াছে। কেহ দেখিতে পায়, এই ভয়ে তিনি মালাটী গলদেশ হইতে খুলিয়া তাড়াতাড়ি লুকাইয়া ফেলিলেন। অলক্ষ্যে থাকিয়া একজন তাহা লক্ষ্য করিলেন, কিন্তু শ্রীনিবাস তাহা জানিতে পারিলেন না। অনুরূপ ঘটনা আরও একদিন ঘটিল। তখন বসন্তকাল, একদিন শ্রীনিবাস যথারীতি ধ্যানে বসিয়াছেন। মন সহজেই বসন্ত-লীলায় আবিষ্ট হইল। সেই ভাব লইয়া স্মরণ করিতে করিতে সেদিনও তিনি গভীরতার মধ্যে ডুবিয়া গেলেন। লীলারাজ্যে আসিয়া তিনি ব্রজরামাগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণের হোলি খেলা দর্শন করিতেছেন। খেলিতে খেলিতে শ্রীমতীর হাতের ফাগু নিঃশেষ হইয়া গেলে, শ্রীনিবাস তাঁহার হস্তে ফাগু জোগাইতে লাগিলেন। এইরূপ ফাগু-রঙ্গে ক্রীড়া করিতে করিতে সকলে শ্রান্ত হইয়া উপবেশন পূর্ব্বক বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। তখন শ্রীনিবাস বিবিধ পরিচর্য্যার দ্বারা তাঁহাদের শ্রান্তি অপনোদনের জন্য চেষ্টা করিতেছেন, এইরূপ সময়ে তাঁহার ধ্যান ভঙ্গ হইল, তখন তিনি বিস্ময়-পুলকিত নেত্রে দেখিলেন যে, সেই রাজ্যের ফাগু চিহ্ন স্থূলরাজ্যে আসিয়া পড়িয়াছে। অন্যান্য ভক্তগণও দেখিলেন যে, তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ ফাগু-রঙ্গে রক্তিম আকার ধারণ করিয়াছে।

অধ্যয়ন বিষয়েও শ্রীনিবাসের গভীর অনুরাগ দেখা দিল। শ্রীজীবের ন্যায় অদ্বিতীয় অধ্যাপক এবং শ্রীনিবাসের ন্যায় মেধাবী ছাত্রের একত্র সংযোগ প্রায় ঘটে না। শ্রীমদ্ভাগবত অধ্যয়ন

করিবার সাধ তাঁহার জন্মগত, শ্রীজীবের দ্বারায় শ্রীনিবাসের সেই সাধ পূর্ণ হইল। অখণ্ড মনোযোগ সহকারে তিনি অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হইলেন। তীব্র অধ্যবসায়ের ফলে তিনি অতি অল্পকালের মধ্যেই শ্রীমদ্ভাগবত ও অন্যান্য ভক্তিশাস্ত্রে অসাধারণ ব্যুৎপত্তি লাভ করিলেন। একদিন (শ্রীনিবাস তখন নিকটে ছিলেন না) শ্রীজীব ভক্তগণের সহিত শ্রীরূপ কৃত উজ্জ্বল নীলমণি গ্রন্থের কোন একটী বিষয় লইয়া আলোচনা করিতেছিলেন। তিনি প্রসঙ্গ ক্রমে নিম্নোক্ত শ্লোকটী পাঠ করিলেন ঃ—

"সখি রোপিত দ্বিপত্রঃ শতপত্রাক্ষেণ যো ব্রজদ্বারি।
সোঽয়ং কদম্বডিম্ভঃ ফুল্লো বল্লব বধূস্তুদতি।"

অর্থাৎ, "সখি! পদ্মলোচন শ্রীকৃষ্ণ ব্রজদ্বারে যে নূতন কদম্ব গাছটী রোপণ করিয়া গিয়াছেন, সেই চারা গাছটী পুষ্পিত হইয়া গোপ রমনীগণকে ক্লেশ প্রদান করিতেছে।"

শ্রীকৃষ্ণ মথুরা গমনের পূর্ব্বে অন্যান্য বৃক্ষগুলি যেরূপ দেখিয়া গিয়াছিলেন, সেগুলি তদ্রূপই আছে, কিন্তু তাঁহার স্বহস্ত রোপিত বৃক্ষটী উপযুক্ত সময়ের পূর্ব্বেই কি প্রকারে পুষ্পিত হইল ? ইহার তাৎপর্য্য কি ? ব্রজরামাগণ কিছুমাত্র অনুমান করিতে না পারিয়া নানাপ্রকার অমূলক আশঙ্কায় চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। কেহ কেহ বলিলেন— 'শ্রীকৃষ্ণ এইবার বোধ হয় আমাদিগকে নিশ্চয়ই পরিত্যাগ করিলেন, ইহা বোধ হয় তাহারই নিদর্শন হইবে।" এইরূপ নানাপ্রকার আশঙ্কায় কাতর হইয়া তাঁহারা শোকে বিগলিত হইয়া অশ্রু মোচন করিতে লাগিলেন, কিন্তু কি কারণে বৃক্ষটী পুষ্পিত হইল, ভাব স্ফূর্ত্তি না হওয়ায় শ্রীজীব তখন সে সমস্যার কোন মীমাংসা করিলেন না। অন্যান্য সকলে নানা প্রকার ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন, কিন্তু একটী সিদ্ধান্তও শ্রীজীবের মনঃপূত হইল না, এমন সময় শ্রীনিবাস স্বচ্ছন্দ গতিতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং ধীরে ধীরে শ্রীজীবের পার্শ্বে উপবেশন করিলেন। শ্রীজীব তখন স্মিত হাস্যে তাঁহার প্রতি

দৃষ্টিপাত করিয়া তাঁহাকে উহার তাৎপর্য্য জিজ্ঞাসা করিলেন। শ্রীনিবাস তখন বলিতে লাগিলেন 'মথুরায় আসিয়া শ্রীকৃষ্ণ ব্রজের কথা সকল চিন্তা করেন, অন্যান্য বৃক্ষগুলি তিনি পূর্ব্বে যেমন দেখিয়া আসিয়াছিলেন, সেগুলির বিষয়ে তিনি সেইরূপ ভাবেই চিন্তা করেন। কিন্তু যে বৃক্ষটি স্বহস্তে রোপণ করিয়া আসিয়াছেন, কৌতুহল বসে তিনি ভাবেন সেটী হয়ত বড় হইয়াছে, পুষ্পিত হইয়াছে, ভ্রমর ও মক্ষিকাগণ হয়ত তাহাকে ঘিরিয়া গান করিতেছে। সেবা-নিষ্ঠ বৃক্ষগুলি শ্রীকৃষ্ণের চিন্তার অনুরূপ ভাবে আপনাদিগকে পরিচালিত করে বলিয়া, অন্যান্য বৃক্ষগুলি যথা পূর্ব্ব অবস্থান করিতেছে সেই বিশেষ বৃক্ষটী কাল সমাগমের পূর্ব্বেই আপনাকে পুষ্পিত করিয়াছে,' শ্রীনিবাসের সুসিদ্ধান্ত যুক্ত সরস ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া ভক্তগণ বিস্মিত হইলেন এবং আনন্দে জয়ধ্বনি করিতে লাগিলেন। শ্রীজীব তাঁহার কৃতীছাত্রের পরিচয়টী ভক্তবৃন্দের নিকটে প্রকাশ করিয়া দিবার জন্যই বোধ হয় নিজে শ্লোকটির কোনও রূপ ব্যাখ্যা না করিয়া শ্রীনিবাসের দ্বারায় করাইলেন। তাঁহার উদ্দেশ্য সফল হইল। শ্রীনিবাস কি বস্তু, তাঁহারা বুঝিলেন। শ্রীজীব তাঁহার মস্তকে, পৃষ্ঠে সস্নেহে করমার্জ্জন করিতে করিতে বলিলেন— 'শ্রীরূপ ও সনাতন প্রভু তোমার সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছিলেন দেখিলাম তাহা অতিরঞ্জিত নহে'। তাঁহাদের অকুণ্ঠ কৃপা ব্যতীত শুধু পাণ্ডিত্যের দ্বারায় এই জাতীয় বিচার-শক্তি কেহ কখনও লাভ করিতে পারে না। শ্রীনিবাসের অসাধারণ পাণ্ডিত্য এবং অনুভব শক্তির কথা ধীরে ধীরে ব্রজ মণ্ডলের সর্ব্বত্র প্রচারিত হইল।

একদিন সন্ধ্যাকালে শ্রীজীব শ্রীনিবাসকে গোবিন্দ মন্দিরে লইয়া আসিলেন, পরে তাঁহাকে শ্রীবিগ্রহের সম্মুখে প্রণাম করাইয়া গলায় প্রসাদী মালা এবং চন্দন কুম্‌কুমাদির দ্বারা তাঁহাকে সজ্জিত করিয়া দিয়া সস্নেহে আলিঙ্গন করিলেন। তাহার পর শ্রীজীব তাঁহার হাতটী ধরিয়া উপস্থিত ভক্তবৃন্দ ও পণ্ডিতগণের সম্মুখে লইয়া আসিলেন এবং তাঁহাদের নিকটে শ্রীনিবাসের পাণ্ডিত্য, শাস্ত্রাধিকার

ভজননিষ্ঠা প্রভৃতি বিষয়ে প্রশংসা করিতে করিতে বলিলেন, আমি ইহাকে 'আচার্য্য ঠাকুর' এই উপাধির দ্বারায় ভূষিত করিতে মনস্থ করিয়াছি। আপনাদের স্বচ্ছন্দ অনুমতি পাইলে আমার এই বাসনা পূর্ণ হইতে পারে। ভক্তবৃন্দ ও পণ্ডিতগণ শ্রীনিবাসকে অত্যধিক স্নেহ করেন। শ্রীজীবের প্রস্তাবে তাঁহারা পরমানন্দে সম্মত প্রদান করিলেন। আত্ম-প্রশংসা শ্রবণে শ্রীনিবাস লজ্জা পাইয়া অবনত মস্তকে দাঁড়াইয়া আছেন দেখিয়া ভক্তগণ নানাপ্রকারে তাঁহাকে উৎসাহিত করিলেন। শ্রীজীব তাঁহাদের চরণ বন্দনা করাইয়া তাঁহাকে ভট্ট প্রভু ও লোকনাথ প্রভুর নিকটে আনিয়া দণ্ডবৎ করাইলেন, পরে তাঁহাকে স্বীয় কুটীরে লইয়া আসিলেন।

শ্রীনিবাস এইবার শ্রীজীবের আদেশে অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করিলেন। স্থানীয় ভক্ত ও ব্রজবাসী ছাত্রগণ তাঁহার নিকটে অধ্যয়ন করিতে লাগিল। এই সময় হইতেই শ্রীনিবাস সমগ্র ব্রজমণ্ডলে আচার্য্য ঠাকুর নামে পরিচিত হইলেন। আমরাও অতঃপর আচার্য্য প্রভু বলিয়াই তাঁহার পরিচয় দিব।

নরোত্তম ও শ্যামানন্দ সহ মিলন।

শ্রীমন্মহাপ্রভু বৃন্দবন যাত্রার ছলে নীলাচল হইতে রামকেলী গ্রামে আসিয়া শ্রীরূপ সনাতনকে কৃপা করেন। একদিন সেখানে সঙ্কীর্ত্তন আবেশে নৃত্য করিতে করিতে প্রভু হঠাৎ পদ্মা পারের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া প্রেমকণ্ঠে 'নরু, নরু' বলিয়া কাহাকে যেন ডাকিলেন। কাহাকে ডাকিলেন তাহা কেহ জানিল না। রামকেলী হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের সময় পদ্মাতীরে গড়ের হাট গ্রামে আসিয়া প্রভু থামিলেন। সামনেই একটি তমাল বৃক্ষ (সে গাছ এখনও আছে) এবং তাহারই পার্শ্ব দিয়া পদ্মা বহিয়া চলিয়াছে। সেই ঘাটে প্রভু স্নান করিতে নামিয়া পদ্মাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন "পদ্মা, আমার প্রেম

তোমার নিকটে সঞ্চিত রাখিলাম, যথা সময়ে তুমি নরুকে তাহা অর্পণ করিবে।' কে এই 'নরু,' কেহ বুঝিল না ; এই বিচিত্র কথাগুলির অর্থও কেহ জানিল না, কিন্তু এই ঘটনার পর হইতেই ঘাটটি 'প্রেমতলীর ঘাট' নামে পরিচিত হইল।

এই ঘটনার প্রায় অষ্টাদশ বৎসর পরে। রামকেলী গ্রাম হইতে যে স্থানটির প্রতি লক্ষ্য করিয়া প্রভু 'নরু' বলিয়া আহ্বান করিয়াছিলেন, সেই পদ্মা তীরে, খেতুরী গ্রামে ১৪৫৫ শকের শুভ মাঘী পূর্ণিমায়।(১) শ্রীনরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের আবির্ভাব হইল। তাঁহার জন্মকালে জননী নারায়ণী দেবী সকলের অলক্ষ্যে শ্রীমন্নিত্যানন্দ, শ্রীঅদ্বৈত ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর নৃত্য দর্শন করিয়াছিলেন।(২) নবজাতকের পিতা রাজা কৃষ্ণানন্দ দত্ত যথাকালে তাঁহার অন্নপ্রাশনের ব্যবস্থা করিলেন। যখন অনিবেদিত অন্ন তাঁহার সম্মুখে দেওয়া হইল শিশু তখন তাহা স্পর্শও করিলেন না, পরে নিবেদিত প্রসাদ দেওয়া হইলে শিশু ক্রীড়াচ্ছলে হাসিতে হাসিতে সেই প্রসাদ মুখে তুলিয়া লইলেন। কয়েক বৎসর পর তাঁহার বিদ্যারম্ভ হইল। নরোত্তম মনোযোগ সহকারে পড়িতেও লাগিলেন। খেলা-ধূলা, আমোদ-প্রমোদ সবই করেন কিন্তু কি যেন একটি অভাবের অনুভূতি আসিয়া মাঝে মাঝে তাঁহাকে যেন ব্যথাতুর ও উদাস করিয়া তুলে। ইহার কারণ কি শিশু তাহা বুঝিতে পারেন না, সুতরাং প্রতিকারের উপায়টিও আবিষ্কৃত হয় না। কিন্তু সেই ভাব যেন ক্রমেই বাড়িতে লাগিল। এমন সময় গ্রামবাসী পরম ভাগবত ব্রাহ্মণ সন্তান কৃষ্ণদাসের দৃষ্টি নরোত্তমের উপর পড়িল, নরোত্তম কি

(১) শ্রীল রামদাস বাবাজী মহারাজ কর্তৃক সম্পাদিত 'সাধক কণ্ঠ মালা' হইতে এই তারিখ উদ্ধৃত হইয়াছে। পঞ্চদশ শকাব্দার মধ্যভাগে নরোত্তমের জন্ম এই বলিয়া অন্যান্য ঐতিহাসিকগণ উল্লেখ করিয়াছেন।

(২) খেতুরীতে নরোত্তমের জন্মের পবিত্র স্থানটি সুরক্ষিত করিবার জন্য স্থানটির উপরে গর্ভাবাস নির্ম্মিত হইয়াছে।

বস্তু তাহা তাঁহাকে দেখিয়াই তিনি বুঝিলেন। সেই হইতে তিনি নরোত্তমকে ডাকিয়া নির্জ্জনে বসাইতেন এবং গৌর প্রসঙ্গ শ্রবণ করাইতেন। প্রভুর লীলা কথা শ্রবণ করিতে করিতে নরোত্তম প্রেমে বিহ্বল হইয়া পড়িতেন, দুইটি নয়ন ভরিয়া ধারা নামিতে থাকিত। প্রভু তখন অদর্শন হইয়াছেন। তাঁহার দর্শন না পাওয়ার বেদনায় নরোত্তম মর্ম্মাহত। এমন সময় কৃষ্ণদাসের মুখে তিনি একদিন প্রভুর দ্বিতীয় প্রকাশ আচার্য্য প্রভুর কথা শুনিলেন এবং তাঁহার সঙ্গ লাভের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। সেইদিন হইতেই তাঁহার মনে সঙ্কল্প জাগিল এইবার গৃহ ত্যাগ করিতে হইবে। ইতোমধ্যে আরও একটি ঘটনা ঘটিল একদিন শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু স্বপ্নে আবির্ভূত হইয়া তাঁহাকে বলিলেন 'রজনী প্রভাত হইলে তুমি পদ্মায় স্নান করিতে যাইবে, প্রভুর শুদ্ধপ্রেম পদ্মার নিকটে সঞ্চিত আছে, স্নান করিলেই তোমার মনস্কামনা পূর্ণ হইবে।' প্রভাতে শয্যা ত্যাগ করিয়াই নরোত্তম পদ্মা অভিমুখে ছুটিলেন, আসিয়া জলে নামিতেই তিনি দেখিলেন, এক গৌরবর্ণ পুরুষ যেন হাসিতে হাসিতে তাঁহার দিকে অগ্রসর হইয়া আসিলেন এবং তাঁহার হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। নরোত্তমের তখন দেহ স্মৃতি লোপ পাইল এবং দেহের স্বাভাবিক শ্যামবর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়া উজ্জ্বল গৌরবর্ণ ধারণ করিল। নরোত্তম তখন টলিতে টলিতে কোনও প্রকারে গৃহে আসিয়া হা গৌর! প্রাণনাথ! বলিতে বলিতে অঙ্গনে আছাড় খাইয়া পড়িলেন অকস্মাৎ নরোত্তমের এইরূপ অবস্থা দেখিয়া সকলে চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। বহুক্ষণ পর তিনি ঈষৎ সংযত হইলে সকলে ব্যাকুলভাবে তাঁহার এইরূপ ক্রন্দনের কারণ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। নরোত্তম তখন সকল ঘটনা ধীরে ধীরে ব্যক্ত করিয়া শেষে বলিলেন 'সে-ই আমাকে কাঁদাইয়াছে, কোথায় যাইলে তাহাকে পাইব? আমাকে তোমরা ছাড়িয়া দাও, সে যেখানেই থাক, আমি খুঁজিয়া বাহির করিব।—বলিতে বলিতে তিনি পুনরায় আবেগ ভ'রে কাঁদিয়া উঠিলেন।

কয়েক দিন এই ভাবেই গত হইল। পুত্রের বৈরাগ্য দর্শনে কৃষ্ণানন্দ অত্যন্ত বিচলিত হইয়া পড়িলেন এবং পাছে পলাইয়া যায় এই ভয়ে ভীত হইয়া তাঁহাকে চোখে চোখে রাখিবার জন্য প্রহরী নিযুক্ত করিয়া দিলেন। তখন নদীপ্রায় অবস্থায় নরোত্তম অতি অস্থিরচিত্তে দিন অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। একদিন বিরহ বেদনায় কাতর হইয়া নরোত্তম শ্রীমন্মহাপ্রভু ও তাঁহার পরিকরগণের নাম উচ্চারণ করিতে করিতে দুই বাহু উর্দ্ধে তুলিয়া করুণ কণ্ঠে বলিতে লাগিলেন 'আমার প্রাণ জ্বলিয়া যাইতেছে, তোমরা আমাকে এই ভীষণ সংসার-দাবানল হইতে উদ্ধার কর!' রাত্রে নিদ্রা নাই, স্নানাহারও এক প্রকার ত্যাগ করিয়া দিয়াছেন, শরীর দিন দিন কৃশ হইয়া যাইতেছে। এই ভাবে আরও কিছুদিন কাটিল। হতাশা ও ক্লান্তিতে একদিন তিনি শয়ন করিয়া আছেন, চোখে যেন একটু তন্দ্রার ভাব আসিল। সেই সময় তিনি দেখিলেন প্রভু আসিয়াছেন। আসিয়া দুই বাহু প্রসারিত করিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন দিলেন। তাহার পর হাস্য-মধুর কণ্ঠে বলিলেন 'নরোত্তম! তোমার ব্যাকুলতায় আমি কাতর হইয়াছি। কোন চিন্তা করিও না। শীঘ্রই তোমার সংসার পাশ ছেদন হইবে। এখান হইতে তুমি একেবারে শ্রীধাম বৃন্দাবনে চলিয়া যাইবে। সেখানে গিয়া তুমি লোকনাথের আশ্রয় গ্রহণ করিও। গৃহত্যাগের সুযোগ অবিলম্বেই আসিতেছে,'—এই কথা বলিতে বলিতে প্রভু অন্তর্হিত হইলেন। সঙ্গে সঙ্গে নরোত্তমও জাগরিত হইলেন এবং স্বপ্নের বিষয় চিন্তা করিতে করিতে তিনি আরও বিচলিত হইয়া প্রবল আবেগে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। তাঁহার অবস্থা দেখিয়া সেই রাত্রেই প্রভু পরিকরগণের সহিত পুনরায় আবির্ভূত হ'ন এবং তাঁহাকে সান্ত্বনা দান করেন।

অবশেষে গৃহত্যাগের সুযোগ একদিন সত্য সত্যই আসিয়া গেল। রাজা কৃষ্ণানন্দ কার্য্যানুরোধে গৌড় দেশে গমন করিলেন। সেই সুযোগে নরোত্তম জননীর নিকট হইতে কোনও প্রকারে বিদায় গ্রহণ

করিয়া এবং কৌশলে প্রহরিগণের হস্ত হইতে নিস্কৃতি লাভ করিয়া কার্ত্তিকী পূর্ণিমা দিবসে গৃহ ত্যাগ করিলেন। আহার নিদ্রাত্যাগ করিয়া নরোত্তম ব্যাকুলভাবে শ্রীধামের উদ্দেশ্যে ছুটিয়া চলিলেন। অবিশ্রান্তভাবে তিনি চলিতে লাগিলেন, দেহের প্রতি দৃষ্টি মাত্র নাই, সর্ব্বাঙ্গ ধূলিময় পদ যুগল প্রস্তর ও কণ্টকাঘাতে ক্ষত বিক্ষত হইয়াছে। কিন্তু নরোত্তমের সেই সুকুমার দেহ এই তীব্র কঠোরতা সহ্য করিতে পারিল না, শীর্ণ দেহ লইয়া হাঁটিতে হাঁটিতে একদিন এক বৃক্ষতলে আসিয়া তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। কিছুক্ষণ পর, অর্দ্ধবাহ্য দশা লাভ করিয়া তিনি দেখিলেন, জনৈক গৌরবর্ণ ব্রাহ্মণ একভাণ্ড দুগ্ধ লইয়া আসিয়া তাঁহার সম্মুখে রাখিলেন এবং সেই দুগ্ধ পান করিবার জন্য পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিয়া তিনি চলিয়া গেলেন। কিন্তু নরোত্তমের পানাহার বিষয়ে কোন চেষ্টাই ছিল না, সেদিকে তিনি ফিরিয়াও চাহিলেন না। দুগ্ধ সেই অবস্থাতেই পড়িয়া রহিল। অল্পক্ষণ পরে তাঁহার সামান্য নিদ্রাকর্ষণ হইল। তখন শ্রীরূপ সনাতন স্বপ্নে আবির্ভূত হইয়া তাঁহাকে বলিলেন 'প্রভু স্বয়ং দুগ্ধ বহিয়া আনিয়া পান করিবার জন্য তোমাকে দিয়া গেলেন, তুমি চাহিয়াও দেখিলে না ? অতি ভাগ্যবান তুমি, এখন উঠ। দুগ্ধ পান করিয়া পুনরায় যাত্রা করিবে। তাঁহারা অন্তর্হিত হইলে নরোত্তম 'হা-রূপ সনাতন' বলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে নিদ্রা ত্যাগ করিয়া উঠিলেন। তাঁহার আর্ত্তিতে বিচলিত হইয়া শ্রীরূপ ও সনাতন প্রভু পুনরায় আবির্ভূত হইয়া তাঁহাকে নানা প্রকারে শান্ত করেন। নরোত্তম তাঁহাদের আদেশে সেই দুগ্ধ পান করিলেন। দুগ্ধ পান করিবা মাত্র তাঁহার দেহের সমস্ত গ্লানি ও দুর্ব্বলতা মুহূর্ত্তে কাটিয়া গেল। নব বলে বলীয়ান হইয়া তিনি পুনরায় উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং দ্রুতগতি চলিতে চলিতে একদিন রাত্রি এক প্রহরের পর বিশ্রাম ঘাটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। একজন মাথুর ব্রাহ্মণ এই সময় তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া সযত্নে আপন গৃহে লইয়া গেলেন এবং যত্নপূর্ব্বক প্রসাদ সেবন করাইয়া সেইখানেই

বিশ্রামের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। নরোত্তম সেই ব্রাহ্মণের মুখে শ্রীরূপ সনাতন রঘুনাথ ভট্ট প্রভু ও কাশীশ্বরের সঙ্গোপন বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়েন এবং তাঁহারই যত্নে সংজ্ঞা প্রাপ্ত হন। সেই রাত্রি কোনও প্রকারে সেইখানেই অতিবাহিত করিয়া নরোত্তম পরদিন প্রভাতে কাঁদিতে কাঁদিতে শ্রীধামে প্রবেশ করিলেন। কথিত আছে—সেইরাত্রে পূর্ব্বোক্ত প্রভুগণ আবির্ভূত হইয়া নরোত্তমকে সান্ত্বনা দান করেন।

শ্রীধামে প্রবেশ করিয়া নরোত্তম অনুসন্ধান করিতে করিতে সর্ব্বাগ্রে লোকনাথ প্রভুর সমীপে আসিয়া তাঁহার চরণ বন্দনা করিলেন। লোকনাথ প্রভু তাঁহাকে উঠাইয়া পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে তিনি দাঁড়াইয়া করজোড়ে আত্মপরিচয় প্রদান করিলেন। এইখানেই আচার্য্য প্রভুর সহিত তাঁহার দেখা হয়। লোকনাথ প্রভুর চরণ দর্শন মানসে আচার্য্য প্রভু প্রায়ই তাঁহার নিকটে আসিতেন। বিশেষতঃ পূর্ব্বরাত্রে যখন শ্রীরূপ আবির্ভূত হইয়া তাঁহাকে বলিলেন 'আগামী কল্যই নরোত্তমের সহিত তোমার মিলন হইবে,' তখন হইতেই তিনি অনুমান করিয়া লইয়াছিলেন যে, অদ্য অবশ্যই লোকনাথ প্রভুর নিকটে নরোত্তমের সহিত সাক্ষাৎ হইবে। আচার্য্য প্রভু আসিয়াই দেখিলেন একটী গৌরবর্ণ নবীন যুবক প্রভুর সম্মুখে বসিয়া আছেন। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ দিয়া যেন বৈরাগ্যের লাবণ্য ঝরিয়া পড়িতেছে। আচার্য্য প্রভু গৃহমধ্যে প্রবেশ করিতেই পরস্পরের দৃষ্টি বিনিময় হইল। পরিচয় করাইয়া দিতে হইল না। দর্শন মাত্রেই উভয়ে উভয়কে চিনিলেন। নরোত্তম উঠিয়া আসিয়া আচার্য্য প্রভুর চরণে পড়িলেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনিও তাঁহাকে তুলিয়া সপ্রেমে হৃদয়ে ধারণ করিলেন। শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর প্রেম মূর্ত্তিমান হইয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রেম-স্বরূপের নিকট ধরা দিবার জন্য সুদূর খেতুরী হইতে ছুটিয়া আসিয়াছেন। তাঁহার সেই আশা আজ পূর্ণ হইল। নরোত্তম আচার্য্য প্রভুর দৃঢ় আলিঙ্গনে আত্ম সমর্পণ করিয়া একেবারে শান্ত হইয়া পড়িলেন। তাঁহার নীরব

অশ্রু আচার্য্য প্রভুর হৃদয় ধৌত করিতে করিতে তাঁহার চরণে গিয়া আশ্রয় লাভ করিল, আর আচার্য্য প্রভুর নয়নবারি নরোত্তমের শিরে আশিস্ রূপে সিঞ্চিত হইয়া মস্তক সিক্ত করিয়া দিতে লাগিল। লোকনাথ প্রভু আনন্দাশ্রু মোচন করিতে করিতে এই মিলন রহস্য উপভোগ করিতে লাগিলেন।

প্রভুর সন্ন্যাস গ্রহণের পূর্ব্বেই লোকনাথ সংসার আশ্রম ত্যাগ করিয়া নবদ্বীপে আগমন করিয়াছিলেন। কিছুদিন সেখানে বাস করিয়া প্রভুর আদেশে তিনি ভূগর্ভ গোস্বামীকে সঙ্গে লইয়া শ্রীধামে চলিয়া আসেন ও কঠোর ভজনে আত্মনিয়োগ করেন। তীব্র বৈরাগ্য এবং ঔদাসীন্য বশতঃ তিনি সম্পূর্ণরূপে নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করিতেন এবং শিষ্য করিবেন না বলিয়া স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন। সেই কারণে নরোত্তম যখন দীক্ষা লাভের ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন তখন তিনি অসম্মতি প্রকাশ করিলেন। নরোত্তম তাহাতে মর্ম্মবেদনায় কাতর হইয়া পড়িলেও সঙ্কল্প ত্যাগ করিলেন না। 'দীক্ষা লাভ করিতে পারি উত্তম, নচেৎ এই অপবিত্র দেহ পরিত্যাগ করিব,'—এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া তিনি কায়মনোবাক্যে লোকনাথ প্রভুর সেবায় আত্ম-নিয়োগ করিলেন। যে সকল সেবা তাঁহার সাক্ষাতে করিতে সাহস পাইতেন না তিনি তাহা গোপনে করিতেন। প্রত্যহ শেষরাত্রে নরোত্তম সকলের অলক্ষ্যে সম্মার্জ্জনী হস্তে লইয়া লোকনাথ প্রভুর শৌচস্থানে চলিয়া আসিতেন এবং সযত্নে তাহা পরিষ্কার করিয়া রাখিতেন। পরে সেই সম্মার্জ্জনী পরম ভক্তিভরে একবার মস্তকে আর একবার হৃদয়ে জড়াইয়া ধরিতেন, আর তাঁহার নয়ন বহিয়া অশ্রুর ধারা নামিত। এইরূপে এক বৎসর কাটিল। উদাসীন লোকনাথ প্রথমে কিছুই বুঝিতে পারেন নাই; কিন্তু শৌচস্থান পরিষ্কার দেখিয়া একদিন তাঁহার মনে সন্দেহ জন্মিল, ফলে সেদিন তিনি গোপনে থাকিয়া লক্ষ্য করিতে লাগিলেন। যথা সময়ে 'শৌচ-সেবা' করিতে আসিয়া নরোত্তম তাঁহার

হাতে ধরা পড়িলেন। তখন তিনি ভীত ও শঙ্কিত হইয়া লোকনাথের চরণে পড়িয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

নরোত্তমের কঠোর বৈরাগ্য, ভজন নিষ্ঠা এবং সেবা কুশলতার গুণে লোকনাথ প্রভু ক্রমেই তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইতে লাগিলেন। তাঁহার সঙ্কল্পের দৃঢ়তাও ধীরে ধীরে শিথিল হইয়া আসিতে লাগিল। অবশেষে তিনি একদিন নরোত্তমকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন— 'তুমি যদি আজীবন ব্রহ্মচর্য্য ব্রত ধারণের সঙ্কল্প করিতে পার তবে তোমার ইচ্ছা পূরণ করা যাইতে পারে। কিন্তু পথ বড় কঠিন। অতএব বিশেষরূপে চিন্তা করিয়া কর্ত্তব্য নির্ণয় করিবে।' তাঁহার আদেশ বাক্য শুনিয়া নরোত্তম তাঁহার চরণ জড়াইয়া পড়িলেন এবং কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন— 'আমার মস্তকে পদাঘাত করিয়া আপনি যাহা আদেশ করিবেন আমি তাহাই করিব'। লোকনাথ প্রভু আর আপনার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতে পারিলেন না ; নরোত্তমের জয় হইল। শ্রাবণের পূর্ণিমা দিবসে শ্রীজীব, আচার্য্য প্রভু এবং অন্যান্য মহাত্মা-গণের কৃপাশীর্ব্বাদ মস্তকে ধারণ করাইয়া, তাঁহাদের সমক্ষে লোকনাথ প্রভু নরোত্তমকে দীক্ষা দিলেন। তাহার পর ভক্তিশাস্ত্র অধ্যয়ন করাইবার জন্য তাঁহাকে শ্রীজীবের হস্তে সমর্পণ করিলেন। অতঃপর নরোত্তম ভজন, অধ্যয়ন, আচার্য্য প্রভুর সঙ্গ এবং গুরুসেবায় আত্মনিয়োগ করিয়া পরমানন্দে দিন অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। কিছুদিনের মধ্যেই নরোত্তম সর্ব্বশাস্ত্রে গভীর ব্যুৎপত্তি লাভ করিলেন। তাঁহার পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হইয়া শ্রীজীব তাঁহাকে 'ঠাকুর মহাশয়' এই উপাধি প্রদান করেন।

শ্রীল অদ্বৈত প্রভুর দ্বিতীয় প্রকাশ শ্যামানন্দ প্রভুও একদিন শ্রীধামে আসিয়া তাঁহাদের সহিত মিলিত হইলেন। তাঁহার পিতা শ্রীকৃষ্ণ মণ্ডল সদ্‌গোপ বংশীয় ছিলেন। তিনি গৌড়দেশ হইতে উড়িষ্যার দণ্ডেশ্বরের অন্তর্গত ধারেন্দা বাহাদুরপুরে আসিয়া বসতি স্থাপন করেন। শ্যামানন্দ দুরিকা দেবীর গর্ভে ১৪৫৬ শকে চৈত্র

অশ্রু আচার্য্য প্রভুর হৃদয় ধৌত করিতে করিতে তাঁহার চরণে গিয়া আশ্রয় লাভ করিল, আর আচার্য্য প্রভুর নয়নবারি নরোত্তমের শিরে আশিস্ রূপে সিঞ্চিত হইয়া মস্তক সিক্ত কারয়া দিতে লাগিল। লোকনাথ প্রভু আনন্দাশ্রু মোচন করিতে করিতে এই মিলন রহস্য উপভোগ করিতে লাগিলেন।

প্রভুর সন্ন্যাস গ্রহণের পূর্ব্বেই লোকনাথ সংসার আশ্রম ত্যাগ করিয়া নবদ্বীপে আগমন করিয়াছিলেন। কিছুদিন সেখানে বাস করিয়া প্রভুর আদেশে তিনি ভূগর্ভ গোস্বামীকে সঙ্গে লইয়া শ্রীধামে চলিয়া আসেন ও কঠোর ভজনে আত্মনিয়োগ করেন। তীব্র বৈরাগ্য এবং ঔদাসীন্য বশতঃ তিনি সম্পূর্ণরূপে নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করিতেন এবং শিষ্য করিবেন না বলিয়া স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন। সেই কারণে নরোত্তম যখন দীক্ষা লাভের ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন তখন তিনি অসম্মতি প্রকাশ করিলেন। নরোত্তম তাহাতে মর্ম্মবেদনায় কাতর হইয়া পড়িলেও সঙ্কল্প ত্যাগ করিলেন না। 'দীক্ষা লাভ করিতে পারি উত্তম, নচেৎ এই অপবিত্র দেহ পরিত্যাগ করিব,'—এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া তিনি কায়মনোবাক্যে লোকনাথ প্রভুর সেবায় আত্ম-নিয়োগ করিলেন। যে সকল সেবা তাঁহার সাক্ষাতে করিতে সাহস পাইতেন না তিনি তাহা গোপনে করিতেন। প্রত্যহ শেষরাত্রে নরোত্তম সকলের অলক্ষ্যে সম্মার্জ্জনী হস্তে লইয়া লোকনাথ প্রভুর শৌচস্থানে চলিয়া আসিতেন এবং সযত্নে তাহা পরিষ্কার করিয়া রাখিতেন। পরে সেই সম্মার্জ্জনী পরম ভক্তিভরে একবার মস্তকে আর একবার হৃদয়ে জড়াইয়া ধরিতেন, আর তাঁহার নয়ন বহিয়া অশ্রুর ধারা নামিত। এইরূপে এক বৎসর কাটিল। উদাসীন লোকনাথ প্রথমে কিছুই বুঝিতে পারেন নাই; কিন্তু শৌচস্থান পরিষ্কার দেখিয়া একদিন তাঁহার মনে সন্দেহ জন্মিল, ফলে সেদিন তিনি গোপনে থাকিয়া লক্ষ্য করিতে লাগিলেন। যথা সময়ে 'শৌচ-সেবা' করিতে আসিয়া নরোত্তম তাঁহার

হাতে ধরা পড়িলেন। তখন তিনি ভীত ও শঙ্কিত হইয়া লোকনাথের চরণে পড়িয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

নরোত্তমের কঠোর বৈরাগ্য, ভজন নিষ্ঠা এবং সেবা কুশলতার গুণে লোকনাথ প্রভু ক্রমেই তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইতে লাগলেন। তাঁহার সঙ্কল্পের দৃঢ়তাও ধীরে ধীরে শিথিল হইয়া আসিতে লাগিল। অবশেষে তিনি একদিন নরোত্তমকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন— 'তুমি যদি আজীবন ব্রহ্মচর্য্য ব্রত ধারণের সঙ্কল্প কারতে পার তবে তোমার ইচ্ছা পূরণ করা যাইতে পারে। কিন্তু পথ বড় কঠিন। অতএব বিশেষরূপে চিন্তা করিয়া কর্ত্তব্য নির্ণয় করিবে।' তাঁহার আদেশ বাক্য শুনিয়া নরোত্তম তাঁহার চরণ জড়াইয়া পড়িলেন এবং কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন— 'আমার মস্তকে পদাঘাত করিয়া আপনি যাহা আদেশ করিবেন আমি তাহাই করিব'। লোকনাথ প্রভু আর আপনার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতে পারিলেন না ; নরোত্তমের জয় হইল। শ্রাবণের পূর্ণিমা দিবসে শ্রীজীব, আচার্য্য প্রভু এবং অন্যান্য মহাত্ম-গণের কৃপাশীর্ব্বাদ মস্তকে ধারণ করাইয়া, তাঁহাদের সমক্ষে লোকনাথ প্রভু নরোত্তমকে দীক্ষা দিলেন। তাহার পর ভক্তিশাস্ত্র অধ্যয়ন করাইবার জন্য তাঁহাকে শ্রীজীবের হস্তে সমর্পণ করিলেন। অতঃপর নরোত্তম ভজন, অধ্যয়ন, আচার্য্য প্রভুর সঙ্গ এবং গুরুসেবায় আত্মনিয়োগ করিয়া পরমানন্দে দিন অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। কিছুদিনের মধ্যেই নরোত্তম সর্ব্বশাস্ত্রে গভীর ব্যুৎপত্তি লাভ করিলেন। তাঁহার পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হইয়া শ্রীজীব তাঁহাকে 'ঠাকুর মহাশয়' এই উপাধি প্রদান করেন।

শ্রীল অদ্বৈত প্রভুর দ্বিতীয় প্রকাশ শ্যামানন্দ প্রভুও একদিন শ্রীধামে আসিয়া তাঁহাদের সহিত মিলিত হইলেন। তাঁহার পিতা শ্রীকৃষ্ণ মণ্ডল সদ্‌গোপ বংশীয় ছিলেন। তিনি গৌড়দেশ হইতে উড়িষ্যার দণ্ডেশ্বরের অন্তর্গত ধারেন্দা বাহাদুরপুরে আসিয়া বসতি স্থাপন করেন। শ্যামানন্দ দুরিকা দেবীর গর্ভে ১৪৫৬ শকে চৈত্র

পূর্ণিমা তিথিতে* এই গ্রামেই জন্মগ্রহণ করেন। অনেকগুলি সন্তানের অকাল মৃত্যুর পর আবির্ভূত হওয়ায় মাতাপিতা তাঁহার নাম করণ করেন দুঃখী। আজন্ম বৈরাগী দুঃখী, বাল্য কাল হইতেই স্থানীয় ভক্তগণের সঙ্গ লাভ করিয়া এবং প্রভুর পাষাণ গলান লীলা কথা শ্রবণ করিয়া প্রেমানন্দে উন্মত্ত হইয়া পড়েন। পরম করুণাময় গৌর সুন্দরকে কি উপায়ে লাভ করা যায় সেই চিন্তা বাল্যকাল হইতেই তাঁহাকে পাইয়া বসিল। সংসার সীমার বাহিরে লইয়া যাইবার জন্য কে যেন তাঁহাকে সবলে টানিতে লাগল। আবার তিনি যখন শুনিলেন শ্রীগুরুকৃপা ব্যতীত গৌর সুন্দরকে প্রাপ্ত হইবার আর দ্বিতীয় কোন পথ নাই, তখন তাঁহার মন শ্রীগুরু লাভের জন্য অধিকতর চঞ্চল হইয়া উঠিল। তাঁহার অবস্থা দেখিয়া আত্মীয় স্বজনগণ অতিশয় চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। অবশেষে তাঁহারা স্থির করিলেন 'অন্য কোনও স্থানে যাইয়াও যদি দুঃখী শান্তি পায় তবে তাহাতেও তাঁহারা বাধা দিবেন না। সংসার ভাল লাগে না, কিন্তু গৃহত্যাগ করিয়াই বা কোথায় যাইবেন এবং কি করিবেন কিছু স্থির করিতে না পারিয়া তিনি যেন ক্রমেই অধিকতর ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। একদিন রাত্রে আপনার অনিশ্চিত ভবিষ্যতের বিষয়ে চিন্তা করিতে করিতে দুঃখী বিমর্ষ ভাবে শয্যায় আসিয়া শয়ন করিলেন। কিছুক্ষণ পর নিদ্রাও আসিল। তখন স্বপ্নে শ্রীমন্মহাপ্রভু আবির্ভূত হইয়া তাঁহাকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন—'অম্বিকা কালনায় গৌরীদাস পণ্ডিতের শিষ্য হৃদয়চৈতন্য তোমাকে দীক্ষা দিবেন। তুমি অবিলম্বে তাঁহার নিকটে গমন কর সেইখানেই তোমার বাসনা পূর্ণ হইবে।' শ্রীকৃষ্ণ মণ্ডল তখন বাহাদুরপুর ত্যাগ করিয়া দণ্ডেশ্বর গ্রামে আসিয়া সপরিবারে বাস করিতেছিলেন। সেই গ্রামেই দুঃখী স্বপ্নে প্রভুর আদেশ লাভ করেন। এই ঘটনার পর হইতে দুঃখীর পক্ষে গৃহবাস অসহ্য হইয়া উঠিল। অবশেষে তিনি একদিন জনক জননীকে শোকসাগরে ভাসাইয়া গৌর নাম উচ্চারণ

* গৌড়ীয় বৈষ্ণব জীবন এবং গৌড়ীয় বৈষ্ণব ইতিহাস হইতে গৃহীত তারিখ।

করিতে করিতে গৃহ পরিত্যাগ করিয়া কালনার উদ্দেশ্যে যাত্রা করিলেন। দ্রুত গতি পথ চলিতে চলিতে দুঃখী একদিন অম্বিকা কালনায় আসিয়া উপনীত হইলেন এবং হৃদয় চৈতন্য প্রভুর নিকটে আসিয়া তাঁহার চরণ আশ্রয় করিলেন। হৃদয় চৈতন্য প্রভু প্রথমে তাঁহাকে দীক্ষা না দিয়া সেবাকার্য্য শিক্ষা দিবার জন্য ঠাকুরের ফুল বাগান পরিচর্য্যায় নিযুক্ত করিলেন। দূর জলাশয় হইতে জল লইয়া আসিয়া দুঃখী ফুল গাছ গুলিতে সিঞ্চন করিতেন। অবিরত জল বহিতে বহিতে তাঁহার মস্তকে ক্ষত হইল। সেই ক্ষতে পোকা হইল, কিন্তু শ্রীগুরু আজ্ঞা পালনকারী দুঃখীর সেদিকে দৃষ্টি নাই। অবশেষে হৃদয় চৈতন্য প্রভু একদিন তাঁহাকে নিকটে ডাকিলেন এবং ক্ষত দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন 'তোমার মস্তকে কি হইয়াছে?' প্রশ্ন শুনিয়া দুঃখী প্রথমে যেন বিপন্ন হইয়া পড়িলেন। পরে লজ্জিত ভাবে তুচ্ছ কথায় একটী কল্পিত উত্তর দিয়া ধীরে ধীরে সরিয়া পড়িলেন। হৃদয় চৈতন্য প্রভু সমস্তই বুঝিলেন এবং তাঁহার গমন পথটীর দিকে সস্নেহে চাহিয়া রহিলেন।

এই ঘটনার কিছুদিন পরে হৃদয় চৈতন্য প্রভু তাঁহাকে দীক্ষা প্রদান করিলেন, নাম হইল কৃষ্ণদাস, সর্ব্বসাধারণের নিকটে দুঃখী কৃষ্ণদাস নামে তিনি সেই হইতে পরিচিত হইলেন। দীক্ষার পর কিছুদিন গত হইলে একদিন হৃদয় চৈতন্য প্রভু তাঁহাকে বলিলেন 'আর তোমার বর্ত্তমানে এখানে থাকিবার প্রয়োজন নাই, তুমি শ্রীধাম বৃন্দাবনে চলিয়া যাও। সেখানে শ্রীজীবের আনুগত্যে থাকিয়া ভক্তিগ্রন্থ অধ্যয়ন এবং যথা নিয়মে ভজনাঙ্গ যাজন করিও। পরে আবার যথা সময়ে আমার সহিত দেখা হইবে।' দুঃখী কৃষ্ণদাস গুরুদেবের আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া একদিন নিঃসঙ্গ অবস্থায় শ্রীগুরুদেবের দুঃসহ বিরহ-বেদনা বুকে লইয়া শ্রীধাম অভিমুখে রওনা হইলেন। কালনা হইতে বহির্গত হইয়া তিনি প্রথমে নবদ্বীপে আসেন। সেখান হইতে শান্তিপুর প্রভৃতি প্রভুর অন্যান্য লীলা-ভূমি সমূহ দর্শন করিয়া অবশেষে

পশ্চিমাভিমুখী হইলেন। অক্লান্ত গতিতে চলিতে চলিতে কৃষ্ণদাস অল্প কালের মধ্যেই ব্রজমণ্ডলে প্রবিষ্ট হইলেন। তিনি প্রথমেই শ্রীরাধা কুণ্ডে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সেখানে রঘুনাথ দাস গোস্বামীর অনুগত, দাস ব্রজবাসী নামক জনৈক ভক্তের সহিত তাঁহার পরিচয় হয়। তাঁহার সহিত আসিয়া দুঃখী কৃষ্ণ-দাস দাস গোস্বামীর সহিত মিলিত হইলেন। তাঁহার আশ্রয়ে কয়েকদিন কাটাইয়া তিনি শ্রীধামে শ্রীজীবের নিকটে চলিয়া আসিলেন। এইখানেই শ্রীনিবাস, নরোত্তম ও শ্যামানন্দ, তিন প্রভুর তিন আবেশাবতারের মিলনে গৌর লীলার দ্বিতীয় অধ্যায় প্রকাশের সূত্র রচিত হইল।

এখানে আসিয়া কৃষ্ণদাস শ্রীজীবের আনুগত্যে ভক্তিশাস্ত্র অধ্যয়নে নিবিষ্ট হইলেন। ইতোমধ্যে হৃদয় চৈতন্য প্রভু পত্রের দ্বারায় তাঁহাকে আদেশ পাঠাইয়াছিলেন 'তুমি শ্রীজীবকে আমার অভিন্ন স্বরূপ জানিয়া তাঁহার চরণে আত্ম সমর্পণ করিবে এবং সর্ব্বদা তাঁহার আদেশ অনুসারে কার্য্য করিবে।' যথা নিয়মে ভজন, অধ্যয়ন এবং আচার্য্য প্রভু ও ঠাকুর মহাশয়ের সাহচর্য্যে কৃষ্ণদাসের দিন পরমানন্দেই কাটিতে লাগিল। এক সময় তাঁহার মনে শ্রীরাধা রাধারমণের নিভৃত নিকুঞ্জ বিহার ভোগ করিবার বাসনা উদিত হইলে, সে কথা তিনি শ্রীজীবকে জানাইলেন এবং সেই হইতে তাঁহার আদেশ অনুসারে তিনি নিধুবনে ঝাড়ু সেবার কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। কৃষ্ণদাস শেষরাত্রে কুঞ্জে আসিয়া ঝাড়ু সেবা করেন, সন্ধ্যারতি সময় শ্রীবিগ্রহের সম্মুখে আসিয়া নৃত্য করেন কখনও বা বিরহ ভ'রে কাঁদয়া আকুল হ'ন। এইরূপে কিছুদিন অতিবাহিত হইবার পর এক সময় শ্রীমতীর কৃপ দৃষ্টি তাঁহার উপর পতিত হইল। একদিন কৃষ্ণদাস শেষরাত্রে ঝাড়ু সেবা করিতে করিতে সম্মুখে একটি নূপুর দেখিতে পাইয়া আগ্রহ ভ'রে তাহা তুলিয়া লইলেন। সেই নূপুরটী স্পর্শ কারয়াই কৃষ্ণদাস ভাবাবেশে অধীর হইয়া পড়িলেন। অশ্রুকম্পাদিতে বিভূষিত হইয়া তিনি সেই নূপুর একবার বুকে, একবার মস্তকে ধরেন; একবার নাসায় ধরিয়া ঘ্রাণ

লইতে থাকেন আর কাঁদিয়া আকুল হ'ন। এদিকে নিত্য লীলায় শ্রীমতী আপন চরণের একখানি নূপুর দেখিতে না পাইয়া যেন অতি-মাত্রায় ব্যস্ত ও চিন্তিত হইয়া অন্বেষনার্থে ললিতাজীকে নিধুবনে পাঠাইয়া দিলেন। ললিতাজী বুঝিলেন লীলাময়ী কোনও লীলা প্রকাশের ইচ্ছায় নিশ্চয়ই সেইখানে নূপুর ফেলিয়া আসিয়াছেন কিন্তু কিছু না বলিয়া তিনি নিধুবনে চলিয়া আসিলেন। প্রভাত হইয়া গিয়াছে সুতরাং তিনি এক বৃদ্ধারমনীর বেশে আসিয়া একেবারে কৃষ্ণদাসের সম্মুখে দাঁড়াইলেন, এবং নূপুরের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন। কিন্তু কৃষ্ণদাস তাঁহাদের রহস্য বুঝিয়াছেন নূপুর না দিয়া তিনি তাঁহার যথার্থ পরিচয় জানিতে ইচ্ছা করিলেন। তখন ললিতাজী নিরূপায় হইয়া আপনার পরিচয় দিলেন এবং শ্রীমতীর কৃপা ইঙ্গিত মনে করিয়া তাঁহাকে নিজ স্বরূপ দেখাইলেন। তাঁহার সেইরূপ দর্শন করিয়া কৃষ্ণদাস প্রেমাবেশে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। তাঁহার চৈতন্য ফিরিয়া আসিলে 'রাধাকৃষ্ণ প্রাপ্তি হউক' এই বাক্যের দ্বারায় ললিতাজী তাঁহাকে মন্ত্র প্রদান করিলেন এবং সেই নূপুর তাঁহার ললাটে স্পর্শ করাইয়া নূতন তিলক রচনা করিয়া দিয়া অন্তর্হিত হইলেন।* কৃষ্ণদাসের কামনা পূর্ণ হইল। বহুক্ষণ পর প্রকৃতিস্থ হইয়া কৃষ্ণদাস শ্রীজীবের নিকটে আসিয়া আনুপূর্ব্বিক সমস্ত ঘটনা বিবৃত করিলে তিনি তাঁহাকে প্রেমভ'রে আলিঙ্গন করিলেন। এই ঘটনার পর হইতেই তাঁহার নাম হইল শ্যামানন্দ।

কৃষ্ণদাস তিলক পরিবর্ত্তন করিয়াছেন, নাম পরিবর্ত্তন করিয়াছেন; এমনকি নিজ ইষ্টমন্ত্রও নাকি পরিবর্ত্তন করিয়াছেন, এই সংবাদ পল্লবিত হইয়া অম্বিকায় পৌঁছিলে হৃদয় চৈতন্য প্রভু পত্রের দ্বারায় আহ্বান করিয়া তাঁহাকে নিকটে আনাইলেন এবং এইরূপ আচরণের প্রকৃত কারণ জানিতে চাহিলেন। শ্যামানন্দ শ্রীগুরুদেব ব্যতীত আর

* শ্রীল শ্যামানন্দ প্রভুর সূচক কীর্ত্তনে—
শ্রীল রামদাস বাবাজী মহারাজের উক্তি অবলম্বনে লিখিত।

কিছুই জানেন না। শ্রীগুরু কৃপাশক্তিতেই যে তিনি এই অপ্রাকৃত সম্পদের অধিকারী হইয়াছেন, ইহাই তাঁহার সুদৃঢ় বিশ্বাস। অতএব গুরুদেবের প্রশ্নের উত্তরে তিনি সরল ভাবেই বলিলেন, 'প্রভু আপনিই কৃপাপূর্ব্বক এই পরিবর্ত্তন করাইয়াছেন।' হৃদয় চৈতন্য প্রভু প্রকৃত তত্ত্ব বুঝিতে পারিয়াও শ্রীগুরু ভক্তির মহিমা জগতে প্রকাশ করিবার জন্যই যেন ক্রোধ প্রকাশ করিয়া সেই তিলক সিক্ত গামছা দিয়া মুছিয়া দিতে লাগিলেন। কিন্তু ঘর্ষণের ফলে সেই তিলক যেন অধিকতর উজ্জ্বল হইয়া দীপ্তি পাইতে লাগিল।

শ্যামানন্দের আগমনের পূর্ব্বেই আচার্য্য প্রভু এবং ঠাকুর মহাশয় শ্রীজীবের আজ্ঞাক্রমে দাক্ষিণাত্যবাসী রাঘব গোস্বামীর সহিত ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা করেন। শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু এবং শ্রীমন্মহাপ্রভু যে সকল স্থান ভ্রমণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের স্মৃতি বুকে লইয়া তাঁহারা রাঘবের সহায়তায় সেই সকল স্থান ভ্রমণ করেন। শ্রীরূপ সনাতনের তীর্থোদ্ধার কাহিনী এবং ব্রজমণ্ডল-মহিমা, তাঁহারা রাঘবের মুখেই শ্রবণ করেন। সুমধুর লীলাভূমি দর্শন এবং পবিত্র রজে সাষ্টাঙ্গ দিতে দিতে পরিক্রমা শেষ করিয়া তাঁহারা ফিরিয়া আসিলে পর শ্যামানন্দ ব্রজে আসিয়া তাঁহাদের সহিত মিলিত হ'ন। তিনজন একত্র হইয়া যখন প্রভুর লীলা প্রসঙ্গে রত হইতেন তখন আর তাঁহাদের বাহ্যজ্ঞান মাত্র থাকিত না। প্রেম জলে ভাসিতে ভাসিতে তাঁহারা পরমানন্দে দিবারাত্র কাটাইয়া দিতেন, সময়ের জ্ঞানও কিছুমাত্র থাকিত না। সময়ে সময়ে তাঁহারা গিরিগুহায় চলিয়া যাইতেন এবং সুতীব্র ভজনে কিছুদিন অতিবাহিত করিয়া আসিতেন। কখনও বা রাধাকুণ্ডে আসিয়া দাস গোস্বামী এবং কবিরাজ গোস্বামীর নিকটে থাকিয়া বিবিধ প্রসঙ্গে কিছুদিন পরমানন্দে কাটাইয়া যাইতেন। গিরি গুহায় ভজন করিবার কালে, গোবর্দ্ধনে, একদিন শ্রীকৃষ্ণ গোপকুমার বেশে আচার্য্য প্রভুকে দর্শন দান করিয়াছিলেন।

বৃন্দাবন হইতে বিদায় গ্রহণ।

আচার্য্য প্রভুর বৃন্দাবনে আগমনের পর দেখিতে দেখিতে সাত বৎসর কাটিয়া গেল। ঠাকুর মহাশয় ও শ্যামানন্দের অধ্যয়নও সমাপ্ত হইয়াছে। একদিন শ্রীজীব আচার্য্য প্রভুকে ডাকিয়া নিকটে বসাইলেন এবং পৃষ্ঠে হস্ত রাখিয়া সস্নেহে বলিলেন। 'ভাই, প্রভুর আদেশ পালনের জন্যই আমাদের দেহ ধারণ করা, নতুবা দেহ ধারণের কোনই সার্থকতা নাই। তাঁহার আদেশ ক্রমে তাঁহারই লীলা-পরিকরগণ গ্রন্থ সমূহ রচনা করিয়া আমার নিকট গচ্ছিত রাখিয়া গিয়াছেন, আমার হাত দিয়াও প্রভু কিছু কিছু রচনা করাইয়াছেন। তাঁহার ইঙ্গিত ক্রমেই আমি তোমাদিগকে যথাসাধ্য অধ্যয়ন করাইলাম। এখন তোমরা সর্ব্বশাস্ত্রে পারদর্শী হইয়াছ। এইবার তোমাদিগকে কর্ত্তব্যের ভার গ্রহণ করিতে হইবে। সুদূর গৌড় দেশ হইতে ভক্তগণ এখানে আসিয়া অধ্যয়ন করিয়া যাইবেন, সে আশা বৃথা। অতএব সেইখানে গিয়াই গ্রন্থ প্রচারের ব্যবস্থা করিতে হইবে। আমার প্রতি শ্রীধাম ত্যাগের আদেশ নাই, অতএব সে দায়িত্ব তোমাকেই লইতে হইবে। শ্রীরূপ ও সনাতন প্রভু এই কার্য্যের ভার তোমার উপরেই ন্যস্ত করিয়া গিয়াছেন। সুতরাং আর কালবিলম্ব না করিয়া 'গ্রন্থ-সহ' তুমি অবিলম্বে গৌড় দেশে চলিয়া যাও। নরোত্তম ও শ্যামানন্দ তোমার কার্য্যের সহায় হইবে।' শ্রীজীব তাঁহার বক্তব্য ধীরে ধীরে শেষ করিয়া আচার্য্য প্রভুর মনোভাব অবগত হইবার জন্য শান্তভাবে তাঁহার মুখের দিকে চাহিলেন। কিন্তু আচার্য্য প্রভু মুখে কিছুই বলিলেন না, এই সুখময় সঙ্গ এবং ব্রজবাস ত্যাগ করিয়া যাইতে হইবে ভাবিয়া তিনি অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িলেন। তাঁহার দুই নয়ন বহিয়া অশ্রুর ধারা নামিতে লাগিল, শ্রীজীব তখন ব্যথিত হইয়া তাঁহার হাত দুইটি ধরিলেন এবং আর্দ্রকণ্ঠে বলিতে লাগিলেন—"ভাই, তাঁহাদের

আজ্ঞা পালন করিবার জন্যই ত আমাদের জন্ম। নিজ সুখের প্রতি দৃষ্টি রাখিলে চলিবে কেন? তুমি কিছুমাত্র চিন্তা করিও না, প্রভু সর্ব্বদাই সগণে তোমার সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া তোমাকে রক্ষা করিবেন জানিও ”

এদিকে রাসযাত্রা আগত প্রায়। শ্রীধামে এই উৎসবটী তখন শ্রীজীবের প্রচেষ্টায় মহা আড়ম্বরের সহিত অনুষ্ঠিত হইত। উৎসবের কয়েকদিন পূর্ব্ব হইতেই ব্রজমণ্ডলের নানাস্থান হইতে বিবিধ দ্রব্য সামগ্রী আসিতে লাগিল। সুদূর গ্রাম অঞ্চল এবং অন্যান্য স্থান হইতে ভজনানন্দী মহাত্মগণ এবং ব্রজবাসী ভক্তগণ শ্রীজীবের আমন্ত্রণে একে একে শুভাগমন করিলেন। পাঠ, নাম সঙ্কীর্ত্তন এবং ভগবৎ প্রসঙ্গে শ্রীধামে আনন্দের তরঙ্গ খেলিতে লাগিল। শ্রীবিগ্রহ সেবা এবং ভোগনিবেদনাদির যাবতীয় ভার আচার্য্য প্রভুর উপর পড়িল। মহা সমারোহের সহিত উৎসব সমাপ্ত হইল, কিন্তু তখনও মহাত্মগণ স্থানত্যাগ করেন নাই। এমন সময় একদিন, গোপাল ভট্ট প্রভু, লোকনাথ প্রভু, দাস গোস্বামী প্রভু, কবিরাজ গোস্বামী প্রভু এবং অন্যান্য মহাত্মগণ একত্র বসিয়া ভগবৎ প্রসঙ্গে নিযুক্ত আছেন। শ্রীজীব তখন তাঁহাদের নিকটে আসিয়া সর্ব্বসমক্ষে করজোড়ে নিবেদন করিলেন—‘শ্রীরূপ সনাতনাদি গোস্বামিগণের দ্বারায় প্রভু যে সমস্ত অমূল্য গ্রন্থরাজি রচনা করাইয়া বৈষ্ণব ধর্ম্মের নিগূঢ় রহস্য প্রকাশিত করিলেন, তাঁহার লীলাভূমি গৌড়দেশে যথোপযুক্তভাবে সেগুলির প্রচার না হইলে কার্য্য অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে। এই গ্রন্থ সমূহ শ্রীনিবাস বিশেষভাবে অনুশীলন করিয়াছে এবং আপনাদের কৃপা প্রেরণায় অধ্যাপনাদিতেও সবিশেষ পারদর্শী হইয়াছে। এখন আমার ইচ্ছা এই যে, শ্রীনিবাস, নরোত্তম ও শ্যামানন্দ সহ এই গ্রন্থরাজি লইয়া গৌড়দেশে গমন করিয়া প্রভুর বিশুদ্ধ প্রেম ধর্ম্ম ঘরে ঘরে প্রচার করুক। ইতঃপূর্ব্বে শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতন প্রভুও এই বিষয়ে ইঙ্গিত করিয়াছিলেন। এখন আপনাদের অনুমতি এবং কৃপাশীর্ব্বাদ পাইলেই

উদ্দেশ্য সফল হইতে পারে। সমাগত ভক্তগণ এবং পণ্ডিত মণ্ডলী শ্রীজীবের এই সঙ্কল্প সর্ব্বান্তঃকরণে অনুমোদন করিলেন।

রাসযাত্রা শেষ হইয়াছে, আচার্য্য প্রভুর গৌড় যাত্রার নির্দ্ধারিত দিনটীও ক্রমে নিকটবর্ত্তী হইয়া আসিল। গ্রন্থ সমূহ একত্র করিয়া একটী কাষ্ঠপেটিকার মধ্যে (সিন্দুক) নিবদ্ধ করা হইল এবং ধূলি ও বৃষ্টি হইতে রক্ষা করিবার জন্য একখানি উৎকৃষ্ট মোম কাপড়ের দ্বারায় পেটিকাখানি সযত্নে আবৃত করিয়া দেওয়া হইল। একখানি উৎকৃষ্ট গো গাড়ী এবং চারিটী বলিষ্ঠ বলদও সংগ্রহ করা হইয়াছে। পথের নিরাপত্তা রক্ষার জন্য দশজন সশস্ত্র প্রহরীরও ব্যবস্থা করা-হইল। মথুরাবাসী জনৈক ভাগ্যবান মহাজনের অর্থানুকল্যে সমস্ত আয়োজন সম্পূর্ণ হইল।

ইতোমধ্যে একদিন আচার্য্য প্রভুকে লইয়া শ্রীজীব শ্রীগোবিন্দজীর সম্মুখে আসিলেন এবং শ্রীবিগ্রহের প্রতি লক্ষ্য করিয়া সপ্রেমে বলিতে লাগিলেন—'তোমার রূপ সনাতনের গ্রন্থ প্রচারের জন্য শ্রীনিবাস গৌড় দেশে যাত্রা করিতেছে, তাহার প্রতি সর্ব্ব বিষয়ে কৃপাশক্তি সঞ্চার পূর্ব্বক তাহার আকাঙ্ক্ষা এবং আমাদের মনোবাসনা পূর্ণ কর।' শ্রীজীবের প্রার্থনা শেষ হইতে না হইতেই শ্রীগোবিন্দজীর কণ্ঠ হইতে পুষ্প মালিকা খুলিয়া পড়িল। শ্রীজীব তখন পুলকিত চিত্তে এবং অশ্রুসিক্ত নয়নে সেই আজ্ঞামালা লইয়া আসিয়া আচার্য্য প্রভুর কণ্ঠে পরাইয়া দিলেন। আচার্য্য প্রভু অতঃপর একদিন রাধাকুণ্ডবাসী মহাত্মগণের শ্রীচরণ হইতে বিদায় আশীর্ব্বাদ গ্রহণের উদ্দেশ্যে রাধাকুণ্ডে আসিলেন এবং সর্ব্বাগ্রে দাস গোস্বামীর নিকটে আসিয়া তাঁহার চরণ বন্দনা করিয়া বিদায় ভিক্ষা চাহিলেন। তখন দাস গোস্বামী প্রভু বিরহ সন্তপ্ত হৃদয়ে তাঁহাকে উঠাইয়া সস্নেহে আলিঙ্গন পূর্ব্বক অশ্রুসিক্ত কণ্ঠে বলিতে লাগিলেন—'তুমি নিঃসঙ্কোচে যাত্রা কর এবং প্রভুর আদেশ পালন ক রয়া জীবন সফল কর'—এই কথা বলিতে বলিতে তিনি অশ্রুত্যাগ করিতে লাগিলেন। অতঃপর

গোস্বামী প্রভু, প্রভু দত্ত সেই শ্রীগোবর্দ্ধন শিলা এবং গুঞ্জামালা লইয়া আসিয়া আচার্য্য প্রভুর শিরে স্পর্শ করাইয়া শক্তি সঞ্চার পূর্ব্বক বিদায় দিলেন। তিনি অতঃপর বিরহে ব্যাকুল হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে কবিরাজ গোস্বামী এবং অন্যান্য মহাত্মগণের নিকটে বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক বৃন্দাবনে ফিরিয়া আসিলেন।

যাত্রার পূর্ব্ব দিবসে শ্রীগুরুদেবের চরণে বিদায় লইতে আসিয়া আচার্য্য প্রভু আর ধৈর্য্য ধারণ করিতে পারিলেন না। কাতর স্বরে কাঁদিতে কাঁদিতে তিনি ভট্ট প্রভুর চরণ সমীপে লুটাইয়া পড়িলেন। ভট্ট প্রভু কাঁদিতে কাঁদিতে স্বীয় চরণ হইতে তাঁহার মস্তকটী ধীরে ধীরে উঠাইয়া আপন হৃদয়ে চাপিয়া ধরিলেন। শিষ্যের নয়ন ধারায় তাঁহার বক্ষ বিধৌত হইতে লাগিল। শ্রীজীবও আচার্য্য প্রভুর সহিত আসিয়াছিলেন। ভট্ট প্রভুকে উদ্দেশ্য করিয়া তিনি অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বলিলেন—'আপনি উহার শিরে চরণ অর্পণ করিয়া কৃপা শক্তি সঞ্চার করুন—যেন নির্ব্বিঘ্নে গৌড়দেশে যাইয়া অকাতরে শ্রীগ্রন্থ এবং প্রেমভক্তি প্রচার করিয়া ত্রিতাপদগ্ধ জীবের হৃদয়ের তমোরাশি বিদূরিত করিয়া তাহার জীবনের ব্রত উদ্‌যাপন পূর্ব্বক ধন্য হইতে পারে'। ভাবাবেগ বশতঃ ভট্ট প্রভু প্রথমে কোন উত্তর দিতে পারিলেন না, পরে ঈষৎ সংযত হইয়া মুক্ত কণ্ঠে আচার্য্য প্রভুর উদ্দেশ্যে বলিতে লাগিলেন—'আমি সর্ব্বান্তঃকরণে প্রার্থনা করিতেছি, তোমার সঙ্কল্প সিদ্ধ হউক। শ্রীরাধারমণ প্রসন্ন হইয়া সেই শক্তি তোমাকে প্রদান করুন'। এই কথা বলিতে বলিতে তিনি মানসে শিষ্যকে শ্রীরাধারমণের চরণে সমর্পণ করিয়া দিয়া পুনরায় বলিলেন—'বাবা শ্রীনিবাস, আমি বৃদ্ধ হইয়াছি, তুমি সুযোগমত আর একবার আসিয়া আমাকে দেখা দিয়া যাইও। আর একবার আমি তোমাকে নয়ন ভরিয়া দেখিয়া লইব'—বলিতে বলিতে ভট্ট প্রভু অধীর হইয়া পড়িলেন। শ্রীগুরুদেবের ব্যাকুলতায় শিষ্যের ধৈর্য্যের বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেল। আচার্য্য প্রভু শিরে করাঘাত করিতে করিতে কাতর কণ্ঠে

কাঁদিয়া উঠিলেন। শ্রীজীব নীরবে অশ্রু ত্যাগ করিতে করিতে তাঁহাদিগকে শান্ত করিবার চেষ্টা করিলেন। কিছুক্ষণ পর ঈষৎ শান্ত হইয়া ভট্ট প্রভু আচার্য্য প্রভুকে বলিলেন—'শাস্ত্রের অভিপ্রায় অনুসারে ভক্তিধর্ম্ম প্রচার করিবে। নিজের ভজন এবং আচরণের প্রতিও সর্ব্বদা সবিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া চলিবে।' ভট্ট প্রভু এইরূপে তাঁহাকে বহুবিধ উপদেশাদি প্রদান করিলেন। পরে উঠিয়া গিয়া প্রভু-দত্ত কৌপীন ও বহির্ব্বাস লইয়া আসিলেন এবং তাঁহার মস্তকে বাঁধিয়া দিলেন। ভট্ট প্রভু এই সময় শ্রীবংশীবদন-শিলা তাঁহাকে প্রদান করেন। আচার্য্য প্রভু তাঁহাকে আপন কণ্ঠে বাঁধিয়া লইলেন। বনবিষ্ণুপুরের নিকটবর্ত্তী গ্রাম সমূহে আচার্য্য প্রভুর সন্তানগণ কর্ত্তৃক শ্রীরাধা রাধারমনের সহিত শ্রীবংশী-বদন এখনও যথা নিয়মে সেবিত হইতেছেন। অতঃপর আচার্য্য প্রভু শ্রীলোকনাথ প্রভুর নিকটে আসিলেন। এই সময় তিনি ঠাকুর মহাশয়কে বহুবিধ উপদেশ প্রদান করেন এবং তাঁহাকে আচার্য্য প্রভুর করে সমর্পণ করেন। তাঁহার নিকট হইতে বিদায় লইয়া আচার্য্য প্রভু অন্যান্য মহাত্মগণের চরণে বিদায় গ্রহণ করিয়া আসিলেন। উক্ত দিবসে এক নিভৃত কুঞ্জে দ্বিজ হরিদাসাচার্য্যের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। তিনি আচার্য্য প্রভুকে বলেন "তুমি গৌড়দেশে গিয়া আমার পুত্র শ্রীদাস এবং গোকুলানন্দকে দীক্ষা দান করিয়া যথাবিধি ভক্তি শাস্ত্র অধ্যয়ন করাইবে'। আচার্য্য প্রভু তাহাতে সম্মতি প্রদান করেন।

সে দিবস রাত্রে আচার্য্য প্রভু শ্রীগোবিন্দজীর মন্দিরে আসিয়া শয়ন করিলেন। আসন্ন বিয়োগ বেদনায় অশ্রুত্যাগ করিতে করিতে এক প্রকার বিনিদ্র ভাবে প্রায় সমস্ত রাত্রি অতিবাহিত করিয়া শেষ রাত্রে ঈষৎ নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন। তখন শ্রীগোবিন্দজী স্বপ্নে অতি অপূর্ব্ব মূর্ত্তিতে আসিয়া তাঁহাকে দর্শন দিলেন এবং মৃদু হাস্যে আশ্বাস প্রদান পূর্ব্বক কহিলেন "শ্রীনিবাস, তুমি ব্যাকুল হইও না, তোমার বিরহ বেদনায় আমিও কাতর হইয়াছি। শ্রীরূপ সনাতনাদির

দ্বারায় যে সমস্ত গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছি, আমি তোমার দ্বারায় তাহা প্রচার করিব। যে সকল ত্রিতাপ দগ্ধ জীব তোমার শরণাপন্ন হইবে, তুমি অবিচারে তাহাদিগকে অঙ্গীকার করিবে। শ্রীগোবিন্দজী তাঁহার প্রতি সস্নেহে দৃষ্টিপাত করিয়া পুনরায় বলিলেন 'অতি দুরাচার হইলেও যে ব্যক্তি আসিয়া তোমার আনুগত্য স্বীকার করিবে, আমি প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি যে, তাহাদিগকে আমি নির্ব্বিচারে অঙ্গীকার করিব' এই কথা বলিতে বলিতে শ্রীগোবিন্দজী স্থির হইয়া দাঁড়াইলেন এবং মৃদু মৃদু হাস্য করিতে লাগিলেন। আচার্য্য প্রভু আনন্দে এবং বিস্ময়ে জড়বৎ হইয়া তাঁহার দিকে শুধু তাকাইয়া রহিলেন। তখন আবার তিনি দেখিতেছেন—শ্রীগোবিন্দজী যেন ধীরে ধীরে 'গৌর-রূপ' পরিগ্রহ করিলেন। নব জলধর কান্তি তখন তপ্ত কাঞ্চন কান্তিতে রূপান্বিত হইল। প্রভু ধীর গতিতে অগ্রসর হইয়া আসিলেন এবং গাঢ়ভাবে তাঁহাকে আলিঙ্গনে আবদ্ধ করিলেন। ক্ষণকাল পরে তিনি পূর্ব্বমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া পুনরায় নিজ মন্দিরাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইলেন। আচার্য্য প্রভুর নিদ্রা ছুটিয়া গেল। শ্রীগোবিন্দের করুণার কথা স্মরণ করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে তিনি অবশিষ্ট রাত্রি অতিবাহিত করিলেন।

পরদিন প্রভাতে গ্রন্থ সম্পুট সুসজ্জিত শকটে উত্তোলন করা হইল, সশস্ত্র প্রহরিগণ আসিয়া প্রস্তুত হইয়া দাঁড়াইল।* সমাগত বৈষ্ণবগণ, যাঁহারা আচার্য্য প্রভুকে বিদায় দিবার জন্য বিভিন্ন স্থান হইতে আসিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলে শ্রীগোবিন্দ মন্দিরে আসিয়া

---

* আচার্য্য প্রভুর সহিত যে সমস্ত গ্রন্থ প্রেরিত হ'ন, তাহার মধ্যে ভক্তি রসামৃত সিন্ধু, উজ্জ্বল নীলমণি, ললিত মাধব, বিদগ্ধ মাধব, মথুরা মাহাত্ম্য হংসদূত, দানকেলী কৌমুদী, উদ্ধব সন্দেশ, বৃহৎ ভাগবতামৃতম্, লঘু ভাগবতামৃতম্ বৈষ্ণবতোষিণী, তাহা ব্যতীত ভট্ট গোস্বামীর হরিভক্তি বিলাস, দাস গোস্বামীর গ্রন্থ সমূহ, কবিরাজ গোস্বামীর গোবিন্দ লীলামৃত, শ্রীজীবের ষট্ সন্দর্ভের কিয়দংশ, এই গুলিই প্রধান। শ্রীশ্রীচৈতন্য চরিতামৃত এই সময় আসিয়াছিলেন কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ আছে।

সমবেত হইলেন। শ্রীজীব আসিয়া সকলের সম্মুখে সম্পুটে চাবি বন্ধ করিলেন এবং বহু অনুরোধে আচার্য্য প্রভুকে সম্মত করিয়া শ্রীজীব মহাজনগণের নিকট হইতে কিছু অর্থ সংগ্রহ করিয়া পাথেয় স্বরূপ তাঁহার করে অর্পণ করিলেন। শ্রীজীব অতঃপর সজল নয়নে ঠাকুর মহাশয় ও শ্যামানন্দের হাতে ধরিয়া আচার্য্য প্রভুকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন, 'আজ হইতে ইহাদিগকে তোমার করে সমর্পণ করিলাম, এখন হইতে তুমি সর্ব্ব বিষয়ে ইহাদের প্রতি দৃষ্টি রাখিবে।' শ্রীজীব তাহার পর সকলকে লইয়া শ্রীগোবিন্দজীর নিকটে আসিয়া তাঁহাদিগকে শ্রীবিগ্রহের সম্মুখে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করাইলেন। তাঁহাদের গলায় প্রসাদীমাল্য পরাইয়া দেওয়া হইল। পরে 'শ্রীরাসস্থলীর রজ' এবং অন্যান্য রজ ও চরণ তুলসী সমস্ত একত্র করিয়া আচার্য্য প্রভুকে দিলেন। তিনিও তাহা মস্তকে স্পর্শ করাইয়া সযত্নে বস্ত্রমধ্যে বাঁধিয়া লইলেন। শুভযাত্রা আরম্ভ হইল, সমবেত ভক্তগণ বিপুল কলরবে মুহুর্মুহুঃ হরিধ্বনি করিতে লাগিলেন।

সর্ব্বাগ্রে গ্রন্থ সম্পুট চলিয়াছেন, তৎপশ্চাতে আচার্য্য প্রভু, শ্যামানন্দ এবং ঠাকুর মহাশয় নয়ন জলে স্নান করিতে করিতে মৃদু গতিতে অগ্রসর হইতেছেন, আর এক এক বার ফিরিয়া ফিরিয়া শেষ দেখা দেখিয়া লইতেছেন। অন্যান্য সকলে সেইখান হইতেই কাঁদিতে কাঁদিতে ফিরিয়া গেলেন। শ্রীজীব, দাস গোস্বামী এবং কবিরাজ গোস্বামী প্রেমের টানে পড়িয়া তাঁহাদের সঙ্গে সঙ্গে মথুরা পর্য্যন্ত চলিয়া আসিলেন। পথে প্রয়োজন হইতে পারে মনে করিয়া শ্রীজীব এইখানে রাজ সরকার হইতে একখানি অনুমতি পত্র সংগ্রহ করিয়া আচার্য্য প্রভুর হস্তে দিলেন। সেদিন সকলে মথুরাতে একত্র অবস্থান করিলেন। ভগবৎ প্রসঙ্গের মধ্য দিয়া সে রাত্রি তাঁহাদের বিনিদ্র ভাবেই অতিবাহিত হইয়া গেল। পরদিন প্রভাতে শ্রীজীব বিদায় দিতে যাইয়া, আচার্য্য প্রভু, শ্যামানন্দ ও ঠাকুর মহাশয়কে আলিঙ্গন করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। পরে আচার্য্য প্রভুকে লক্ষ্য করিয়া

তিনি সিক্ত কণ্ঠে বলিলেন—"প্রভুর কৃপায় মহাশক্তিমান শ্রীরূপ সনাতনাদি যে সকল অমূল্য গ্রন্থ রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা সমস্তই আজ তোমার করে সমর্পণ করিলাম। তোমরা প্রাণপণ করিয়া ভক্তি সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠায় আত্ম-নিয়োগ পূর্ব্বক প্রভুর আদেশ পালন করিবে। প্রভুর কৃপায় তোমাদের যাত্রা নিরাপদ হউক, ইহাই প্রার্থনা করি। এই দীর্ঘদিন যাবৎ তোমাদের মধুময় সঙ্গ লাভ করিয়া যে আনন্দ পাইয়াছি, সেই সুখ-স্মৃতিটুকু সারা জীবনের জন্য সঞ্চিত হইয়া রহিল। যাও, সেখানে গিয়া প্রাণ ভরিয়া প্রভুর আজ্ঞা পালন কর।" শ্রীজীব অতঃপর শ্যামানন্দের হস্ত ধারণ করিয়া বলিলেন—'স্বদেশে গিয়া তুমিও ভগবৎ সেবা, বৈষ্ণব সেবা এবং প্রেমধর্ম্ম প্রচারে রত হইবে, প্রভুর কৃপায় সর্ব্ব বিষয়ে মঙ্গল হইবে, কিছুমাত্র চিন্তা করিও না।' ঠাকুর মহাশয়কে লক্ষ্য করিয়া তিনি বলিলেন—'শ্যামানন্দকে আমি তোমার করে সমর্পণ করিলাম। তুমি ইহার প্রতি সবিশেষ দৃষ্টি রাখিবে। গৌড়ে উপনীত হইয়া উপযুক্ত সঙ্গী এবং যথোপযুক্ত পাথেয় দিয়া তুমি ইহাকে উড়িষ্যায় প্রেরণ করিবে।' কথায় কথায় যাত্রারম্ভে বিলম্ব হইতেছে দেখিয়া শ্রীজীব সংক্ষেপে আরও কয়েকটি প্রয়োজনীয় কথা বলিয়া অবশেষে নীরব হইলেন। আচার্য্য প্রভু, শ্যামানন্দ ও ঠাকুর মহাশয় তাঁহাদের চরণে লুণ্ঠিত হইয়া প্রণাম করিলেন। অতঃপর সেই সুখময় সঙ্গ, সুমধুর ব্রজভূমি এবং সপ্তবর্ষের সুখ-স্মৃতি বিজড়িত পরিবেশ ত্যাগ করিয়া তাঁহারা কাঁদিতে কাঁদিতে বিদায় গ্রহণ করিলেন। পূর্ব্বদিন অগ্রহায়ণের শুক্লা পঞ্চমী দিবসে তাঁহারা বৃন্দাবন ছাড়িয়া আসিয়াছেন। আজ ষষ্ঠীর দিন প্রভাতে মথুরা ত্যাগ করিয়া চলিলেন। তাঁহারা কিছু দূর অগ্রসর হইতেছেন আর ফিরিয়া ফিরিয়া দেখিতেছেন, অবিশ্রান্ত নয়ন ধারায় দৃষ্টি বার বার রুদ্ধ হইয়া যাইতেছে, তাঁহারা আরও কিছু দূর অগ্রসর হইয়া নয়ন মুছিতে মুছিতে আর একবার ফিরিয়া দাঁড়াইলেন। দেখিলেন শ্রীজীব, কবিরাজ এবং দাস গোস্বামী প্রভু তখনও তাঁহাদের গমন পথের দিকে

চাহিয়া পূর্ব্ববৎ স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া আছেন এবং পুনঃ পুনঃ বহির্ব্বাসের দ্বারায় নয়ন মুছিতেছেন। সর্ব্বত্যাগী এবং বৃক্ষতলবাসী এই বৈরাগীদের হৃদয় গুলিকে প্রণয় শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়া এ কোন মায়া তাঁহাদিগকে কাঁদাইতেছে তাহা কে নির্ণয় করিয়া দিবে ?

গ্রন্থ-চুরি।

দুইজন চালক শকট পরিচালনা করিতেছে এবং পদাতিক দশজন গাড়ীটীকে বেষ্টন করিয়া সতর্কতার সহিত অগ্রসর হইতেছে। ইঁহারা তিনজন ভগবৎ প্রসঙ্গে মত্ত হইয়া তাহাদের পশ্চাতে থাকিয়া অগ্রসর হইতেছেন। মধ্যে মধ্যে প্রয়োজন হইলে রাজার অনুমতি পত্র বাহির করিয়া দেখাইতেছেন। এইরূপে নির্ব্বিঘ্নে চলিতে চলিতে তাঁহারা আগ্রা এবং এটোয়া অতিক্রম করিলেন। এই স্থানে আসিয়া তাঁহারা পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন যে, শ্রীমন্মহাপ্রভু যে পথ ধরিয়া গিয়াছিলেন তাঁহারও সেই পথে যাইবেন। এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া তাঁহারা অতঃপর প্রধান রাজপথ পরিত্যাগ করিয়া ঝারিখণ্ডের বনপথ ধরিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন এবং ধীরে ধীরে অতি রমনীয় পার্ব্বত্য ভূমির মধ্যে দিয়া চলিতে লাগিলেন। পথিমধ্যে নীলাচল গামী কয়েক জন যাত্রী আসিয়া তাঁহাদের সহিত মিলিত হইলেন। সেই বনভূমির অপরূপ শোভা দর্শনে সকলে আত্মহারা হইলেন। স্থানে স্থানে স্বচ্ছনির্ম্মল ঝর্ণা সকল দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিল। সুউচ্চ পর্ব্বত শিখর হইতে নামিয়া আসিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে। কোথাও পথ পার্শ্বে ময়ুর ময়ুরীগণ নিঃশঙ্ক হৃদয়ে দল বাঁধিয়া নৃত্য করিতেছে, আবার কোথাও বা মৃগদম্পতি সকল তাহাদের শিশু সন্তানদিগকে লইয়া দূরে দাঁড়াইয়া আছে এবং তাঁহাদিগকে সভয়ে নিরীক্ষণ করিতে করিতে ছুটিয়া পলাইতেছে। কোকিলের কুহু রব, ময়ুরের কেকা ধ্বনি এবং বিভিন্ন পশু পক্ষীর বিচিত্র শব্দে দশদিক মুখরিত, শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং সনাতনের

গমনকালে কোন্ কোন্ স্থানে তাঁহারা কি কি করিয়াছিলেন, স্থানীয় লোকের মুখে সেই সমস্ত কথা শুনিতে শুনিতে তাঁহারা পরমানন্দে অগ্রসর হইয়া চলিলেন। স্থানে স্থানে অতি নিবিড় জঙ্গল সেখানে লোকালয়ের চিহ্নমাত্রও নাই, আহার্য্য দ্রব্যও সেখানে সুলভ নহে, কিন্তু উপযুক্ত দ্রব্যাদি শ্রীজীব গাড়ীতে তুলিয়া দিয়াছিলেন বালয়া তাঁহাদের কোনই অসুবিধা নাই। এই দুর্গম বনপথ তাঁহারা ধীরে ধীরে অতিক্রম করিয়া অবশেষে গৌড় রাজ্যের সীমার মধ্যে প্রবেশ করিলেন। পঞ্চকোট বামে রাখিয়া তাঁহারা রঘুনাথপুর অতিক্রম করিলেন এবং বনবিষ্ণুপুরের রাজা বীরহাম্বীরের রাজ্যে আসিয়া পড়িলেন। নিরাপদে গৌড় ভূমিতে প্রবেশ করিয়া তাঁহারা নিশ্চিন্তমনে পরমানন্দে ভগবৎ প্রসঙ্গে মত্ত হইয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন। এইরূপে অল্পকালের মধ্যেই তাঁহারা একদিন মালিয়াড়া গ্রামের নিকটবর্ত্তী এক জঙ্গলের পার্শ্বে গোপালপুর নামক স্থানে আসয়া রাত্রিবাস কল্পে জনৈক ভৌমিকের বাড়ীতে অসিয়া আশ্রয় লইলেন। ভৌমিক তাঁহাদিগকে পাইয়া পরম সমাদরে অতিথি সৎকার করিলেন। আহারাদির পর পথ শ্রমের ক্লান্তি বশতঃ অনেকেই নিদ্রিত হইয়া পড়িয়াছেন। দুই একজন মাত্র প্রহরী জাগ্রত থাকিয়া সম্পুট রক্ষা করিতে লাগিল। রাত্রি দ্বিপ্রহরের পর ঠাকুর মহাশয় ও শ্যামানন্দের সহিত আচার্য্য প্রভুও নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন। কিছুক্ষণ পর অদূরে জঙ্গলের ভিতর হইতে উত্থিত এক প্রচণ্ড কোলাহল শ্রবণ করিয়া সকলে ভীত ও সতর্কভাবে উঠিয়া বসিলেন। সেই কোলাহল ক্রমে অগ্রসর হইয়া আসিতে আসিতে প্রবল আকার ধারণ করিল। প্রহরী সকলে অনিষ্ট আশঙ্কায় সশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। মুহূর্ত্তকাল মধ্যেই সকলে সভয়ে দেখিলেন এক বিরাট জনতা বিভিন্ন অস্ত্র শস্ত্রে সজ্জিত হইয়া জ্বলন্ত মশাল হস্তে তাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া ছুটিয়া আসিতেছে। প্রথমে সকলে মনে করিলেন যে ইহারা সম্ভবতঃ লুণ্ঠন কারীর দল হইবে, অন্য কোনও স্থানে লুণ্ঠনার্থে চলিয়াছে' কিন্তু তাঁহাদের সেই ভ্রম

অবিলম্বেই তিরোহিত হইল। দস্যুগণ বিকট কোলাহল করিতে করিতে ছুটিয়া আসিয়া প্রহরীদের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল। অন্ধকারে বিশেষ কিছু দেখা যায় না। আচার্য্য প্রভু, ঠাকুর মহাশয় ও শ্যামানন্দের সহিত নিরুপায় হইয়া এক বৃক্ষতলে বিমূঢ় ভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। সম্মুখে কিছুক্ষণ খণ্ডযুদ্ধ চালল, পরে শব্দ শুনিয়া তাঁহারা বুঝিলেন যে, সেই জনতা সোল্লাসে কোলাহল করিতে করিতে পুনরায় জঙ্গলের পথে অগ্রসর হইতেছে। ক্রমে তাহারা জঙ্গলে প্রবেশ করিল সমস্ত কোলাহল এবং চাঞ্চল্যও নিস্তব্ধ হইল। তিনজনে দ্রুত গতিতে ঘটনা স্থলে আসিয়া দেখিলেন—গ্রন্থ সম্পুট সহ গোশকট খানি অপহৃত হইয়াছে। প্রহরিগণ নিরস্ত্র অবস্থায় দাঁড়াইয়া আছে। এতগুলি দস্যুকে প্রতিহত করা অসম্ভব বুঝিয়া তাহারা বিশেষভাবে প্রতি আক্রমণের চেষ্টা করে নাই। বোধ হয় সেই কারণেই সেই নির্ম্মম দস্যুগণ তাহাদের অঙ্গে কোনও প্রকার আঘাত করে নাই। মুহূর্ত্তের মধ্যে চরম দুর্ঘটনা ঘটিয়া গেল। আচার্য্য প্রভু যেন বিমূঢ় হইয়া পড়িলেন। তাঁহার সকল আশা আকাঙ্ক্ষা যেন শূন্যে মিলাইয়া গেল। গোস্বামিগণের কথা স্মরণে আসিতেই তিনি হাহাকার করিয়া ভূমিতে লুটাইয়া পড়িলেন।

আমরা যে সময়ের ইতিহাস আলোচনা করিতেছি সে সময় ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এক প্রকার মাৎস্যন্যায় চলিতেছিল। রাজ-শাসনের প্রভাব রাজধানীর বহির্দ্দেশে এক প্রকার ছিল না বলিলেই হয়। ব্যক্তিগত স্বার্থ সিদ্ধির প্রতি দৃষ্টি থাকায় প্রায় অধিকাংশ রাজা অথবা রাজ প্রতিনিধির মনে প্রজা এবং বিদেশীয়গণের প্রতি সহানুভূতি সূচকভাব কিছুমাত্র ছিল না। ফলে সমগ্র দেশ দস্যুতস্করে এক প্রকার পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। তাহাদিগকে দমন করা দূরের কথা, অধিকাংশ রাজা এবং জমিদার প্রচুর অর্থ ব্যয় করিয়া তাহাদিগকে পালন করিতেন। রাজ অর্থে প্রতিপালিত হইয়া তাহারা বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালাইত এবং লুণ্ঠন পূর্ব্বক যাহা পাইত, রাজ

সমীপে আনিয়া উপস্থিত করিত বনবিষ্ণুপুরের রাজা বীরহাম্বীরেরও এইরূপ দস্যু পোষণের কুখ্যাতি দেশ প্রসিদ্ধ ছিল। তাঁহার অধীনেও এইরূপ বহু তস্কর প্রতি পালিত হইত। তাহারা গোপনে দেশের সর্ব্বত্র দল বাঁধিয়া ঘুরিয়া বেড়াইত। দেশীয় অথবা বিদেশীয় ধনবান গৃহস্থ অথবা পথিক পাইলেই তাহাদের যথা সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া রাজ সমীপে আনিয়া দিত। প্রয়োজন হইলে নরহত্যাতেও তাহাদের কিছুমাত্র সঙ্কোচ ছিল না। এই দস্যু সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেকে আবার জ্যোতির্ব্বিদ্যায় সবিশেষ পারদর্শী ছিল। তাহারা গুপ্ত বিদ্যার সাহায্যে গৃহস্থ ও পথিকগণের গুপ্ত ধন রত্নাদির সন্ধান অবগত হইত। এই দস্যু সম্প্রদায় 'মানঘুরে' এবং 'ফাঁসিয়ারা' নামে অভিহিত হইত।

অস্ত্রধারি সৈন্য পরিবেষ্টিত হইয়া আচার্য্য প্রভু যখন পেটিকা লইয়া আসিতে ছিলেন তখন তাঁহারা জানিতে না পারিলেও দস্যুগণ বহুদূর হইতেই তাঁহাদিগকে অনুসরণ করিতেছিল। তাঁহাদিগকে এইরূপ সতর্কভাবে পেটিকা রক্ষা করিতে দেখিয়া তাহাদের মনে এই ধারণাই দৃঢ় হইয়া গিয়াছিল যে, ঐ পেটিকার মধ্যে অবশ্যই বহুমূল্য ধন সম্পদ আছে। জ্যোতিষেরাও গণনা করিয়া সেই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়। 'গাড়ীতে মূল্যবান সম্পদ রহিয়াছে' গণনার দ্বারায় এই তথ্যই প্রকাশিত হইল, কিন্তু তাহা কি জাতীয় সম্পদ গণনায় তাহা নির্দ্ধারিত হইল না। কিন্তু তাহাতে তাহাদের কোন অসুবিধা হইল না। গাড়ী লুঠ করিবার সঙ্কল্পে স্থির হইয়া সুযোগের আশায় অনুসরণ করিতে করিতে গোপালপুর পর্য্যন্ত আসিয়া কার্য্য সিদ্ধ করিল।

গোস্বামিগণের সারা জীবনের সাধনার ধনগুলি আজ তস্করের হাতে পড়িয়া লাঞ্ছিত হইতেছে, এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া আচার্য্য প্রভু মর্ম্ম বেদনায় কাতর হইয়া ভূমিতে লুটাইয়া কাঁদিতে লাগিল। মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন—'পূজ্যপাদ শ্রীজীব বিশ্বাস সহকারে তাঁহাদের সঞ্চিত ধন আমার করে সমর্পণ কারয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছেন, আর আমি সেই বস্তু রক্ষা করিতে পারিলাম না।' কি উপায় হইবে, কি

করিবেন কিছু স্থির করিতে না পারিয়া আচার্য্য প্রভু যেন উন্মাদের ন্যায় হইয়া পড়িলেন। রাত্রি গত হইলে পর সকলে মিলিয়া অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু সন্ধান করিবার মত কোন সূত্রই তাহারা রাখিয়া যায় নাই। পার্ব্বত্য ভূমির উপর গাড়ীর চাকারও কোন দাগ পড়ে নাই। কিছুক্ষণ ব্যর্থভাবে ঘোরাঘুরি করিয়া একে একে সকলেই ফিরিয়া আসিলেন। গ্রামবাসিগণের নিকট হইতে কাগজ কলম সংগ্রহ করিয়া আচার্য্য প্রভু শ্রীজীবের উদ্দেশ্যে পত্র লিখিতে বসিলেন। গ্রন্থ চুরির বিবরণ যথাযথ লিখিয়া সেই পত্র পদাতিকগণকে দিলেন এবং তাহাদিগকে শ্রীধাম অভিমুখে পাঠাইয়া দিলেন। তাহারা চলিয়া যাইবার পর ঠাকুর মহাশয় ও শ্যামানন্দকে লক্ষ্য করিয়া তিনি বলিলেন,—'তোমাদেরও আর এই স্থানে থাকিবার প্রয়োজন নাই, তোমরা চলিয়া যাও, আমি একাকী এই স্থানে থাকিয়া অনুসন্ধান করিব। জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত অনুসন্ধান করিয়া যাইব, জীবনের ব্রত স্বরূপে আজ হইতে আমি এই সঙ্কল্পই গ্রহণ করলাম'—এই কথা বলিতে বলিতে আচার্য্য প্রভু তাঁহাদিগকে আলিঙ্গন করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। ঠাকুর মহাশয় ও শ্যামানন্দ তাঁহাকে এই অবস্থায় ছাড়িয়া যাইতে যখন কোন প্রকারেই সম্মত হইলেন না, তখন আচার্য্য প্রভু ঠাকুর মহাশয়ের হাতে ধরিয়া ধীর কণ্ঠে বলিতে লাগিলেন—'দুর্ভাগ্যের বোঝা মাথায় লইয়া আমাকে এইখানেই থাকিতে হইবে, কিন্তু আমার সহিত থাকিয়া অযথা সময় নষ্ট করা তোমাদের উচিত হইবে না। তোমার শ্রীগুরু দেবের আদেশ অনুসারে নিজ নিজ স্থানে গিয়া আদিষ্ট কর্ম্মে আত্ম নিয়োগ কর। নতুবা এই দুঃখের উপরে আমাকে আরও দুঃখ দেওয়া ব্যতীত আর কোন লাভ হইবে না। আমার এইটুকুমাত্র অনুরোধ তোমরা পালন কর। সঙ্গে যথোপযুক্ত লোক দিয়া শ্যামানন্দকে অন্ধকার পথ দিয়া উড়িষ্যায় পাঠাইয়া দিবে। তাহার পর তুমি খেতুরী চলিয়া যাইবে। প্রভুর কৃপায় গ্রন্থের সন্ধান যদি পাই তবে তোমাদের নিকটে অবশ্যই সংবাদ পাঠাইব।' আর আচার্য্য

প্রভুর কথা কাটিতে না পারিয়া ঠাকুর মহাশয় অবশেষে যাইবার জন্য স্বীকৃত হইলেন।

পরদিন প্রভাতে ঠাকুর মহাশয় শ্যামানন্দের সহিত কাঁদিতে কাঁদিতে আচার্য্য প্রভুকে সেই অপরিচিত স্থানে রাখিয়া চলিয়া গেলেন। তাঁহাদিগকে বিদায় দিয়া আচার্য্য প্রভু ধূলি ধূসরিত দেহে এবং মলিন বেশে একটী বৃক্ষের তলদেশে আসিয়া বসিলেন। তিনি ভাবিতে লাগিলেন শ্রীজীব যদি আমাকে না দিয়া অপর কোন যোগ্য ব্যক্তির করে এই গ্রন্থ সমূহের ভার অর্পণ করিতেন তাহা হইলে হয়ত এইরূপ দুর্ঘটনা ঘটিত না। আমি অযোগ্য এবং মহা অপরাধী সেই কারণেই এই অনর্থ ঘটিল। এইরূপ নানা কথা ভাবিতে ভাবিতে তিনি ব্যাকুল ভাবে কাঁদিতে লাগিলেন এবং উচ্চ কণ্ঠে বলিতে লাগিলেন 'হা প্রভু রূপ সনাতন, তোমরা কৃপা করিয়া বলিয়া দাও কি করিব, কোথায় যাইব, কোথায় গেলে সন্ধান পাইব,'—বলিতে বলিতে আচার্য্য প্রভু উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং পাগলের ন্যায় গ্রামের মধ্যে আসিয়া প্রবেশ করিলেন। সেখানে প্রত্যেকটী গৃহে অনুসন্ধান করিলেন, তাহার পর বিফল মনোরথ হইয়া গ্রামান্তরে চলিলেন। এক গ্রাম হইতে আর এক গ্রামে যাইতেছেন আর ঘরে ঘরে সন্ধান করিতেছেন! আহার নিদ্রার অবসর নাই, দেহের প্রতি দৃষ্টি নাই। এইরূপ ভাবে ঘুরিতেছেন এমন সময়ে একদিন দৈববাণীর ন্যায় তাঁহার কানে কানে কে যেন বলিয়া দিল 'তুমি দুঃখ করিও না, অল্প দিনের মধ্যেই গ্রন্থের সন্ধান পাইবে।' এই ঘটনায় তাঁহার মনে একটু যেন বিস্ময়ের ভাব জাগিল, হৃদয়েও যেন একটু বল আসিল। এইবার তিনি ধীরে ধীরে বন বিষ্ণুপুরের পথে অগ্রসর হইলেন। রুক্ষ কেশ ধূলি ধূসরিত দেহ, কটী দেশে একখানি জীর্ণ বহির্বাস ও কৌপীন, আর অঙ্গে একখানি দেড় হাত উত্তরীয়। দুঃখে বেদনায়, অনাহার ও অনিদ্রায় এবং অত্যধিক পরিশ্রমে দেহ অতিশয় ক্ষীণ হইয়াছে। কিছু দিলে সময়ে সময়ে হয়ত বা সামান্য মাত্র আহার করেন নচেৎ জল পানেই দিবারাত্র

কাটিয়া যায়।(১) সাধারণ ভিক্ষুক অথবা বিকৃত মস্তিষ্ক মনে করিয়া অনেকে হয়ত তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাতও করিত না, আবার দেহের অপরূপ লাবণ্য এবং তেজ দেখিয়া কেহ বা বিস্মিতভাবে তাকাইয়া থাকিত। কিন্তু আচার্য্য প্রভুর সে সব দিকে কিছুমাত্র দৃষ্টি ছিল না। আত্মহারা হইয়া চলিতে চলিতে বিভিন্ন গ্রাম অতিক্রম করিয়া তিনি দশ দিন পর বিষ্ণুপুরের প্রান্ত সীমার মধ্যে আসিয়া পড়িলেন এবং ক্লান্তি বশতঃ এক বটবৃক্ষ মূলে আসিয়া উপবেশন করিলেন।(২) কিছুক্ষণ পর জনৈক ব্রাহ্মণ কুমার আসিয়া সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার সৌম্য এবং প্রশান্ত মূর্ত্তি দেখিয়া আচার্য্য প্রভু পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। পরিচয়ে জানিলেন ব্রাহ্মণ কুমারের নাম শ্রীকৃষ্ণ-বহ্লভ, রাজার আশ্রয়ে থাকিয়া সংস্কৃত অধ্যয়ন করেন। আচার্য্য প্রভু তাঁহার সহিত ব্যাকরণ অলঙ্কার এবং সাহিত্য প্রভৃতি বিষয় লইয়া আলোচনা করিতে লাগিলেন। কৃষ্ণবহ্লভ তখন বুঝিলেন, সামান্য ভিক্ষুক বুদ্ধি করিয়া প্রথমে যাঁহাকে মনে মনে অবহেলা করিতে ছিলেন, তিনি একজন অসাধারণ প্রতিভাবান পণ্ডিত। ব্রাহ্মণ কুমার তাঁহার সহিত সৌজন্যপূর্ণ ব্যবহার করিতে লাগিলেন। ইঁহার নিকট হইতেই আচার্য্য প্রভু বিষ্ণুপুর-রাজ কর্ত্তৃক দস্যু পোষণের কাহিনী অবগত হইলেন। কিন্তু যখন শুনিলেন যে রাজসভায় প্রত্যহ নিয়মিতভাবে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ হয়, তখন তিনি বিস্মিত হইলেন। কৃষ্ণবহ্লভ একান্ত অনুরোধ সহকারে তাঁহাকে নদীর পর পারে, অর্দ্ধক্রোশ দূরে দেউলী গ্রামে তাঁহার আপন বাড়ীতে লইয়া আসিলেন। সেইস্থানে স্নানাদি সমাপন করিয়া স্বপাকে রন্ধন পূর্ব্বক আচার্য্য প্রভু আহার করিলেন

(১) প্রেম বিলাসের উক্তি হইতে গৃহীত।

(২) বনবিষ্ণুপুরের গোস্বামী পাড়ায় এই মনোরম স্থানটী বিশ্রামতলা নামে পরিচিত। বিশ্রাম স্থানটীতে একটী বেদী রহিয়াছে, সম্মুখে হেমলতা কর্ত্তৃক স্থাপিত শ্রীরাধারমনের প্রাচীন মন্দির। এখনও এই স্থানে প্রতি বৎসর আচার্য্য প্রভুর তিরোধান তিথিতে মহামহোৎসবের অনুষ্ঠান হয়।

এবং বিশ্রামান্তে কৃষ্ণবল্লভের অনুরোধে পড়িয়া তাঁহাকে কিছুক্ষণ অধ্যয়নও করাইলেন। ইঁহারই সহায়তায় আচার্য্য প্রভু পর দিবস রাজ সভায় আগমন করিলেন।

দস্যুগণ ইতঃপূর্ব্বে গ্রন্থ সম্পুট অপহরণ করিয়া রাজার সমীপে উপস্থিত করে। গ্রন্থ সম্পুট দর্শন মাত্রে রাজার অন্তরে আনন্দের এক অপূর্ব্ব শিহরণ জাগিল, মন পবিত্রভাবে পূর্ণ হইল, দস্যু বৃত্তির প্রতি কেমন একটা অশ্রদ্ধার ভাব আসিয়া তাঁহার হৃদয়টিকে যেন অনুশোচনায় ভরাইয়া দিল। হঠাৎ কি কারণে মনে এইভাব উঠিল তাহা বুঝিতে পারিলেন না। তিনি স্থির করিলেন—ইহার অভ্যন্তরে সম্ভবতঃ অতি দুর্লভ এবং মূল্যবান বস্তু আছে, সেইদ্রব্য সমূহ হস্তগত হওয়ার ফলেই মনে হয়ত এই জাতীয় উল্লাস এবং সঙ্গে সঙ্গে বিবেকের তাড়না আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। সকলের সম্মুখে না খুলিয়া রাজা সেই সম্পুট একটি গোপন কক্ষে পাঠাইয়া দিলেন এবং একাকী আসিয়া স্বহস্তে তালা ভাঙ্গিয়া তাহা খুলিয়া ফেলিলেন। স্তরে স্তরে সজ্জিত গ্রন্থ সমূহ তাঁহার নয়ন গোচর হইল এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার মনের মধ্যে নির্ব্বেদ আসিয়া উপস্থিত হইল। গ্রন্থরূপী শ্রীভগবানের আবির্ভাবে, স্বাভাবিক বস্তুশক্তির প্রভাবেই রাজার মনোবৃত্তি নির্ম্মল ভাব ধারণ করিয়া ছিল; এখন দর্শন মাত্রেই তাঁহার মন আত্ম-গ্লানিতে পূর্ণ হইয়া গেল, নয়নে জল আসিল। রাজা কাঁদিতে কাঁদিতে ভাবিতে লাগিলেন 'এই সকল অমূল্য গ্রন্থ রাজি অপহরণ করিয়া কোন মহাত্মার অন্তরে ব্যথা দিয়া অপরাধী হইলাম? কি উপায়ে ইহার প্রায়শ্চিত্ত করিব? এইরূপ নানা প্রকার চিন্তায় এবং অনুশোচনায় রাজা একান্ত বিমর্ষ হইয়া পড়িলেন। একটি পৃথক তালা আনাইয়া স্বহস্তে সম্পুট বন্ধ করিলেন এবং গ্রন্থের উদ্দেশ্যে প্রণাম পূর্ব্বক শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়া রাজসভায় ফিরিয়া আসিলেন। অতঃপর বিশ্বস্ত কয়েকজন কর্ম্মচারীকে ডাকিয়া তাহাদিগকে গোপনে আদেশ দিলেন—'যাঁহাদের নিকট হইতে সম্পুট অপহরণ করা হইয়াছে অনুসন্ধান করিয়া অবিলম্বে তাঁহাদিগকে

বাহির কর। অনুসন্ধান কার্য্য তোমরা গোপনে চালাইবে। সন্ধান পাইবামাত্র তোমরা তাঁহাদিগকে সসম্মানে এখানে লইয়া আসিবে।” রাজার আদেশ অনুসারে কর্ম্মচারিগণ তাঁহাদের সন্ধান করিয়া ফিরিতে লাগিল। এদিকে রাজাও মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলেন—‘অদ্য হইতে আমি সারা জীবনের মত দস্যু-বৃত্তি ত্যাগ করিলাম।’ সঙ্গে সঙ্গে ইহাও সঙ্কল্প করিলেন যে—‘এই গ্রন্থরাজির অধিকারী সেই মহাপুরুষের দর্শন লাভের সৌভাগ্য যদি পাই তবে সপরিবারে তাঁহার চরণে আত্মসমর্পণ করিয়া ক্ষমা ভিক্ষা করিয়া লইব। কিন্তু তাঁহার দর্শন কি পাইব? সে সৌভাগ্য কি আমার হইবে? ‘মনে মনে এইরূপ নানা প্রকার সঙ্কল্প বিকল্প করিতে করিতে রাজা ব্যাকুল হইয়া তাঁহার আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। কিন্তু যে দলের নিকট হইতে সম্পুট লুণ্ঠন করা হইয়াছিল, সে দল ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। সম্পুটের অধিকারী এখন উন্মাদের ন্যায় হইয়া ভিক্ষুকের বেশে গ্রামে গ্রামে ঘুরিতেছেন। বহু পরিশ্রমেও রাজ কর্ম্মচারিগণ যখন তাঁহাদের কোনও রূপ সন্ধান পাইল না তখন সকলে একে একে নিরাশ হইয়া ফিরিয়া আসিল। রাজাও ইহাতে অতীব উৎকন্ঠিত হইয়া পড়িলেন। একদিন রাত্রে তিনি বিষণ্ণ মনে শয়ন করিয়া আছেন সামান্য তন্দ্রার ভাব আসিয়াছে, এমন সময় তিনি স্বপ্নে দেখিলেন—অপরূপ রূপলাবণ্যময় একজন পুরুষ আবির্ভূত হইয়া মৃদু হাস্যে তাঁহাকে সান্ত্বনা দিতে দিতে বলিলেন তুমি দুঃখ করিও না যাঁাহার দর্শন লাভের জন্য তুমি ব্যাকুল হইয়াছ শীঘ্রই তাঁহার সহিত তোমার মিলন ঘটিবে। জন্মে জন্মে তাঁহার সহিত তোমার নিত্য সম্বন্ধ। তিনি তোমাকে অবশ্যই কৃপা করিবেন। দেখিতে দেখিতে সুখ-স্বপ্ন মিলাইয়া গেল। কে আসিয়াছিলেন কাহার আগমনের সম্ভাবনার কথা তিনি বলিয়া গেলেন, রাজা কিছুই বুঝিলেন না, সব কিছু প্রহেলিকার ন্যায় মনে হইতে লাগিল। এই ঘটনার পর রাজার মনের বিষণ্ণভাব অনেকটা কাটিয়া

গেল। তিনি সেই মহাপুরুষের আগমন পথের দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিলেন। আশায় আশায় আরও কয়েক দিন অতিবাহিত হইল।

রাজা বীরহাম্বীরের সহিত মিলন।

আচার্য্য প্রভু সে দিন যখন শ্রীকৃষ্ণ বল্লভের সহিত রাজসভায় আসিলেন, তখন শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ আরম্ভ হইয়াছে। তিনি প্রণাম করিয়া অতি দীনভাবে একান্তে আসিয়া উপবেশন করিলেন এবং নিবিষ্ট চিত্তে পাঠ শ্রবণ করিতে লাগিলেন। ব্যাস চক্রবর্ত্তী নামক জনৈক ব্রাহ্মণ 'রাস পঞ্চাধ্যায়ী' পাঠ করিতেছিলেন। পাঠকের শাস্ত্রজ্ঞান বিশেষ ছিল না। আচার্য্য প্রভু দেখিলেন, পাঠকের ব্যাখ্যা ক্রমশঃ ভুল পথে অগ্রসর হইতেছে। সেই ভুল সিদ্ধান্তই তিনি বহু প্রকার যুক্তি এবং শাস্ত্র-প্রমাণ সহযোগে সকলকে বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছেন। সিদ্ধান্ত বিরুদ্ধ পাঠ চলিতেছে, অথচ কেহ প্রতিবাদ করিতেছেন না, তিনিও প্রথমে কোনও রূপ প্রতিবাদ না করিয়া নীরবে বসিয়া শুনিতে ছিলেন। কিন্তু কিছুক্ষণ পর অত্যন্ত অসহ্য বোধ হইলে কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া উপবেশন পূর্ব্বক পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়া সবিনয়ে বলিলেন 'মহাশয়, শ্রীমদ্ভাগবতের ব্যাখ্যাকারগণের মধ্যে শ্রীধর স্বামীপাদের টিকাই বিচার সহ এবং প্রামাণ্য। আপনি সিদ্ধান্ত বিরুদ্ধ ব্যাখ্যা করিতেছেন কেন? তাঁহার অভিপ্রায় অনুসারে ব্যাখ্যা করুন।' আচার্য্য প্রভুর বক্তব্য পাঠকের শ্রুতিগোচর হইল বটে, কিন্তু একজন জীর্ণ ও মলিন বেশধারী নগণ্য ভিক্ষুকের প্রতিবাদ তিনি গ্রাহ্যই করিলেন না, কথার কোন উত্তর প্রদান করিবারও প্রয়োজন বোধ করিলেন না। পাঠ সেইভাবেই চলিতে লাগিল। আচার্য্য প্রভু সেদিন অবশ্য আর কোন প্রতিবাদ করিলেন না। কিছুক্ষণ ধৈর্য্য ধারণ করিয়া বসিয়া রহিলেন, পরে অত্যন্ত অসহ্য হওয়ায় নীরবেই উঠিয়া গেলেন। পরদিন আচার্য্য প্রভু পাঠের সময় পুনরায় আসিয়া

বসিলেন। সিদ্ধান্ত বিরুদ্ধ ব্যাখ্যা সহযোগে রাস পঞ্চাধ্যায়ী পাঠ পূর্ব্ববৎ চলিতে লাগিল। আচার্য্য প্রভু সেদিনও অসহ্য বোধ করিয়া প্রতিবাদ করিলেন, ব্যাস চক্রবর্ত্তীও তাহা গ্রাহ্যের মধ্যে আনিলেন না, কিন্তু রাজা তখন চক্রবর্ত্তীকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—'এই ব্রাহ্মণ পুনঃ পুনঃ আপনার ব্যাখ্যায় দোষারোপ করিতেছেন কেন ? আপনি না হয় শ্রীধর স্বামীর অভিপ্রায় অনুসারেই ব্যাখ্যা করুন,' তুচ্ছ এক ব্রাহ্মণ প্রতিবাদ করিতেছে আর রাজা তাহারই পক্ষ অবলম্বন করিয়া কথা বলিতেছেন দেখিয়া ব্যাস চক্রবর্ত্তী ক্রোধে যেন জ্বলিয়া উঠিলেন। রাজার প্রাত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া তিনি সক্রোধে বলিতে লাগিলেন— 'সামান্য এক মূর্খ ব্রাহ্মণ কি বলিতেছে, আর আপনি তাহা লইয়া মাথা ঘামাইতেছেন ? এমন কে পণ্ডিত এখানে আছে যে আমার ব্যাখ্যার উপর প্রতিবাদ করিতে সাহস করে ?' আচার্য্য প্রভুর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া তিনি পুনরায় ব্যঙ্গচ্ছলে বলিয়া উঠিলেন "ওহে পণ্ডিত প্রবর আজ তুমিই পাঠ কর, আমি না হয় শ্রোতা হইয়া বসিয়া থাকি।" প্রত্যুত্তরে আচার্য্য প্রভু অবশ্য কোন কথা বলিলেন না, পূর্ব্ববৎ শান্ত ভাবেই বসিয়া রহিলেন, তাঁহার অপরূপ রূপলাবণ্য এবং প্রতিভাদীপ্ত মুখশ্রী রাজাকে ক্রমেই তাঁহার প্রতি যেন আকর্ষণ করিতেছিল। রাজা সসম্ভ্রমে তাঁহাকে উদ্দেশ্য করিয়া নিবেদন করিলেন 'আপনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক ভ্রমর গীতা হইতে কিছু ব্যাখ্যা করুন, আমরা শ্রবণ করিয়া ধন্য হই।' রাজার অনুরোধে আচার্য্য প্রভু অগ্রসর হইয়া গ্রন্থ লইয়া বসিলেন। তিনি প্রথমে শ্রীগ্রন্থের উদ্দেশ্যে প্রণাম ও বন্দনা করিলেন, পরে শ্রীমন্মহাপ্রভুর উদ্দেশ্যে প্রণাম ও বন্দনা করিয়া শ্রীমদ্ভাগবত স্পর্শ করিলেন। গ্রন্থ স্পর্শ মাত্র তিনি ভাবে বিভোর হইয়া পড়িলেন, নয়ন যুগলে অশ্রুর ধারা বহিতে লাগিল। বাহ্যদৃষ্টি সম্পূর্ণ লুপ্ত হইল। ক্ষণকাল পরে আত্মস্থ হইয়া শ্লোক উচ্চারণ পূর্ব্বক পাঠ আরম্ভ করিলেন। বক্তা প্রেম রসে বিভোর হইয়া গম্ভীর এবং প্রশান্ত কণ্ঠে ব্যাখ্যা করিয়া চলিয়াছেন, শ্রোতৃবর্গ বিস্ময় বিস্ফারিত লোচনে

তাঁহার মুখের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া সমাহিত চিত্তে শ্রবণ করিতেছেন। ক্রমে আনন্দের তরঙ্গ উঠিল, সকলের নয়নে অশ্রুর ধারা বহিতে লাগিল। প্রেমের বন্যায় সকলে যেন এক অপ্রাকৃত রাজ্যে ভাসিয়া চলিলেন। অবিশ্রান্ত নয়ন ধারায় রাজার বহুমূল্য পরিচ্ছদগুলি সিক্ত হইয়া উঠিল। অব্যাহত গতিতে পাঠ চলিতেছে, ক্রমে অন্ধকার ঘনীভূত হইয়া আসিলে আচার্য্য প্রভুর বাহ্যদৃষ্টি ফিরিয়া আসিল। তখন সন্ধ্যা সমাগত হইয়াছে বুঝিয়া ধীরে ধীরে পাঠ সমাপ্ত করিলেন পরে শ্রীগ্রন্থের উদ্দেশ্যে প্রণাম করিয়া আসন হইতে সরিয়া বসিলেন। রাজসভা নীরব হইল, শ্রোতৃবর্গ এইবার যেন কোন এক অপ্রাকৃত রাজ্য হইতে বাহ্য জগতে ফিরিয়া আসিলেন। প্রকৃতিস্থ হইয়া সকলে সমবেত কণ্ঠে ধন্য ধন্য করিয়া উঠিলেন। ব্যাস চক্রবর্ত্তীর হৃদয়ও গলিয়াছে। অপূর্ব্ব প্রেম, অসাধারণ পাণ্ডিত্য এবং অতলস্পর্শী মহিমময়ী প্রতিভার সমক্ষে তাঁহার পাণ্ডিত্যের অহঙ্কার চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গিয়াছে। প্রেমভক্তি তাহার অপ্রতিহত প্রভাব দ্বারা তাঁহার অহমিকাটীকে শরণাগতির আকারে রূপান্তরিত করিয়া দিয়া স্বীয় চরণে তাঁহাকে আশ্রয় প্রদান করিলেন। ব্যাস চক্রবর্ত্তী অবিলম্বে উঠিয়া আসিয়া লজ্জিত এবং অনুতপ্ত চিত্তে আচার্য্য প্রভুর চরণ ধারণ পূর্ব্বক সর্ব্বসমক্ষে পুনঃ পুনঃ ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। আচার্য্য প্রভু তাঁহাকে উঠাইয়া আলিঙ্গন প্রদান পূর্ব্বক সস্নেহে আপন পার্শ্বে বসাইলেন। রাজা বীরহাম্বীরের হৃদয় গ্রন্থিও খুলিয়া গিয়াছে, তিনিও অশ্রুসিক্ত নয়নে উঠিয়া আসিয়া তাঁহার চরণ বন্দনা করিলেন। পরে আতিথ্য গ্রহণের জন্য করজোড়ে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিতে লাগিলেন। তাঁহার আন্তরিক অনুরোধ উপেক্ষা করিতে না পারিয়া আচার্য্য প্রভু অবশেষে আতিথ্য স্বীকারে বাধ্য হইলেন। অতি মনোরম একটী নির্জ্জন স্থানে তাঁহার বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট করা হইল। কৃষ্ণবল্লভ এবং ব্যাস চক্রবর্ত্তী তাঁহাকে সসম্ভ্রমে বাসস্থানে লইয়া গেলেন। আচার্য্য প্রভু পূর্ব্ব হইতেই

একাহারী। সুতরাং রন্ধনাদির উদ্‌যোগ করিতে নিষেধ করিলেন। তিনি আহার করিবেন না শ্রবণ করিয়াই রাজা ছুটিয়া আসিলেন। তাঁহার সকাতর অনুরোধে সামান্য কিছু দুগ্ধ গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইলেন। রাজা স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া দুগ্ধ পান করাইলেন এবং পরে তাঁহার শয়নাদির যথাযোগ্য ব্যবস্থা করিয়া প্রণাম পূর্ব্বক বিদায় গ্রহণ করিলেন। রাত্রি গভীর হইলে সকলকে বিদায় দিয়া আচার্য্য প্রভু শয়ন করিলেন। শয়ন করিলেন বটে, কিন্তু নানাপ্রকার দুশ্চিন্তায় নিদ্রা আসিল না। নিদ্রা বহুদিন হইতেই তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া গিয়াছে। গ্রন্থের বিরহে হৃদয় সর্ব্বদা জ্বলিতেছে, নিদ্রা আসিবে কিরূপে ? এখানে যাঁহাদের নিকটে আসিয়াছেন তাঁহারা সকলেই নব পরিচিত। ইহারা কি ভাবে তাঁহাকে গ্রহণ করিবেন, গ্রন্থ অনুসন্ধানের ব্যাপারে তাঁহাকে সাহায্য করিবেন কি না, সে বিষয়ে কিছু নিশ্চয় করিতে না পরিয়া এখনও পর্য্যন্ত ইঁহাদের নিকটে গ্রন্থ অপহরণ সংক্রান্ত কোন কথা প্রকাশ করেন নাই, নিজের কোন পরিচয়ও তাঁহাদিগকে দেন নাই। ব্যর্থতা এবং মর্ম্ম বেদনায় কাতর হইয়া নানা-রূপ চিন্তা করিতে করিতে তিনি সমস্ত রাত্রি বিনিদ্রভাবে কাটাইলেন।

পরশমণির সংস্পর্শে আসিয়া লৌহ সুবর্ণে রূপান্তরিত হইল। রাজা বীরহাম্বীরের হৃদয় আচার্য্য প্রভুর সঙ্গ প্রভাবে পরিবর্ত্তিত হইয়া যেন নব কলেবর ধারণ করিল। পূর্ব্বকৃত দুষ্কর্ম্মের স্মৃতিগুলি তাঁহাকে অনুশোচনার আগুনে পোড়াইতেছে, তদুপরি গ্রন্থ সম্পুটের অধিকারীর কোনরূপ সন্ধান না পাইয়া তিনি যেন আরও বিচলিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। এই নবাগত ব্রাহ্মণের সংস্পর্শে আসিয়া সেই বিবেক দংশনের জ্বালা বাড়িয়াছে বই কমে নাই, কিন্তু এই সঙ্গে তাঁহার মনের ভিতর হইতে কে যেন এই কথাই বার বার বলিয়া দিতে লাগিল যে—'তুমি যাইয়া সেই ব্রাহ্মণের চরণ যুগলে আত্ম সমর্পণ কর, তোমার সকল যন্ত্রণার অবসান সেইখানেই হইবে। কে যেন তাঁহার প্রাণকে সবেগে তাঁহার দিকে টানিতে লাগিল। নানারূপ মানসিক দ্বন্দ্বের

মধ্যে রাজা এক প্রকার বিনিদ্র ভাবেই রাত্রি অতিবাহিত করিলেন। পরদিন প্রত্যুষে আসিয়া রাজা, আচার্য্য প্রভুর চরণ বন্দনা করিলেন। কিছুক্ষণ বিবিধ প্রসঙ্গ আলোচনার পর তিনি সেবা পরিচর্য্যার নিমিত্ত ব্যাস চক্রবর্ত্তীকে বিশেষভাবে সতর্ক করিয়া দিয়া রাজ কার্য্যে চলিয়া গেলেন। ব্যাস চক্রবর্ত্তী কায়মনোবাক্যে তাঁহার সেবায় আত্ম নিয়োগ করিলেন। সেদিন অপরাহ্নে পুনরায় পাঠ আরম্ভ হইল। আচার্য্য প্রভু প্রেম ধারায় ভাসিতে ভাসিতে তদ্গত হইয়া পাঠে মনোনিবেশ করিলেন। শ্রোতৃ মণ্ডলীও নয়ন ধারায় ভাসিতে লাগিলেন। এইদিন রাজা ক্রমেই যেন অধিকতর অস্থির এবং ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। নিজ মস্তকে এবং বক্ষে করাঘাত করিতে করিতে কাঁদিতে লাগিলেন। তাঁহার আকুল কণ্ঠস্বরে অন্যান্য সকলেও যেন কাতর হইয়া পড়িলেন। পাঠ চলিতেছে, রাজার অস্থিরতাও ক্রমে বাড়িতেছে, তাঁহার আর্ত্তকণ্ঠের ক্রন্দন ধ্বনিতে পাঠ আর শ্রুতি গোচর হয় না। আচার্য্য প্রভুর আবেশ ছুটিয়া গেল, তিনি বিমুগ্ধ এবং বিস্মিত হইয়া পাঠ বন্ধ করিলেন এবং নানা প্রকার প্রবোধ বাক্যের দ্বারায় তাঁহাকে স্থির করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। সেদিন আর পাঠ হইল না, সভাসদ্গণ এবং অন্যান্য শ্রোতৃবৃন্দ একে একে বিদায় গ্রহণ করিলেন। রাজা তখন উঠিয়া আসিয়া আচার্য্য প্রভুর চরণ সমীপে উপবেশন করিলেন এবং সিক্ত কণ্ঠে তাঁহার সবিশেষ পরিচয় এবং বিষ্ণুপুর আগমনের কারণ কি, তাহা জিজ্ঞাসা করিলেন রাজার প্রতি আচার্য্য প্রভুর স্নেহ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে ছিল। এখন তাঁহার প্রশ্নের উত্তরে আর নীরব থাকিতে না পারিয়া, তাঁহার জীবনের সকল ঘটনা একে একে বিবৃত করিতে আরম্ভ করিলেন। ক্রমে শ্রীমন্মহাপ্রভু ও শ্রীরূপ সনাতনের ইঙ্গিত, শ্রীজীবের আদেশে ঠাকুর মহাশয় ও শ্যামানন্দ সহ গ্রন্থ আনয়নের কথা যথাযথ বর্ণনা করিলেন। অবশেষে গোপালপুরে গ্রন্থ চুরির বিবরণ যখন বলিতে আরম্ভ করিলেন তখন রাজা আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, শিরে

করাঘাত করিয়া উচ্চৈস্বরে কাঁদিতে কাঁদিতে আচার্য্য প্রভুর চরণ জড়াইয়া পড়িলেন। রাজার অকস্মাৎ এই জাতীয় আচরণের কারণ কি, তাহা বুঝিতে না পারিয়া আচার্য্য প্রভু বিস্ময়ে বিমূঢ়ের ন্যায় বসিয়া রহিলেন। অল্পক্ষণ পরে ঈষৎ ধৈর্য্য লাভ করিয়া রাজা উঠিয়া বসিলেন এবং বেদনাহত কণ্ঠে করজোড়ে বলিতে লাগিলেন 'প্রভু আমিই সেই নরাধম! দস্যুতা করিয়া গ্রন্থ অপহরণ আমিই করিয়াছি। আপনার কোমল হৃদয়ে দুর্বিষহ তাপের বোঝা আমিই তুলিয়া দিয়াছি। তবে গ্রন্থ সমূহ নষ্ট হয় নাই, আমি সযত্নে তুলিয়া রাখিয়াছি। এইবার আপনি আপনার গ্রন্থ সমূহ গ্রহণ করুন এবং এই মহা অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ আপনার অভিরুচি অনুসারে আমাকে দণ্ড প্রদান করুন, আমি অবনত মস্তকে সেই শাস্তি গ্রহণ করিয়া আত্মগ্লানির তীব্র জ্বালা হইতে মুক্তি লাভ করি,' বলিতে বলিতে রাজা পুনরায় কাঁদিয়া উঠিলেন এবং পুনরায় তাঁহার চরণ ধরিতে উদ্যত হইলেন। আচার্য্য প্রভু বিস্ময়ে এবং আনন্দে অধীর হইয়া রাজাকে তুলিলেন এবং গভীরভাবে আলিঙ্গন করিলেন। তাঁহার নয়ন বহিয়া আনন্দ ধারা নির্গত হইতে লাগিল। রাজার দুষ্কর্ম্মের প্রতি তাঁহার দৃষ্টি নাই। গ্রন্থ নিরাপদেই আছেন এবং তিনি পুনরায় তাহা ফিরিয়া পাইবেন এই সম্ভাবনার সংবাদে তাঁহার মনের সমস্ত গ্লানি মুছিয়া গেল। আচার্য্য প্রভু রাজাকে সর্ব্বান্তঃকরণে ক্ষমা করিলেন। গ্রন্থ দর্শনের নিমিত্ত তাঁহার ব্যগ্রতা এতই বাড়িল যে আর বিলম্ব সহ্য করিতে না পারিয়া রাজাকে বলিলেন—'যে স্থানে গ্রন্থ রহিয়াছেন আমাকে এখনই একবার সেই স্থানে লইয়া চলুন, আমাকে দর্শন করাইয়া চিরতরে ক্রয় করিয়া রাখুন।' বলিতে বলিতে আচার্য্য প্রভু উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তখন রাজা তাঁহাকে যথাস্থানে লইয়া গিয়া গ্রন্থ সম্পুট দেখাইলেন। বহু প্রত্যাশিত গ্রন্থ সম্পুটের সম্মুখে আসিয়া আচার্য্য প্রভু সাষ্টাঙ্গে প্রণতঃ হইয়া পড়িলেন। পরে সম্পুট খুলিয়া গ্রন্থ সমূহ যথাপূর্ব্ব রক্ষিত থাকিতে দেখিয়া আনন্দে উন্মত্ত হইলেন

এবং এই দীর্ঘ কালের দুর্বিবষহ মর্ম্ম বেদনার কথা একেবারে বিস্মৃত হইলেন। রাজা অনুতপ্ত কণ্ঠে তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিলেন—'সমগ্র জীবন ব্যাপী আমি এইরূপ দুষ্কর্ম্ম করিয়া আসিতেছি, মূল্যবান পার্থিব সম্পদ মনে করিয়া সম্পুট লুণ্ঠন করাইয়া ছিলাম। কিন্তু আনয়ন করাইয়া যখন দেখিলাম যে, পরম পবিত্র এবং দুর্লভ গ্রন্থ সমূহ অপহরণ করাইয়া মহা অপরাধে পতিত হইয়াছি, মনে মনে তখনই বুঝিতে পারিলাম সাধু বৈষ্ণবগণের চরণে অপরাধ করিয়া এইবার আমি নিজের সর্ব্বনাশ সাধনে নিজেই পূর্ণাহুতি প্রদান করিলাম। কিন্তু আজ দেখিতেছি যে, আপনার অহৈতুকী করুণায় সেই অপরাধই আমার জীবনে পরম সম্পদ রূপে দেখা দিতেছে। আপনার প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয় এই গ্রন্থরাজি অপহরণ করিয়া রাখিয়া ছিলাম বলিয়াই, তাঁহাদের আকর্ষণে আজ আপনি এই নরাধম দস্যুপতির গৃহে পদার্পণ করিয়াছেন, অপরাধের দণ্ড প্রাপ্তির পরিবর্ত্তে আজ যাহা লাভ করিলাম তাহাতে আমি, আমার বংশ এবং আমার দেশ ধন্য হইয়া গেল। যতদিন জীবিত থাকিব আপনার অহৈতুকী করুণার জয় দিতে দিতে যেন অবশিষ্ট দিনগুলি কাটাইয়া যাইতে পারি, ইহা অপেক্ষা বড় প্রার্থনা আমার আর নাই।' বলিতে বলিতে তাঁহার নয়নে ধারা বহিতে লাগিল। ক্রন্দনের আবেগে কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গেল। আচার্য্য প্রভু গভীর স্নেহে তাঁহাকে নিকটে আনিয়া নিবিড়ভাবে আলিঙ্গন দিয়া তাঁহার হৃদয়ের তাপ মুছিয়া দিলেন।

পরদিন প্রভাতে আচার্য্য প্রভুর নির্দ্দেশ অনুসারে গ্রন্থ পূজার আয়োজন হইল। পূজা, আচার্য্য প্রভু স্বহস্তেই করিলেন। রাজা তৎপরে তাঁহাকে অন্তঃপুরে লইয়া আসিলেন। রাজমহিষী সুলক্ষণা দেবী (বা সুদক্ষিণা) ইতঃপূর্ব্বে সকল কথাই শ্রবণ করিয়াছেন। স্বামীর চরিত্রের এই অসাধারণ পরিবর্ত্তনও তিনি স্বচক্ষে দেখিয়াছেন এবং নীরবে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে করিতে আচার্য্য প্রভুর করুণার জয় দিয়াছেন ; সেই হইতে মনে প্রাণে তাঁহার চরণে রাজার সহিত তিনিও

আত্মসমর্পণ করিয়াছেন। এখন তাঁহার ইষ্টদেবকে সম্মুখে পাইয়া মহারাণী সজল নয়নে এবং গললগ্নী কৃতবাসে আসিয়া সাষ্টাঙ্গ প্রাণপাত পূর্ব্বক সর্ব্বান্তঃকরণে শ্রদ্ধা নিবেদন করিলেন। তাঁহার ভক্তি বিগলিত অশ্রু ধারায় আচার্য্য প্রভুর চরণ যুগল সিক্ত হইতে লাগিল।

আচার্য্য প্রভুর সংস্পর্শে আসয়া রাজ দম্পতি নব জীবন লাভ করিলেন। বিষয়ানুশীলনের প্রতি বিতৃষ্ণা এবং ভগবৎভজনের দিকে আসক্তি তাঁহাদের ক্রমেই বাড়িতে লাগল। তাঁহাদের আন্তরিক আগ্রহ দেখিয়া আচার্য্য প্রভু একদিন উভয়কে ভজন প্রণালী শিখাইয়া দিলেন। সেইদিন হইতে তাঁহারাও কঠোর নিয়ম অবলম্বন পূর্ব্বক ভগবৎ ভজনে আত্মনিয়োগ করিলেন। কিছুদিন পর আষাঢ়ী কৃষ্ণা তৃতীয়া দিবসে আচার্য্য প্রভু তাঁহাদিগকে দীক্ষা প্রদান করিলেন। রাজকুমার ধাড়ী হাম্বির, ব্যাস চক্রবর্ত্তী, কৃষ্ণ বহ্লভ এবং আরও অনেকে ক্রমে ক্রমে তাঁহার নিকটে দীক্ষা গ্রহণ করিলেন। দীক্ষা গ্রহণের পর রাজার নাম হইল হরিচরণ দাস।* রাজার এই অসাধারণ মানসিক পরিবর্ত্তনের সংবাদ অতি অল্প সময়ের মধ্যেই রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে ছড়াইয়া পড়িল। তখন আচার্য্য প্রভুর মহিমা অবগত হইয়া সকলে দলে দলে আসিয়া তাঁহার চরণ আশ্রয় ক রতে লাগিল। অল্প কিছু দিনের মধ্যে বিষ্ণুপুর রাজ্য ভগবৎ নাম গুণ গানের মধুর ঝঙ্কারে মুখরিত হইয়া উঠিল। শ্রীমন্মহাপ্রভুর চরণ যুগল হৃদয়ে ধারণ করিবার সৌভাগ্য এই দেশের হয় নাই, আজ গ্রন্থ চুরি উপলক্ষ্য করিয়া প্রভু স্বীয় অভিন্নকলেবর আচার্য্য প্রভুর দ্বারায় কৃপা প্রকাশ করিয়া মল্লভূমির সেই অভাব পূর্ণ করিয়া দিলেন।

* এই সময় তাঁহারা যুগল মন্ত্রে দীক্ষা লাভ করেন নাই, ভক্তিরত্নাকরে আচার্য্য প্রভুর উক্তি, যথা :—"অহে রাজা গোসাঞির গ্রন্থাস্বাদ পরে। রাধাকৃষ্ণ মন্ত্রে দীক্ষা করাব তোমারে॥" দ্বিতীয়বার বৃন্দাবন ভ্রমনান্তে প্রত্যাবর্ত্তনের পথে আচার্য্য প্রভু ইঁহাদিগকে যুগল মন্ত্রে দীক্ষিত করেন।

আচার্য্য প্রভু ইতোমধ্যে গ্রন্থ প্রাপ্তির সংবাদ সহ অন্যান্য সমস্ত সমাচার বৃন্দাবনে প্রেরণ করিলেন। যে গাড়ীখানিতে গ্রন্থ সম্পূট আসিয়া ছিলেন রাজা স্বেচ্ছায় সেই গাড়ীতে শ্রীগোবিন্দজী, শ্রীগোপীনাথ এবং শ্রীমদনমোহনের সেবার জন্য বিবিধ প্রকার বহুমূল্য দ্রব্যাদি সজ্জিত করিয়া প্রহরী সহ গাড়ীখানি পত্র বাহকের সহিত বৃন্দাবনে প্রেরণ করিলেন। গ্রন্থ চুরির সংবাদে গোস্বামিগণের দুঃখ ও মর্ম্মবেদনায় আহার নিদ্রা ত্যাগ হইয়া গিয়াছিল, অবিরত অশ্রুপাতে তাঁহাদের দিন অতিবাহিত হইতে ছিল। গ্রন্থ প্রাপ্তির সংবাদে শ্রীধাম আনন্দে উন্মত্ত হইল। খেতুরী নিকটবর্ত্তী গোপালপুরে* তখন ঠাকুর মহাশয় অবস্থান করিতে ছিলেন। শ্যামানন্দ তখনও তাঁহার সহিত সেইখানেই ছিলেন। আচার্য্য প্রভু বিস্তারিত বিবরণ সহ গ্রন্থ প্রাপ্তির সংবাদ তাঁহাদের নিকটে প্রেরণ করিলেন, রাজা তাঁহাদের সহিত মিলিত হইবার নিমিত্ত ব্যস্ত হইয়াছেন সে কথাও জানাইলেন। সংবাদ পাইয়া আনন্দে আত্মহারা হইয়া তাঁহারা নৃত্য করিতে লাগিলেন। এই উপলক্ষ্যে ঠাকুর মহাশয় ও শ্যামানন্দ সেখানে মহামহোৎসবের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন।

যাজিগ্রামে প্রত্যাবর্ত্তন এবং নরোত্তমের আগমন।

রাজা এবং মহারাণীর একান্ত অনুরোধে পড়িয়া আচার্য্য প্রভু আরও কিছুদিন বিষ্ণুপুরে বাস করিতে বাধ্য হইলেন। এই সময়ে তিনি ব্যাস চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি কয়েকজনকে শ্রীমদ্ভাগবত এবং আরও কয়েকখানি গ্রন্থ অধ্যয়ন করাইলেন। উত্তরকালে ব্যাস চক্রবর্ত্তী তাঁহারই নিকটে আচার্য্য উপাধি লাভ করিয়া ব্যাসাচার্য্য নামে প্রসিদ্ধ

* খেতুরী হইতে তিন ক্রোশ দূরে গোপালপুর গ্রাম অবস্থিত।

হন। আচার্য্য প্রভু যাজিগ্রাম ত্যাগ করিয়াছেন বহুদিন। বৃদ্ধা জননী কাতর হৃদয়ে সন্তানের আগমন প্রতীক্ষা করিয়া বসিয়া আছেন, সুতরাং আর কাল বিলম্ব করা উচিত হইবে না। জন্মভূমির উদ্দেশ্যে রওনা হইবার সঙ্কল্প স্থির করিয়া আচার্য্য প্রভু একদিন রাজার নিকটে নিজ অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। তাঁহাকে ছাড়িয়া দিবার ইচ্ছা রাজার নাই, আবার গুরুদেবের জননী দেবীর কথা চিন্তা করিয়া বাধা দিতেও পারিলেন না, অন্তরের বিরহ বেদনা গোপনে রাখিয়াই তিনি সম্মতি প্রদান করিলেন। বিষ্ণুপুরের শত শত নরনারীর সহিত রাজা ও রাণী অশ্রু মুছিতে মুছিতে একদিন তাঁহাকে বিদায় দান করিলেন। ব্যাস চক্রবর্ত্তী এবং কৃষ্ণ বল্লভ তাঁহার সঙ্গ ত্যাগ করিতে না পারিয়া তাঁহারাও সঙ্গে সঙ্গে যাজিগ্রাম অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

রাজার শ্রদ্ধাপ্রদত্ত বহুমূল্য দ্রব্যাদি, গ্রন্থ সম্পুট এবং বহু লোকজন সহ দ্রুত পথ চলিতে চলিতে আচার্য্য প্রভু একদিন যথা সময়ে যাজিগ্রামে আসিয়া উপনীত হইলেন এবং সর্ব্বাগ্রে মাতৃ-সন্নিধানে আসিয়া তাঁহার চরণে সাষ্টাঙ্গ প্রণতঃ হইলেন। প্রায় আট বৎসর পূর্ব্বে লক্ষ্মীপ্রিয়া দেবী পুত্রের ব্যাকুলতায় এক প্রকার নিরুপায় হইয়াই তাঁহাকে সুদূর বৃন্দাবনের বিপদ সঙ্কুল পথে ছাড়িয়া দিয়াছিলেন এবং সেই হইতে তাঁহার প্রত্যাবর্ত্তনের আশায় পথ চাহিয়া দিন অতিবাহিত করিতে ছিলেন। বহুদিন পর আজ সন্তানকে পাইয়া আনন্দে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে করিতে নিকটে বসাইলেন এবং অঙ্গে করমার্জ্জন পূর্ব্বক নানা প্রকারে কুশল জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। জননী লক্ষ্মীপ্রিয়া দেবার কথা প্রসঙ্গে শচী মাতার কথাই মনে জাগিয়া উঠে। শ্রীমন্মহাপ্রভুর ন্যায় আচার্য্য প্রভু সন্ন্যাসাশ্রম অবলম্বন করেন নাই বটে, কিন্তু আচরণে তিনি প্রকৃত সন্ন্যাসীই ছিলেন। প্রভুর নীলাচল বাসের সময় গৌড়ীয় ভক্তগণ প্রতি বৎসর শচী মাতার নিকটে তাঁহার সংবাদ আনিয়া দিতেন। তাহা ব্যতীত বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীও নিকটে থাকিয়া সর্ব্বদা তাঁহাকে

সান্ত্বনা দিতেন, কিন্তু লক্ষ্মীপ্রিয়া দেবীর পক্ষে সন্তানের কুশলাদি প্রাপ্তির কোনও সুযোগ ছিল না, কারণ সুদূর বৃন্দাবন গমনাগমনের যাত্রী বিরল ছিল, তাহা ব্যতীত সর্ব্বদা নিকটে থাকিয়া সান্ত্বনা দান করিবে এমন কেহ তাঁহার ছিল না। এই দীর্ঘ আট বৎসরকাল সন্তানকে ছাড়িয়া বৃদ্ধা লক্ষ্মীপ্রিয়া দেবী একাকিনী কিরূপ ভাবে অতিবাহিত করিয়াছিলেন তাহা অনুমান করাও সুকঠিন। এতদিন পর সন্তানকে নিকটে পাইয়া দেবী পরমানন্দে নিমগ্না হইলেন।

স্থানীয় ভক্তবৃন্দ এবং আত্মীয়বর্গ সংবাদ পাইয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। তাঁহাদিগের দ্বারা জিজ্ঞাসিত হইয়া আচার্য্য প্রভু একে একে তাঁহার বন্দাবন বাসের কথা, অধ্যয়নাদির বিষয় গোস্বামিগণের কথা এবং অন্যান্য ঘটনাসমূহ বর্ণনা করিয়া শ্রবণ করাইলেন। গ্রন্থ চুরি এবং রাজা বীর হাম্বীরের প্রসঙ্গ শ্রবণ করিতে করিতে সকলে বিস্ময়ে এবং আনন্দে চমৎকৃত হইলেন। পূজনীয় গুরুবর্গ সকল কথা শুনিয়া তাঁহাকে প্রাণ ভরিয়া আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন। তিনিও যথাযোগ্য প্রণাম বন্দনাদির দ্বারা তাঁহাদিগকে আপ্যায়িত করিলেন। অতঃপর আচার্য্য প্রভু তাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া নবদ্বীপ, কাটোয়া, শ্রীখণ্ড প্রভৃতি স্থানের মহাত্মগণের কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। ভক্তগণ এতক্ষণ এই আশঙ্কাই করিতেছিলেন, আচার্য্য প্রভুর এই দীর্ঘ অনুপস্থিতির মধ্যে যে সকল বেদনাদায়ক ঘটনাগুলি ঘটিয়াছে এই আনন্দময় পরিবেশের মধ্যে তাহা প্রকাশ করিবার ইচ্ছা কাহারও ছিল না। আচার্য্য প্রভুর নিকট সে সংবাদ শ্রবণ করাইবার সাহসও তাঁহাদের ছিল না। তাঁহার প্রশ্নের কোন উত্তর না দিয়া সকলে অবনত শিরে বসিয়া রহিলেন, তাঁহাদের বদন-মণ্ডলে বেদনার আভাস সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল। অনেকে তাঁহাদের উদ্গত অশ্রু গোপন করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন, তাহা আচার্য্য প্রভুর দৃষ্টি এড়াইল না। তাঁহাদের ভাব দর্শনে তিনি ভীত ও শঙ্কিত হইয়া সংবাদ শ্রবণ করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিলেন। দুঃসংবাদ

আর গোপন করিয়া রাখা সম্ভব হইল না। ভক্তগণ বেদনা-ভারাক্রান্ত হৃদয়ে বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী এবং শ্রীবাস পণ্ডিতের অদর্শন-বার্ত্তা ধীরে ধীরে তাঁহার কর্ণ গোচর করিলেন। স্বদেশে ফিরিয়া আসিয়াই এইরূপ হৃদয় বিদারক সংবাদ শ্রবণ করিতে হইবে আচার্য্য প্রভুর কল্পনাতেও তাহা আসে নাই। এই আনন্দময় পরিবেশের মধ্যে অতর্কিত ভাবে যে আঘাত আসিয়া পড়িল তাহা সহ্য করিবার শক্তি তাঁহার ছিল না। সংবাদ শ্রবণ মাত্রে তিনি গভীর মূর্চ্ছায় আক্রান্ত হইয়া ভূমিতে লুটাইয়া পড়িলেন। জননী এবং অন্যান্য সকলের চেষ্টায় বহুক্ষণ পর সংজ্ঞা ফিরিয়া আসিল ; আচার্য্য প্রভু ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিলেন এবং ব্যাকুলভাবে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। অতীত দিনের ঘটনা সমূহ মনে পড়িতে লাগিল—প্রিয়াজীর আশ্রয়ে নবদ্বীপে বাস, তাঁহার তপঃক্লিষ্ট ভজন, অপূর্ব্ব বাৎসল্যপূর্ণ ব্যবহারে ; সকল কথাই একে একে মনে পড়িতে লাগিল। আজ প্রিয়াজী অন্তর্হিত, শ্রীবাস অন্তর্হিত, নবদ্বীপ এইবার প্রকৃতই শূন্য হইয়া গেল। সেখানে গিয়া আর তাঁহাদিগকে দেখিতে পাইবেন না। বাৎসল্যে বিগলিত হইয়া 'শ্রীনিবাস,' বলিয়া আহ্বান করিতে করিতে আর কেহ নিকটে আসিয়া দাঁড়াইবেন না। এই সমস্ত কথা ভাবিতে ভাবিতে তিনি করুণ স্বরে কাঁদিতে লাগিলেন। সমস্ত দিবস এইরূপ ভাবেই অতিবাহিত হইল রাত্রে নিদ্রার আবেশে অদ্বৈত প্রভু স্বপ্নযোগে আবির্ভূত হইয়া তাঁহাকে দর্শন দিলেন এবং নানা প্রকার স্নেহবাক্যের দ্বারায় তাঁহাকে আশ্বস্ত করিয়া গোস্বামী গ্রন্থ প্রচার বিষয়ে তাঁহাকে উৎসাহিত করিলেন। পরে বলিলেন 'তোমার গুরুবর্গ এবং মহাত্মগণ তোমাকে বিবাহ করিতে আজ্ঞা করিলে তুমি তাঁহাদের আদেশ অমান্য কারও না। এ বিষয়ে কিছুমাত্র চিন্তা বা দ্বিধার কারণ নাই, প্রভুর ইচ্ছায় ইহাতে পরম মঙ্গলই সাধিত হইবে।' বিবাহ করিয়া তাঁহাকে সাংসারাশ্রমে প্রবেশ করিতে হইবে সে কথা তিনি স্বপ্নেও কোন দিন চিন্তা করেন নাই। অদ্বৈত প্রভুর আদেশবাক্য তাঁহাকে বিমূঢ়

করিয়া দিল। নিদ্রা ভঙ্গের পর তিনি বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইয়া বসিয়া রহিলেন।

পর দিবস প্রত্যুষে আচার্য্য প্রভু সরকার ঠাকুর মহাশয়ের চরণ দর্শন মানসে জননীর নিকট বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক শ্রীখণ্ড অভিমুখে রওনা হইলেন এবং যথা সময়ে শ্রীখণ্ডে উপনীত হইয়া সর্ব্বাগ্রে মন্দিরে অসিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর সম্মুখে দণ্ডবৎ করিলেন। পরে রঘুনন্দনের সহিত সাক্ষাৎ হইলে তিনি তাঁহাকে সরকার ঠাকুর মহাশয়ের নিকটে লইয়া অসিলেন। আচার্য্য প্রভু আসিয়া তাঁহার চরণ বন্দনা করিলে তিনি তাঁহাকে সস্নেহে উঠাইয়া আলিঙ্গন দান পূর্ব্বক নিকটে বসাইলেন এবং তাঁহার অঙ্গে করমার্জ্জন করিতে করিতে একে একে শ্রীধামের সংবাদ শ্রীজীব, গোপাল ভট্ট প্রভু এবং অন্যান্য সকলের কুশলাদি, ঠাকুর মহাশয় ও শ্যামানন্দের সংবাদ এবং তাঁহার অধ্যয়নাদির কথা সকল জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। তিনিও তাঁহার প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিলেন। এই কয়েক বৎসরের মধ্যে সরকার ঠাকুর মহাশয়ের দেহে বার্দ্ধক্যের ছাপ যেন সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। শরীর যেন আরও কৃশ এবং দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে। এই পরিণত বয়সে বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী এবং শ্রীবাসের বিরহ জনিত আঘাত তাঁহার এই দুর্ব্বল হৃদয়ে কিরূপ তীব্রভাবে বাজিয়াছে আচার্য্য প্রভু তাহা প্রাণে প্রাণে অনুভব করিলেন। তাঁহাদের অপ্রকটের পর হইতে তিনি জন-সঙ্গ এক প্রকার ত্যাগ করিয়াছেন। নির্জ্জন ভজন কক্ষেই এখন তাঁহার দিবারাত্র অতিবাহিত হয়। একাকী বসিয়া বসিয়া গৌর ও গৌরগণের লীলা কথা স্মরণ করেন আর নয়ন বহিয়া অবিচ্ছিন্ন অশ্রুর ধারা ঝরিতে থাকে। তাঁহার অবস্থা দেখিয়া আচার্য্য প্রভু মর্ম্মবেদনায় অভিভূত হইয়া বসিয়া রহিলেন। সরকার ঠাকুর মহাশয় স্নেহসিক্ত কণ্ঠে বলিলেন 'বাবা শ্রীনিবাস, একে একে সকলেই ত চলিয়া গেলেন, আমিই মাত্র যন্ত্রণা ভোগ করিবার জন্য পড়িয়া রহিলাম। এখন আর গৌর কথা শুনাইবার কেহ নাই, শুনিবারও কেহ নাই। যাহা হউক,

তুমি ফিরিয়া আসিয়াছ, এখন গৌরলীলা কথা শুনাইয়া আমাদের দগ্ধ হৃদয় শীতল কর। নরোত্তমকেও একবার দেখিবার ইচ্ছা হয় তোমরা প্রভুর প্রিয় শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন এবং নিগূঢ় ভক্তিরহস্য প্রচার করিয়া তাপ দগ্ধ জগতের দুঃখ দূর কর ; আমরা দেখিয়া শুনিয়া ধন্য হই।' পরে পুনরায় বলিলেন,—'এইরূপ ভক্তিমতী জননীর সন্তান হইবার সুযোগ বহু ভাগ্যে লাভ করিয়াছ। এইবার গৃহে থাকিয়া কায়মনোবাক্যে তাঁহার সেবা কর আর বিবাহ করিও। বিশুদ্ধ গার্হস্থ্য জীবন অবলম্বন করিয়া প্রভুর প্রেমধর্ম্ম প্রচারে ব্রতী হও, ইহাই আমার ইচ্ছা। তোমার আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া গৃহিগণ ভক্তিরাজ্যে প্রবিষ্ট হোক্।' রঘুনন্দনও সর্ব্বান্তঃকরণে তাঁহার প্রস্তাব অনুমোদন করিলেন। বিবাহ ব্যাপারে আচার্য্য প্রভুর মনে বিন্দুমাত্র সম্মতি ছিল না, গোপাল ভট্ট প্রভু অথবা অন্যান্য গোস্বামিগণও এ বিষয়ে তাঁহাকে কোন প্রকার ইঙ্গিত করেন নাই। কিন্তু অদ্বৈত প্রভুর স্বপ্নাদেশ, মাতৃদেবীর ইচ্ছা এবং সরকার ঠাকুর মহাশয়ের উপদেশ তাঁহাকে গার্হস্থ্য জীবনের প্রতি অগ্রসর হইতেই ইঙ্গিত করিতেছে। তিনি মুখে কিছু বলিলেন না বটে কিন্তু মনে মনে সে আদেশ এক প্রকার মানিয়াই লইলেন। অতঃপর স্থানীয় ভক্তবৃন্দের সহিত সাক্ষাতাদির পর আচার্য্য প্রভু যথা সময়ে যাজিগ্রামে ফিরিয়া আসিলেন।

বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী এবং শ্রীবাস অন্তর্হিত হইলে পর দাস গদাধর আর নবদ্বীপে থাকিতে না পারিয়া, ধামবাসের সুখ ত্যাগ করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে কাটোয়াতে চলিয়া আসেন। সেই হইতে তিনি কাটোয়াতেই বাস করিতেছিলেন। কয়েকদিন যাজিগ্রামে অতিবাহিত করিয়া আচার্য্য প্রভু তাঁহার চরণ দর্শন মানসে কাটোয়াতে আসিলেন। আচার্য্য প্রভু আসিয়া দেখিলেন তাঁহার অবস্থাও সরকার ঠাকুর মহাশয়ের অনুরূপ। তাঁহারও নিরন্তর অশ্রুধারার মধ্যে দিন কাটিতেছে। আচার্য্য প্রভু তাঁহার আশ্রয়ে থাকিয়া কয়েকদিন

ভগবৎ প্রসঙ্গে অতিবাহিত করিয়া পুনরায় যাজিগ্রামে ফিরিয়া আসিলেন। কথিত আছে, দাস গদাধরও তাঁহাকে বিবাহ করিবার জন্য আদেশ করিয়াছিলেন।

লক্ষ্মীপ্রিয়া দেবীর স্নেহচ্ছায়ায় এবং ভক্ত সম্মেলনে দিন এক প্রকার কাটিয়া যাইতে লাগিল। বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইল। সংবাদ পাইয়া বিভিন্ন স্থান হইতে ছাত্রগণ একে একে আসিয়া সমবেত হইতে লাগিলেন। আচার্য্য প্রভু তাহাদের জন্য আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন এবং সযত্নে অধ্যয়ন করাইতে লাগিলেন। ন্যায় বেদান্তাদি দর্শনের শুষ্ক বিচার বিতর্কই তখন গৌড়ীয় ছাত্রগণের অধ্যয়নের বিষয় বস্তু ছিল। তাঁহারা এতদিন পরম সমাদরে তাহারই অনুশীলন করিয়া আসিয়াছেন। আচার্য্য প্রভু এইবার সূক্ষ্ম বিচার বিশ্লেষণ সহকারে শ্রীমন্মহাপ্রভুর সরস ভক্তিবাদটীকে সুদৃঢ় দার্শনিক ভিত্তির উপর স্থাপিত করিয়া ছাত্রগণের সম্মুখে উপস্থিত করিলেন। অখণ্ডনীয় যুক্তি এবং প্রমাণ সহযোগে তিনি ভক্তিবাদের বীজটী ছাত্রগণের মস্তিষ্কে প্রবেশ করাইতে বদ্ধ-পরিকর হইলেন। আচার্য্য প্রভুর পাণ্ডিত্যের খ্যাতি অল্পকালের মধ্যেই চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল এবং ছাত্রগণও দলে দলে আসিয়া যাজিগ্রাম পরিপূর্ণ করিয়া ফেলিল। তখন পূর্ণ উদ্যমে আচার্য্য প্রভু অধ্যাপনায় আত্ম-নিয়োগ করিলেন। ক্রমে বিভিন্ন মতবাদী বিচার প্রার্থী পণ্ডিতগণের আগমন হইতে লাগিল। আচার্য্য প্রভু তাঁহার অসাধারণ শাস্ত্রজ্ঞান এবং অপূর্ব্ব বাগ্মিতার দ্বারায় তাঁহাদের মতবাদ খণ্ডন পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে বিশুদ্ধ ভক্তিবাদে অনুপ্রবিষ্ট করাইতে লাগিলেন। ঘরে ঘরে শ্রীশ্রীনামসঙ্কীর্ত্তনের তরঙ্গ উঠিল। এই সময়ে শ্রীমন্মহাপ্রভুর পরিকর দ্বিজ হরিদাসাচার্য্যের পুত্র শ্রীদাস ও গোকুলানন্দ আসিয়া তাঁহার নিকটে অধ্যয়নে আত্মনিয়োগ করেন। ব্যাসাচার্য্য এবং কৃষ্ণ বল্লভ পূর্ব্ব হইতেই তাঁহার আশ্রয়ে থাকিয়া ভক্তিগ্রন্থ অভ্যাস করিতেছেন।

নরোত্তম ও শ্যামানন্দের বিবরণ

গ্রন্থ সম্পুট অপহৃত হইবার পর ঠাকুর মহাশয় ও শ্যামানন্দ আচার্য্য প্রভুর আদেশ অনুসারে বাধ্য হইয়াই তাঁহাকে গোপালপুরে নিরাশ্রয় অবস্থায় ছাড়িয়া দিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে খেতুরী অভিমুখে যাত্রা করেন। তাঁহাদের অঙ্গে তখন জীর্ণ কৌপীন এবং বহির্ব্বাস, শরীর শীর্ণ ও ধূলি-মলিন, তাঁহাদের অবস্থা দেখিয়া ঠাকুর মহাশয়ের জননা নারায়ণী দেবী কাঁদিয়া আকুল হইলেন। রাজা কৃষ্ণানন্দও পুত্রের প্রতি দৃষ্টি পাত করিয়া মর্ম্মবেদনায় নীরবে অশ্রু মোচন করিলেন। বৃদ্ধ কৃষ্ণানন্দ এইবার পুত্রের করে রাজ্যভার অর্পণ করিয়া অবসর গ্রহণ করিবেন, এই অভিপ্রায় লইয়া তিনি একদিন সুযোগ মত ঠাকুর মহাশয়কে নিকটে বসাইলেন এবং নিজ অভিলাষ ব্যক্ত করিলেন। তিনি তখন বিনীতভাবে অসম্মতি প্রকাশ করিয়া বলিলেন, 'আমি সন্ন্যাস ব্রত অবলম্বন করিয়াছি, অতএব আমার পক্ষে আর বিষয় কার্য্যে লিপ্ত হওয়া উচিত হইবে না, তাহা ব্যতীত এখন রাজ প্রাসাদে বসবাস করাও আমার পক্ষে সম্ভব হইবে না, আমার বসবাসের জন্য আপনি একটী নির্জন স্থানের ব্যবস্থা করিয়া দিন, আমি সেই স্থানে পরম সুখে দিন অতিবাহিত করিব এবং প্রত্যহ আপনাদের শ্রীচরণ দর্শন করিয়া যাইবারও সুযোগ লাভ করিব।'

পিতার সকাতর অনুরোধ, জননী এবং আত্মীয়গণের অশ্রুপাতের পরও যখন ঠাকুর মহাশয়ের সঙ্কল্প কিছুমাত্র টলিল না, তখন তাঁহারা নিরুপায় হইয়াই একটী নির্জন স্থান মনোনীত করিয়া তাঁহার থাকিবার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। কঠোর ব্রহ্মচর্য্য, ত্রিসন্ধ্যা স্নান, দিবারাত্রের মধ্যে মাত্র একবার স্বপাকে হবিষ্যান্ন গ্রহণ এবং নিরন্তর ভজনাবেশের মধ্যে তাঁহার দিন কাটিতে লাগিল। রাজা কৃষ্ণানন্দ বাধ্য হইয়া কনিষ্ঠ ভ্রাতা পুরুষোত্তমের পুত্র সন্তোষ দত্তকে রাজ্যভার প্রদান করিয়া

অবসর গ্রহণ করিলেন। এই সময় বিষ্ণুপুর হইতে গ্রন্থ উদ্ধারের সংবাদ আসিয়া পৌঁছিলে ঠাকুর মহাশয় শ্যামানন্দের সহিত মহা-সমারোহে আনন্দোৎসব করেন। উৎসবের পর তিনি আচার্য্য প্রভুর আদেশ অনুসারে শ্যামানন্দকে উড়িষ্যায় প্রেরণ করিলেন। শ্যামানন্দ কাটোয়া, নবদ্বীপ, শান্তিপুর প্রভৃতি লীলাভূমি সকল ভ্রমণ করিতে করিতে অম্বিকায় আসিয়া শ্রীগুরু দেবের চরণ দর্শন করিলেন এবং পরে সেখান হইতে বিদায় লইয়া উড়িষ্যা অভিমুখে অগ্রসর হইতে হইতে কিছু দিনের মধ্যেই স্বীয় জন্মভূমিতে পদার্পণ করেন। শ্যামানন্দের ভজন প্রভাবে স্থানীয় গ্রামবাসিগণ দলে দলে তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইতে লাগিলেন। অন্যান্য গ্রামের অধিবাসীরাও ক্রমে আসিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইলেন, শ্যামানন্দের প্রভাবে অতি অল্পকালের মধ্যে প্রায় সমগ্র উড়িষ্যাই প্রেম-ধর্ম্মে উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল। এদিকে খেতুরীতেও তদনুরূপ আর একটী তরঙ্গ উঠিল, বিশিষ্ট ব্যক্তি এবং অন্যান্য গ্রামবসিগণ দলে দলে আসিয়া ঠাকুর মহাশয়ের প্রভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া তাঁহার আনুগত্য স্বীকার করিতে লাগিলেন। কিছুদিন পরমানন্দেই অতিবাহিত হইল। তাহার পর বাহিরের আকর্ষণে ঠাকুর মহাশয়ের প্রাণ আবার চঞ্চল হইয়া উঠিল, কয়েক দিনের মধ্যেই তিনি খেতুরী ত্যাগ করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু ও তাঁহার পরিকরগণের লীলাস্থলী সমূহ দর্শনের উদ্দেশ্যে একাকী বহির্গত হইলেন।

খেতুরী হইতে ঠাকুর মহাশয় নবদ্বীপে আসিলেন, প্রভুর বাসগৃহে উপনীত হইয়া সেবক ঈশান এবং দামোদর পণ্ডিতের চরণ বন্দনা করিয়া পরে শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী এবং অন্যান্য যে কয়জন প্রভুর পরিকর তখনও নবদ্বীপে ছিলেন তাঁহাদের সহিত মিলিত হইলেন, পরে তিনি সেখান হইতে শান্তিপুরে আসিলেন। এই স্থানে গঙ্গাপার হইয়া সপ্তগ্রাম, খড়দহ এবং খানাকুল কৃষ্ণনগর হইয়া একেবারে নীলাচলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এখানে আসিয়াই তিনি সর্ব্বাগ্রে গোপীনাথ আচার্য্যের সহিত মিলিত হইলেন। শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের মন্দিরে

আসিয়া শ্রীবিগ্রহ দর্শনের পর জগন্নাথ নামক জনৈক ব্রাহ্মণের সাহায্যে তিনি নীলাচলবাসী গৌর পরিকরগণের দর্শন লাভ করিলেন। হরিদাস ঠাকুর মহাশয়ের সমাধি গদাধর পণ্ডিতের টোটায় শ্রীগোপীনাথজী প্রভৃতি দর্শন করিলেন। গদাধরের টোটায় তদীয় শিষ্য মামুগোঁসাই তাঁহাকে পাইয়া পরম আনন্দ লাভ করেন। পরে তিনি এখান হইতে প্রভুর আবাস গৃহ কাশী মিশ্র ভবনে আগমন করিলেন। এখানে প্রভুর ব্যবহৃত তৃণ শয্যা এবং আসন দর্শন করিয়া ঠাকুর মহাশয় আকুল হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে ভাবাবেগে আছাড় খাইয়া পড়িলেন। বক্রেশ্বর পণ্ডিত মহাশয়ের শিষ্য গোপাল গুরু তখন গম্ভীরার সেবাইত। তাঁহার পরিচয় পাইয়া তিনি ছুটিয়া আসিলেন এবং সযত্নে উঠাইয়া আলিঙ্গন পূর্ব্বক তাঁহাকে নানা প্রকারে প্রবোধ দান করিলেন। ঠাকুর মহাশয় তাঁহার চরণ বন্দনা করিলেন পরে তাঁহার নিকট হইতে বিদায় লইয়া তিনি অন্যান্য ভক্তগণের সহিত মিলিত হইলেন। শ্রীক্ষেত্রে তাঁহার কয়েক দিন পরমানন্দে অতিবাহিত হইল। কথিত আছে এই সময় নীলাচলে তিনি স্বপ্নযোগে একদিন সপার্ষদ শ্রীমন্মহাপ্রভুর দর্শন এবং উপদেশ লাভ করেন। এখান হইতে তিনি যাজপুর হইয়া গোপীবল্লভ পুরে গমন করেন, পরে সেখান হইতে নৃসিংহপুরে আসিয়া শ্যামানন্দের সহিত মিলিত হ'ন।

ঠাকুর মহাশয় নৃসিংহপুরে আসিয়া শ্যামানন্দের প্রভাব দর্শনে পরম আনন্দিত হইলেন। উড়িষ্যাবাসিগণ তাঁহার বৈরাগ্য এবং প্রেমানুরাগে আকৃষ্ট হইয়া দলে দলে তাঁহার নিকটে আসিয়া আত্মসমর্পণ পূর্ব্বক প্রেম ধর্ম্মে অনুরাগী হইয়াছেন। স্থানীয় জমিদার, পণ্ডিত, দস্যু, লম্পট এমনকি প্রতিষ্ঠিত মুসলমান রাজপ্রতিনিধিগণের মধ্যেও অনেকে তাঁহার নিকটে দীক্ষা গ্রহণ করিয়া বিশুদ্ধ ভক্তিমার্গে অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছেন। সুবর্ণরেখার তীরবর্ত্তী রয়ণী গ্রামের জমিদার রাজা অচ্যুতানন্দের পুত্র রসিকানন্দ এবং মুরারি আসিয়া শ্যামানন্দের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছেন। গোপীবল্লভ পুরে শ্রীগোবিন্দ দেবের সেবা

প্রকাশিত হইয়াছে এবং রসিকানন্দ নিজেই এই সেবার ভার গ্রহণ করিয়াছেন। ঠাকুর মহাশয় শ্যামানন্দের কীর্ত্তি সমূহ দর্শন করিতেছেন এবং লোক মুখে তাঁহার গুণগরিমার কাহিনী শ্রবণ করিতেছেন, আর আনন্দে পুলকিত হইয়া প্রভুর করুণার জয় দিতেছেন। 'ঠাকুর মহাশয়ের শুভাগমন হইয়াছে,' এই সংবাদ অল্প সময়ের মধ্যেই চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়িল। শ্যামানন্দের শিষ্যগণ সংবাদ পাইয়া উড়িষ্যার নানাস্থান হইতে আগমন পূর্ব্বক তাঁহার সহিত মিলিত হইতে লাগিলেন। তাঁহার আগমন উপলক্ষ্যে ভক্তগণ একটী বিরাট আনন্দ উৎসবের আয়োজন করিলেন। শ্যামানন্দ তাঁহার শিষ্যবৃন্দ এবং অন্যান্য ভক্ত-গণের সহিত কয়েক দিবস পরমানন্দে অতিবাহিত করিয়া একদিন ঠাকুর মহাশয় তাঁহাদের নিকট হইতে বিদায় লইয়া গৌড় অভিমুখে যাত্রা করিলেন। যাত্রার পূর্ব্বে শ্যামানন্দকে বলিয়া গেলেন—'তুমি একবার নীলাচলে যাইয়া সকলের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আসিবে। তোমার সহিত মিলিত হইবার জন্য তাঁহারা ব্যগ্র হইয়া রহিয়াছেন। আমি খেতুরী হইতে যথা সময়ে পত্র দিলে পর তুমি আমার নিকটে চলিয়া যাইবে।'

ঠাকুর মহাশয় নৃসিংহপুর হইতে বহির্গত হইয়া ক্রমাগত পথ চলিতে চলিতে গৌড়রাজ্যে আসিয়া প্রবেশ করিলেন। প্রথমে শ্রীখণ্ডে আসিয়া রঘুনন্দন ও সরকার ঠাকুর মহাশয়ের চরণ দর্শন করিলেন। পরে তাঁহাদের নিকট হইতে বিদায় লইয়া যাজিগ্রাম অভিমুখে রওনা হইলেন এবং যথা সময়ে আচার্য্য প্রভুর গৃহদ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আচার্য্য প্রভু নিবিষ্টচিত্তে ছাত্রগণকে অধ্যয়ন করাইতে ছিলেন; এমন সময় কে একজন আসিয়া তাঁহাকে সংবাদ দিল যে ঠাকুর মহাশয় আসিয়াছেন, 'নরোত্তম আসিয়াছেন' এই কথাটী শুনিয়াই আচার্য্য প্রভু আনন্দের আতিশয্যে গ্রন্থ রাখিয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া বাহিরে আসিলেন। ঠাকুর মহাশয় নিকটেই দাঁড়াইয়া ছিলেন, তাঁহাকে সম্মুখে দেখিয়া ঠাকুর মহাশয় অগ্রসর হইয়া তাঁহার চরণে পড়িতে

উদ্যত হইলে আচার্য্য প্রভু তাঁহাকে উঠাইয়া সাগ্রহে বুকে জড়াইয়া ধরিলেন। বহুদিন পর আজ পরস্পরের মিলন হইল, উভয়ের হৃদয়ে আনন্দের তরঙ্গ খেলিতে লাগিল। গ্রন্থ চুরির হৃদয় বিদারক ঘটনার পর হইতেই তাঁহারা পরস্পর বিচ্ছিন্ন, বহুদিনের পর আজিকার এই মিলনের অশ্রু ধারায় তাঁহাদের অন্তরের বিরহ জ্বালার অবসান ঘটিল।

আচার্য্য প্রভু অতঃপর ঠাকুর মহাশয়কে পরম স্নেহভরে গৃহের মধ্যে আনিয়া বসাইলেন। জননী দেবী, ব্যাসাচার্য্য, কৃষ্ণবল্লভ এবং অন্যান্য সকলের সহিত একে একে তাঁহার পরিচয় করাইয়া দেওয়া হইল। যাজিগ্রামে কয়েক দিন পরমানন্দেই কাটিয়া গেল। একদিন ঠাকুর মহাশয় কথা প্রসঙ্গে আচার্য্য প্রভুকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন— 'আমার বড়ই অভিলাষ যে খেতুরীতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিয়া সেবা প্রকাশ করি। আপনার অনুমতির অপেক্ষায় কার্য্য আরম্ভ হয় নাই। আদেশ বাক্য পাইলেই কার্য্য আরম্ভ করিতে পারি। তাঁহার এই প্রস্তাবে আচার্য্য প্রভু সম্মতি প্রকাশ পূর্ব্বক বলিলেন 'যত শীঘ্র সম্ভব শুভ কার্য্যের আয়োজন কর। আমি যথা সময়েই সকলকে লইয়া উপস্থিত হইব।'

কয়েক দিন পর ঠাকুর মহাশয় আচার্য্য প্রভুর নিকটে অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক যাজিগ্রাম হইতে বিদায় লইয়া কাটোয়াতে আসিলেন। দাস গদাধর ও তদীয় শিষ্য যতুনন্দন চক্রবর্ত্তী এবং স্থানীয় ভক্তগণের সহিত মিলিত হইলেন এবং পরে প্রভুর সন্ন্যাস ভূমি, কেশব ভারতীর আশ্রম এবং অন্যান্য দ্রষ্টব্য স্থানগুলি দর্শন করিয়া তিনি সেখান হইতে শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর জন্মভূমি একচক্রা গ্রামে আগমন করিলেন, পরে তিনি সেখান হইতে পুনরায় খেতুরীতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

মাতৃদেবীর অপ্রকট এবং আচার্য্য প্রভুর বিবাহ।

আচার্য্য প্রভুকে নিকটে পাইয়া লক্ষ্মীপ্রিয়া দেবীর মনের সকল ক্ষোভ চলিয়া গিয়াছে, এখন তাঁহার শেষ ইচ্ছা এই যে তাঁহার একমাত্র সন্তান শ্রীনিবাস অন্যান্য সকলের ন্যায় বিবাহ করিয়া সংসারী হয়। আচার্য্য প্রভুর নিকটে এবং গ্রামবাসী বিশিষ্ট আত্মীয়গণের নিকটে তিনি নানাভাবে আপনার এই ইচ্ছার প্রকাশিত করিয়াছিলেন বটে কিন্তু এই বিবাহ ব্যাপারে আচার্য্য প্রভুর সম্মতি না থাকায় তাঁহাদের মনোবাসনা এতদিন পূর্ণ হয় নাই। বৃদ্ধা জননীর একান্ত আগ্রহ যদিও আচার্য্য প্রভুকে এ বিষয়ে প্রায় সম্মত করাইয়াই আনিয়াছিল তথাপি জননীর মনের বাসনা আর পূর্ণ হইল না, সন্তানের বিবাহ দেখিয়া যাইবার আর তাঁহার সুযোগ হইল না। নানা প্রকার শোক তাপে তাঁহার জরাগ্রস্ত শরীর ক্রমেই শীর্ণ ও দুর্ব্বল হইয়া আসিতে ছিল, অকস্মাৎ মাঘ মাসে একদিন তিনি সজ্ঞানে নিত্য লীলায় প্রবিষ্টা হইলেন। জননীর এই আকস্মিক অন্তর্ধানে আচার্য্য প্রভু বড়ই বিমর্ষ এবং কাতর হইয়া পড়িলেন। বহু কষ্টে বিচলিত হৃদয়কে সংযত করিয়া তিনি শ্রাদ্ধাদি কার্য্যের আয়োজনে উদ্যোগী হইলেন। যথা সময়ে আত্মীয় স্বজন, প্রভুরগণ এবং অন্যান্য ভক্তবৃন্দকে গৃহে নিমন্ত্রণ করিয়া আনয়ন করা হইল। রাজা বীরহাম্বীর সংবাদ পাইয়া প্রচুর দ্রব্যাদি সহ তাঁহার প্রতিনিধিগণকে প্রেরণ করিলেন। সকলের সহযোগিতায় আচার্য্য প্রভু পরম সমারোহের সহিত মাতৃকার্য্য সুসম্পন্ন করিলেন। পরে উৎসবান্তে মোহান্ত, বৈষ্ণব এবং অন্যান্য অতিথিগণ একে একে বিদায় গ্রহণ করিয়া চলিয়া গেলেন। এই উৎসব উপলক্ষ্যে রঘুনন্দনও আসিয়াছিলেন। শ্রীখণ্ড যাত্রার পূর্ব্বে রঘুনন্দন এবং সুলোচন একদিন নির্জনে আচার্য্য প্রভুকে বসাইয়া

বলিলেন 'মাতৃদেবী নিত্য লীলায় প্রবিষ্টা হইলেন, তোমাকে সংসার ধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত করিয়া যাইবার তাঁহার একান্ত ইচ্ছা ছিল, সে আশা তাঁহার সফল হইল না যাহা হউক, আমাদেরও এই ইচ্ছা যে তুমি বিবাহ করিয়া আদর্শ সংসার প্রতিষ্ঠা কর এবং যাজিগ্রামে থাকিয়া গ্রন্থ প্রচার ও নাম সঙ্কীর্ত্তনাদির দ্বারা জগজ্জীবের কল্যাণ সাধনে ব্রতী হও।' অদ্বৈত আচার্য্য প্রভুর স্বপ্নাদেশ, সরকার ঠাকুর মহাশয়ের আদেশ এবং জননীর শেষ ইচ্ছার কথা স্মরণ করিয়া আচার্য্য প্রভু এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে আর প্রতিবাদ করিতে সাহসী হইলেন না। মৌন-ভাবে থাকিয়া সে আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া লইলেন। তাঁহার সমর্থনের ইঙ্গিত অবগত হইয়া রঘুনন্দন এবং স্থলোচন সন্তুষ্ট চিত্তে শ্রীখণ্ডে ফিরিয়া আসিলেন এবং সেখান হইতে কন্যা নির্ব্বাচনে উদ্যোগী হইলেন। গোপাল চক্রবর্ত্তী নামে এই যাজিগ্রামেই জনৈক ব্রাহ্মণের বসতি ছিল ভক্তি পরায়ণতা ও সরলতার গুণে বশীভূত হইয়া গ্রামবাসিগণ সকলেই তাঁহাকে প্রীতির চক্ষে দেখিতেন। দ্রৌপদী নাম্নী তাঁহার একটী স্বরূপা এবং স্থলক্ষণা কন্যা ছিলেন। তাঁহার রূপে গুণে মুগ্ধ হইয়া রঘুনন্দন পরম আগ্রহ সহকারে তাঁহারই সহিত আচার্য্য প্রভুর সম্বন্ধ স্থির করিলেন। শুভ বৈশাখের কৃষ্ণা তৃতীয়া তিথিতে পরিণয় কার্য্য মহা সমারোহে সুসম্পন্ন হইল। দাস গদাধর এবং সরকার ঠাকুর মহাশয় এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া পরম প্রীত হইলেন। চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের দুই পুত্র শ্যামদাস এবং রামচরণ, আচার্য্য প্রভুর নিকটে দীক্ষা গ্রহণ পূর্ব্বক তাঁহার আশ্রয়ে থাকিয়া অধ্যয়নে আত্ম-নিয়োগ করিলেন। কিছুদিন পর চক্রবর্ত্তী মহাশয়ও আচার্য্য প্রভুর নিকটে দীক্ষা গ্রহণ পূর্ব্বক শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রদর্শিত পথে ভক্তি যাজনে প্রবৃত্ত হ'ন। আচার্য্য প্রভু বিবাহ বাসরেই শ্রীমতী দ্রৌপদী দেবীকে দীক্ষা দান করেন এবং তাহার পর হইতেই তিনি ঈশ্বরী ঠাকুরাণী নামে সকলের নিকট পরিচিতা হইলেন।

রামচন্দ্র কবিরাজের সহিত মিলন।

পাণ্ডিত্যের খ্যাতি প্রতিপত্তিতে অর্থ সম্পদে এবং চিকিৎসা বিদ্যায় তখন শ্রীখণ্ডের বৈদ্য সমাজের নাম সুদূর প্রসারী ছিল। বিভিন্ন দেশের পণ্ডিতগণ অনেক সময় শাস্ত্র যুদ্ধের অভিলাষে তাঁহাদের নিকটে আসিতেন এবং পরাজয় স্বীকার করিয়া যাইতেন। দামোদর পণ্ডিত তখন এই সমাজের শীর্ষ স্থানীয় ব্যক্তিগণের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। তাঁহার প্রতিভা শুধু শাস্ত্র জ্ঞানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। সেই অসাধারণ শাস্ত্র জ্ঞানের সহিত অপূর্ব্ব কবিত্ব শক্তি মিলিত হইয়া তাঁহার খ্যাতিকে অধিকতর বিকশিত করিয়া দিয়াছিল। জনৈক দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত এক সময় শাস্ত্র যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া তাঁহার অপূর্ব্ব বাগ্মিতা, জ্ঞান এবং কবিত্ব প্রতিভার নিকটে পরাজয় স্বীকার করিতে বাধ্য হ'ন। তখন বিদ্বেষের বশীভূত হইয়া তিনি দামোদরকে অভিশাপ দিয়াছিলেন—"জীবনে পুত্র মুখ দর্শনের সৌভাগ্য তোমার কখনও হইবে না।" দামোদর, পণ্ডিত ছিলেন কিন্তু অহঙ্কারী ছিলেন না। ব্রাহ্মণের ক্রোধ শান্ত করিবার নিমিত্ত তিনি তাঁহার চরণে পড়িয়া ক্ষমা ভিক্ষা চাহিলেন। দামোদরের বিনয় নম্র ব্যবহারে তাঁহার ক্রোধ শান্ত হইল এবং ঈষৎ লজ্জিতও হইলেন, কিন্তু অভিশাপ আর ফিরাইয়া লইলেন না, তবে প্রসন্ন হইয়া বলিলেন—'তুমি অচিরকালের মধ্যেই একটী সর্ব্বগুণ সম্পন্না কন্যা লাভ করিবে, তোমার পুত্রের অভাব সেই কন্যাই পূর্ণ করিবে, দুইটী ক্ষণ জন্মা পুরুষ তাঁহার গর্ভে আবির্ভূত হইবেন, তাঁহাদের দ্বারায় তাঁহাদের মাতৃকুল এবং পিতৃকুল উভয়ই ধন্য হইবে।'

দামোদরের সেই কন্যাই সুনন্দা দেবী। গঙ্গা তীরবর্ত্তী কুমার হট্ট গ্রামের বিখ্যাত সেন বংশোদ্ভব শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলা পরিকর চিরঞ্জীব সেনের সহিত দামোদর তাঁহার একমাত্র কন্যার বিবাহ দিয়া

তাঁহাকে পতি গৃহে প্রেরণ করিয়াছিলেন। কিন্তু কন্যার বিরহে দামোদর একান্ত কাতর হইয়া পড়িলে চিরঞ্জীব, নিরুপায় হইয়াই কুমার হট্ট ছাড়িয়া শ্রীখণ্ডে চলিয়া আসেন এবং সেইখানেই সপরিবারে বসবাস করিতে বাধ্য হন। এইখানেই ১৪৫৮ শকের বৈশাখী শুক্লা তৃতীয়াতে এবং ১৪৫৯ অথবা ১৪৬১ * শকের ফাল্গুনী শুক্লা ত্রয়োদশীতে সুনন্দা দেবীর গর্ভে পর পর পরম রূপবান্ ও সর্ব্বসুলক্ষণ যুক্ত দুইটী পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহাদের নাম করণ করা হইল রামচন্দ্র ও গোবিন্দ। এই পুত্রদ্বয় ব্যতীত সুনন্দা দেবীর গর্ভে রাসেশ্বরী নামে এক কন্যা জন্মগ্রহণ করেন, প্রসিদ্ধ পদকর্ত্তা বলরাম দাস তাঁহারই সন্তান। রামচন্দ্র ও গোবিন্দের জন্মগ্রহণের কয়েক বৎসর পর, তাঁহাদের বিদ্যাভ্যাসের কাল সমাগত হইলে দামোদর এবং চিরঞ্জীব তাঁহাদের সুশীলতা এবং তীক্ষ্ণমেধা দর্শন করিয়া উভয়েই তাঁহাদিগকে যত্ন সহকারে শাস্ত্র অধ্যয়ন করাইতে আরম্ভ করিলেন। স্বজাতীয় বৃত্তি আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষাও সঙ্গে সঙ্গে চলিতে লাগিল। চিরঞ্জীব তাঁহার সন্তানগুলিকে উপযুক্ত দেখিয়া যাইবার সুযোগ পান নাই। ভগবৎ বিধান অনুসারে তাঁহার এই অপরিণত বয়স্ক সন্তানগুলিকে এবং সুনন্দা দেবীকে দামোদরের নিকটে সমর্পণ করিয়া দিয়া তিনি অকালেই ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন। দামোদরও পিতৃহীন বালক রামচন্দ্র এবং গোবিন্দের বিদ্যা দানের ভার সম্পূর্ণরূপে স্বহস্তেই তুলিয়া লইলেন সুনন্দা দেবী তাঁহার সন্তান সন্ততিগণকে লইয়া স্থায়ীভাবে পিতৃ গৃহেই অবস্থান করিতে লাগিলেন। রামচন্দ্র ও গোবিন্দ গভীর মনোযোগ সহকারে বিদ্যাভ্যাস করিতে করিতে অল্পকালের মধ্যেই তাঁহারা সর্ব্ব শাস্ত্রে সবিশেষ পারদর্শী হইলেন। দামোদর অতি তেজস্বী

* গৌড়ীয় বৈষ্ণবজীবন গ্রন্থের উক্তি অনুসারে রামচন্দ্রের জন্ম—১৪২৮ শকাব্দ এই সিদ্ধান্ত যুক্তি সঙ্গত মনে হয় না।
বঙ্গভাষা ও সাহিত্য গ্রন্থের সিদ্ধান্ত অনুসারে গোবিন্দের জন্ম ১৫৩৭ খৃষ্টাব্দে অর্থাৎ ১৪৫৯ শকাব্দায়। এই মত গ্রহণ যোগ্য হইতে পারে।

শক্তি-সাধক ছিলেন ; আর চিরঞ্জীব ছিলেন পরম বৈষ্ণব ভাবাপন্ন শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পরিকর। চিরঞ্জীবের ভাবধারা রামচন্দ্রকে অনুপ্রাণিত করিল, আর গোবিন্দ দামোদরের প্রভাবে শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত হইলেন। পরে, দামোদর পরলোক গমন করিলে সুনন্দা দেবী তাঁহার সন্তান সন্ততিগণকে লইয়া পুনরায় কুমার হট্টে আসিয়া বসবাস করেন।

যাজিগ্রামে আচার্য্য প্রভুর বাটীর পশ্চিম পার্শ্বে একটী সরোবর ছিল, শিষ্য পরিবেষ্টিত হইয়া তিনি একদিন সেই সরোবরের তীরে একটী বৃক্ষের নীচে ভগবৎ প্রসঙ্গে মত্ত হইয়া বসিয়া আছেন, এমন সময় দেখা গেল পরম রূপবান্ এক তরুণ বাদ্য ভাণ্ডাদি সহ দোলারোহণে চলিয়াছেন, পার্শ্বে তাঁহার নব বিবাহিতা বধূ। সকলে বুঝিলেন তরুণ বিবাহ করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিতেছেন। আচার্য্য প্রভু সেইদিকে সকৌতুকে তাকাইয়া বসিয়া রহিলেন। দোলা ক্রমে নিকটবর্ত্তী হইল। তরুণের দৃষ্টিও তখন আচার্য্য প্রভুর মুখের উপর নিবদ্ধ হইল এবং মুহূর্ত্তের জন্য পরস্পরের দৃষ্টি বিনিময় ঘটিয়া গেল, আর সঙ্গে সঙ্গে যুবকের হৃদয়ে যেন তড়িৎ খেলিয়া গেল, তিনি অভিভূতের ন্যায় দোলার উপরে বসিয়া রহিলেন। দোলা অগ্রসর হইতে হইতে ক্রমে আচার্য্য প্রভুর নিকটে আসিল ; যুবক দেখিলেন উপবিষ্ট মহাপুরুষের বদন মণ্ডলে যেন বেদনার অভিব্যক্তি ফুটিয়া উঠিয়াছে। আচার্য্য প্রভু তখন বেদনাহত কণ্ঠে তাঁহার শিষ্যগণকে বলিতে ছিলেন—'দেখ দেখ, ছেলেটীর কি অপরূপ লাবণ্যময় যৌবনোদ্দীপ্ত কলেবর, দেখিলে দেব-শরীর বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু এই রূপ-যৌবন গোবিন্দ সেবায় না লাগাইয়া কামিনী সেবায় উৎসর্গীকৃত হইবে ? এই সুন্দর জন্মটী নষ্ট হইয়া যাইবে, এ কথা ভাবিলেও দুঃখ হয়।' তরুণের কর্ণে কথা কয়টী প্রবিষ্ট হইয়া তাঁহার সুপ্ত বৈরাগ্যানলটিকে জ্বালিয়া দিয়া তাঁহাকে সচেতন করিয়া দিল। দামোদরের দৌহিত্র রামচন্দ্র বিবাহ করিয়া ফিরিতে ছিলেন। কিন্তু গৃহে যিনি ফিরিয়া আসিলেন তিনি

আর পূর্ব্বের রামচন্দ্র নহেন। আচার্য্য প্রভুর সেই বেদনাহত সপ্রেম দৃষ্টি এবং তাঁহার মুখ নিঃসৃত সেই সতর্কবাণী তাঁহার অন্তরে তখন বৈরাগ্যের আগুন জ্বালিয়া দিয়াছে। মায়া স্বপ্নের ঘোর কাটিয়াছে, অন্তরে আসিয়াছে অনুশোচনার প্রবাহ, সেই মহাপুরুষের চরণ যুগলে আশ্রয় লাভের নিমিত্ত তাঁহার প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে। গৃহে আসিয়া রামচন্দ্র সেই অবস্থাতেই কোনও প্রকারে কয়েক দিন কাটাইলেন। পরে একদিন নির্জনতার সুযোগ পাইয়া গৃহ ত্যাগ করিলেন। আচার্য্য প্রভুর কৃপা কটাক্ষে রামচন্দ্রের মায়া বন্ধন কাটিয়া গেল।

পূর্ব্ব দৃষ্ট মহাপুরুষের সন্ধান করিতে করিতে রামচন্দ্র যাজিগ্রামে আসিয়া এক ব্রাহ্মণের গৃহে উপস্থিত হইলেন। সেই ব্রাহ্মণের নিকটে সংবাদ পাইলেন, সেই মহাপুরুষ শ্রীখণ্ডে গমন করিয়াছেন এবং অবিলম্বেই ফিরিয়া আসিবেন। রামচন্দ্র তখন নিরুপায় হইয়া উদ্বিগ্ন ভাবে সে রাত্রি সেই ব্রাহ্মণের গৃহেই অতিবাহিত করিলেন। পর দিবস আচার্য্য প্রভু ফিরিয়া আসিলে রামচন্দ্র তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে চরণ জড়াইয়া পড়িলেন। আচার্য্য প্রভু তাঁহাকে দেখিয়াই চিনিতে পারিলেন এবং পরম স্নেহ সহকারে তুলিয়া আলিঙ্গনে আবদ্ধ করিলেন। উভয়ের নয়ন ধারায় উভয়ের দেহ সিক্ত হইতে লাগিল। অশ্রু-সিক্ত কণ্ঠে আচার্য্য প্রভু বলিলেন 'যেদিন তোমাকে প্রথম দেখিলাম সেইদিন হইতেই আমি কাঁদিতেছি। তোমাকে পাইবার আশায় প্রভুর চরণে কাঁদিয়া কাঁদিয়া সেইদিন হইতে কত প্রার্থনা করিয়াছি, আজ তুমি আসিয়াছ, আজ প্রভু আমার আশা পূর্ণ করিয়াছেন।' এই কথা বলিতে বলিতে আচার্য্য প্রভু অশ্রু মোচন করিতে লাগিলেন, রামচন্দ্র অধীর হইয়া ব্যাকুলভাবে কাঁদিতে লাগিলেন।

রামচন্দ্র আর গৃহে ফিরিলেন না। যথাবিধি দীক্ষা গ্রহণ করিয়া তিনি আচার্য্য প্রভুর চরণে কায় মনোবাক্যে আত্মসমর্পণ করিলেন।

শ্রীগুরু সেবা, বৈষ্ণব-শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন এবং নিয়মিত ভজনের মধ্যে তাঁহার দিন কাটিতে লাগিল। অসাধারণ অধ্যবসায়ের ফলে রামচন্দ্র অতি অল্পকালের মধ্যে বৈষ্ণব শাস্ত্রে সবিশেষ পাণ্ডিত্য লাভ করিলেন। কিন্তু কেবল এই পাণ্ডিত্যই তাঁহার গৌরবের পরিচায়ক নহে। রামচন্দ্রের চরিত্র গুরু নিষ্ঠার একটী জ্বলন্ত উদাহরণ। গুরু নিষ্ঠার এই বৈশিষ্ট্যই তাঁহার 'নামটীকে বৈষ্ণব জগতে চির উজ্জ্বল করিয়া রাখিবে। আচার্য্য প্রভু নিজেও স্বেচ্ছায় বহু প্রকার ঘটনার অবতারণা করিয়া পরীক্ষার ছলে, রামচন্দ্রের গুরু নিষ্ঠার প্রকৃত স্বরূপটী কি, তাহা নিজেই প্রকাশ করিয়া দেখাইয়াছেন। আত্ম-শুদ্ধির নিমিত্ত আমরা যথা সময়ে সে বিষয়ে আলোচনা করিয়া যথাসাধ্য আস্বাদন করিবার চেষ্টা করিব।

দ্বিতীয়বার বৃন্দাবন গমন।

একদিন নীলাচল হইতে দুইজন ছাত্র অধ্যয়নার্থে যাজিগ্রামে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আচার্য্য প্রভু তাঁহাদের নিকটে শ্রবণ করিলেন—'আর যে কয়জন গৌর পরিকর প্রকট ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই লীলা সংবরণ করিয়াছেন। শ্যামানন্দ তাঁহাদের শ্রীচরণ দর্শন লাভের আশায় নীলাচলে গিয়াছিলেন। কিন্তু দর্শন না পাইয়া অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়েন এবং কোনও প্রকারে স্থির হইতে না পারিয়া শ্রীধাম বৃন্দাবন অভিমুখে চলিয়া গিয়াছেন।' সংবাদ শ্রবণ করিয়া আচার্য্য প্রভু অত্যন্ত বিচলিত হইয়া পড়িলেন এবং ভবিষ্যতের চিন্তায় তাঁহার অন্তর দুঃখে ও নিরাশায় ভরিয়া উঠিল। তাঁহার চিত্ত ক্রমশঃ উদাস ভাব ধারণ করিতে লাগিল। ইতোমধ্যে পর পর আরও কয়েকটী শোকাবহ ঘটনায় তাঁহাকে অত্যন্ত বিহ্বল করিয়া ফেলিল। নবদ্বীপ হইতে শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী প্রভৃতি কয়েকজনের অপ্রকট সংবাদ আসিল। এদিকে কাটোয়া হইতে সংবাদ আসিল

যে কার্ত্তিকী কৃষ্ণা অষ্টমী দিবসে দাস গদাধর অকস্মাৎ লীলা-প্রবিষ্ট হইয়াছেন। আচার্য্য প্রভুর অন্তরের স্থৈর্য্য নষ্ট হইয়া গেল। হয়ত বৃন্দাবনেও কিছু অমঙ্গল ঘটিয়া থাকিবে এইরূপ আশঙ্কায় তিনি ভীত ও শঙ্কিত হইয়া অনতি বিলম্বে শ্রীধাম রওনা হইবার নিমিত্ত ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। ইতোমধ্যে একদিন শ্রীখণ্ড হইতে আবার এক মর্ম্মান্তিক দুঃসংবাদ আসিল—গত অগ্রহায়ণের কৃষ্ণা একাদশী তিথিতে সরকার ঠাকুর মহাশয় অন্তর্হিত হইয়াছেন।' অকস্মাৎ এই সংবাদ শ্রবণে তিনি হাহাকার করিয়া শিরে করাঘাত করিতে করিতে ব্যাকুল হইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। ঠাকুরাণী, রামচন্দ্র এবং অন্যান্য ছাত্রগণ কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁহাকে শান্ত করিবার নিমিত্ত চেষ্টা করিতে লাগিলেন কিন্তু আচার্য্য প্রভুর অন্তর সান্ত্বনায় প্রবোধ মানিলনা অনাবৃত ভূমিতে পড়িয়া তিনি কাঁদিতেছেন আর নয়নের জলে শুষ্ক ভূমি কর্দ্দমাকার ধারণ করিতেছে। সমস্ত দিবস এইরূপেই কাটিল। রাত্রি আসিল, রাত্রির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার অস্থিরতাও ক্রমে বাড়িতে লাগিল। অবশেষে শেষ রাত্রে কাঁদিতে কাঁদিতে তিনি যেন একটু নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন। এই সময় দাস গদাধর এবং সরকার ঠাকুর মহাশয় স্বপ্নে আবির্ভূত হইয়া আলিঙ্গন পূর্ব্বক তাঁহাকে নানাভাবে প্রবোধ দান করিয়া গেলেন।

রাত্রি প্রভাত হইল আচার্য্য প্রভু উঠিয়া বসিলেন এবং নতমস্তকে কি যেন চিন্তা করিলেন। ক্ষণকাল পরে কর্ত্তব্য স্থির করিয়া ইঙ্গিতে রামচন্দ্রকে ডাকিয়া গোপনে কয়েকটী কথা বলিলেন। তাহার পর আর কাহাকেও কিছু না বলিয়া সেই অবস্থাতেই অকস্মাৎ উঠিয়া বৃন্দাবন অভিমুখে যাত্রা করিলেন। তাঁহাকে নিবারণ করিতে কেহই সাহসী হইলেন না। কিছুদূর তাঁহার অনুগমন করিয়া সকলে কাঁদিতে কাঁদিতে ফিরিয়া আসিলেন।

আজ শ্রীপঞ্চমী তিথি, শ্রীধাম বসন্তোৎসবের কলরবে মুখরিত। সেই উপলক্ষ্যে গোস্বামী পাদগণ অনেকেই গোবিন্দ মন্দিরে আসিয়া

সমবেত হইয়াছেন। এই সময় আচার্য্য প্রভু অনশনে ও অর্দ্ধাশনে শীর্ণ কলেবর হইয়া, দীন ও মলিন বেশে শ্রীধামে প্রবেশ করিয়া একেবারে গোবিন্দ মন্দিরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং অপ্রত্যাশিত ভাবে এখানে গোস্বামিগণকে দেখিয়া সকলের চরণ বন্দনা করিলেন। তাঁহারাও অকস্মাৎ আচার্য্য প্রভুকে পাইয়া পরম আনন্দিত হইলেন এবং একে একে সকলেই সস্নেহে আলিঙ্গন দান করিলেন। পরে তাঁহারা আচার্য্য প্রভুর নিকট হইতে দাস গদাধর, সরকার ঠাকুর মহাশয় এবং নীলাচলের অন্যান্য ভক্তগণের অদর্শন সংবাদ শ্রবণ করিয়া সকলেই শোকে অধীর হইয়া অশ্রু মোচন কারতে লাগিলেন। এদিকে দ্বিজ হরিদাসাচার্য্যও অপ্রকট হইয়াছেন। আচার্য্য প্রভু এই সংবাদ গোস্বামিগণের নিকট হইতে শ্রবণ করিলেন। উপর্য্যুপরি দুঃসংবাদের মধ্যে সম্মিলনের আনন্দ ম্লান হইল। আচার্য্য প্রভু পথশ্রমে ক্লান্ত, তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া গোস্বামিগণ ধৈর্য্য অবলম্বন করিলেন এবং নানা প্রকারে তাঁহাকে প্রবোধ দান করিয়া শ্রীজীবের সহিত তাঁহার কুটিরে পাঠাইয়া দিলেন।

কয়েক দিনের মধ্যে শ্যামানন্দও আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আচার্য্য প্রভু এবং গোস্বামিগণ তাঁহাকে পাইয়া পরম আনন্দিত হইলেন। শ্রীজীব ইতোমধ্যে যে সমস্ত গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন সেগুলি তিনি উভয়কে পাঠ করিয়া শুনাইলেন। প্রসিদ্ধ গ্রন্থ শ্রীগোপাল চম্পূর রচনাও তখন আরম্ভ হইয়াছে। ইহার কিয়দংশ শ্রবণ করিয়া তাঁহারা পরম পুলকিত হইলেন। প্রত্যহ যথা নিয়মে শ্রীগুরু সেবা, শাস্ত্র আলোচনা এবং দর্শন পরিক্রমাদিতে দিন চলিতে লাগিল। এক মাস এইরূপেই কাটিয়া গেল।

এদিকে রামচন্দ্র আচার্য্য প্রভুর বিরহে ক্রমে অধীর হইয়া উঠিলেন, অন্যান্য ছাত্র ও শিষ্যগণের অবস্থাও তদ্রূপ। ঠাকুরাণীও তাঁহাকে অপ্রকৃতিস্থ অবস্থায় ছাড়িয়া দিয়া দুশ্চিন্তায় একরূপ অনাহারে ও অনিদ্রায় কাল কাটাইতেছেন। সরকার ঠাকুর মহাশয়ের

বিরহে রঘুনন্দনের হৃদয় পুড়িতে ছিল। নিরন্তর অশ্রুপাত এবং হাহুতাশের মধ্যে কোনও প্রকারে তাঁহার দিন কাটিতে ছিল। এই সময় আচার্য্য প্রভু নিকটে থাকিলেও তিনি অনেকটা সান্ত্বনা পাইতেন। তিনি শ্রীধামে চলিয়া যাওয়ায় রঘুনন্দন যেন আরও বিমর্ষ হইয়া পড়িয়া ছিলেন। তিনি একদিন রামচন্দ্রকে ডাকিয়া আনাইলেন এবং বলিলেন 'তোমাকে একবার শ্রীধামে গমন করিতে হইবে। সেখান হইতে অবিলম্বে শ্রীনিবাসকে ফিরাইয়া আনিতে হইবে।' রামচন্দ্র বৃন্দাবন যাইবার নিমিত্ত মনে মনে সঙ্কল্প করিয়াই ছিলেন। এখন রঘুনন্দনের আদেশ পাইয়া তিনি সানন্দে যাত্রা করিলেন। পথে গয়া, কাশী, অযোধ্যা, প্রয়াগ প্রভৃতি দর্শন করিতে করিতে রামচন্দ্র একদিন যথাসময়ে শ্রীধামে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শ্রীধামে আসিবার কয়েকদিন পরেই আচার্য্য প্রভু শ্যামানন্দকে পাইয়াছেন এইবার রামচন্দ্রকেও পাইলেন।

রামচন্দ্রের পাণ্ডিত্য এবং অসাধারণ গুরুনিষ্ঠার সংবাদ ইতঃপূর্ব্বে গোস্বামিগণ শুনিয়াছিলেন। রামচন্দ্রের আগমনে তাঁহারাও পরম আনন্দিত হইলেন। আচার্য্য প্রভুর বিবাহের কথা গোস্বামিগণ জানিতেন। কথিত আছে ইহাতে অনেকেই বিশেষতঃ গোপালভট্ট প্রভু কিছু অসন্তোষ প্রকাশ করিয়াছিলেন।* তাঁহারা রামচন্দ্রের নিকটে আচার্য্য প্রভুর বিবাহের উপযুক্ত কারণ এবং সমূহ বিবরণ অবগত হইয়া আনন্দিতই হইলেন। তাঁহাদের মনের অসন্তোষ কাটিয়া গেল। রামচন্দ্র বৃন্দাবনে আর কখনও আসেন নাই। দর্শন পরিক্রমা এবং প্রণাম বন্দনাদির মধ্যে তাঁহার দিন পরমানন্দেই কাটিতে লাগিল। তিনি আচার্য্য প্রভুর ইঙ্গিত ক্রমে বৃন্দাবনে আসিয়াই গোপাল ভট্ট প্রভুর সেবায় নিযুক্ত হ'ন। তাঁহার সেবা নিষ্ঠা দর্শনে বিস্মিত হইয়া সকলে সপ্রশংস দৃষ্টিতে তাঁহার প্রতি চাহিয়া থাকিতেন। তাঁহার কবিত্ব প্রতিভা এবং দর্শন শাস্ত্রাদিতে অসাধারণ পাণ্ডিত্য দর্শনে মুগ্ধ

* প্রেম বিলাস ১৬শ বিলাস।

হইয়া গোস্বামিগণ তাঁহাকে 'কবিরাজ' উপাধিতে ভূষিত করেন। ইতোমধ্যে রামচন্দ্র একবার সুযোগমত রাধাকুণ্ডে গিয়াছিলেন। সেখানে কয়েকদিন অবস্থান পূর্ব্বক দাসগোস্বামী ও কবিরাজ গোস্বামীর কৃপালাভ করিয়া বৃন্দাবনে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

দেখিতে দেখিতে বৈশাখ মাস আসিয়া পড়িল। বৈশাখী পূর্ণিমার দিন শ্রীরাধারমণের বার্ষিক মহোৎসব সমারোহের সহিত সুসম্পন্ন হইল। আচার্য্য প্রভু সে দিন সমাগত বৈষ্ণব বৃন্দের নিকট গৌড় যাত্রার নিমিত্ত বিদায় গ্রহণ করিলেন এবং কয়েক দিনের মধ্যেই ভট্টপ্রভু শ্রীজীব এবং অন্যান্য গুরু বর্গের অনুমতি লইয়া তিনি শ্যামানন্দ ও রামচন্দ্রসহ গৌড় অভিমুখে যাত্রা করিলেন। শ্রীজীবের নব রচিত গ্রন্থগুলি লইয়া কয়েকজন বাহক সঙ্গে সঙ্গে চলিল। প্রয়াগ, কাশী, গয়া প্রভৃতি তীর্থ ভূমি অতিক্রম করিতে করিতে তাঁহারা একদিন বিষ্ণুপুরে আসিয়া উপনীত হইলেন।

কিছুদিন পূর্ব্বে আচার্য্য প্রভু যখন যাজিগ্রামে অবস্থান করিতে ছিলেন সেই সময় শ্রীজীব বৃন্দাবন হইতে রাজা বীরহাম্বীরকে এবং আচার্য্য প্রভুকে পত্রপ্রেরণ করিয়া ছিলেন। পত্রবাহকগণ বিষ্ণুপুরে রাজার নিকট পত্র অর্পণ করিয়া পরে যাজিগ্রামে গমন করে। রাজা ও আচার্য্য প্রভুর উদ্দেশ্যে একখানি পত্র লিখিয়া সেই বাহকগণের হস্তে প্রেরণ করিয়াছিলেন। বিরহ কাতর রাজা, আচার্য্য প্রভুকে একবার বিষ্ণুপুরে আগমন করিবার নিমিত্ত সেই পত্রে সকাতর প্রার্থনা জানাইয়া ছিলেন। কিন্তু আচার্য্য প্রভু তখন আসিতে পারেন নাই বলিয়া রাজা দিন দিন যেন অধিকতর ব্যাকুল হইয়া উঠিতে ছিলেন। এখন অকস্মাৎ রাজা অপ্রত্যাশিত ভাবে শ্যামানন্দ এবং রামচন্দ্রের সহিত আচার্য্য প্রভুকে প্রাপ্ত হইয়া আনন্দে আত্মহারা হইলেন। তাঁহাদের আগমনে বনবিষ্ণুপুর পুনরায় নাম সঙ্কীর্ত্তনের তরঙ্গে প্লাবিত হইতে লাগিল।

দশদিন অবস্থানের পর আচার্য্য প্রভু শ্যামানন্দকে উড়িষ্যা গমন করিবার নিমিত্ত আদেশ প্রদান করিলেন। আচার্য্য প্রভুর মধুময় সঙ্গ

ত্যাগ করিয়া যাইবার ইচ্ছা না থাকিলেও শ্যামানন্দ তাঁহার আদেশ অমান্য করিতে পারিলেন না বেদনা ভারাক্রান্ত হৃদয়ে তিনি বিষ্ণুপুর হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন। রাজার আদেশে কয়েকজন কর্ম্মচারী বহুবিধ উপঢৌকন সহ শ্যামানন্দের সহিত যাত্রা করিল। তাহারা শ্যামানন্দকে নিরাপদে নৃসিংহপুরে পৌঁছাইয়া দিয়া তাঁহার লিখিত পত্রসহ বিষ্ণুপুরে ফিরিয়া আসিল।

শ্যামানন্দের উড়িষ্যা গমনের পর আচার্য্য প্রভু প্রায় দুই মাস কাল বিষ্ণুপুরে অবস্থান করিয়া পূর্ব্ব প্রতিষ্ঠিত ভক্তি ধর্ম্মের ভিত্তিটিকে আরও সুদৃঢ় করিলেন। রাজার হৃদয়ে প্রেম ভক্তির যে বীজটি ইতঃপূর্ব্বে রোপণ করিয়া গিয়াছিলেন এখন তিনি আসিয়া দেখিলেন যে সেটি অঙ্কুরিত হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবতাদি শাস্ত্রের নিগূঢ় তাৎপর্য্যটিও তাঁহার অনুভূতিগম্য হইয়াছে। এই সময়টুকুর অপেক্ষা করিয়াই আচার্য্যপ্রভু এতদিন তাঁহাকে যুগল মন্ত্রে দীক্ষা দেন নাই। এখন উপযুক্ত সময় বুঝিয়া তিনি রাজাকে কাম গায়ত্রীর অর্থসহ যুগল মন্ত্রে দীক্ষা প্রদান করিলেন। রাজ মহিষী সুলক্ষণাদেবী, রাজকুমার ধাড়িহাম্বীর এবং আরও অনেকে এই সময় তাঁহার নিকটে যুগলমন্ত্রে দীক্ষা লাভ করেন। * দীক্ষা দানের পর আচার্য্য প্রভু রাজাকে রামচন্দ্রের করে সমর্পণ করেন। রামচন্দ্র তাঁহার আদেশে রাজাকে যাবতীয় ভজন রহস্য উপদেশ করেন। এই সময়েই রাজা আচার্য্য প্রভুর ইঙ্গিতে শ্রীকালাচাঁদ বিগ্রহের প্রতিষ্ঠা করেন। আচার্য্য প্রভু স্বহস্তে বিগ্রহের অভিষেক ক্রিয়া সম্পাদন করিয়া ছিলেন। এই বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা উপলক্ষ্যে রাজা মহামহোৎসবের অনুষ্ঠান করেন। আচার্য্য প্রভু

* কথিত আছে, শিখর ভূমের রাজা হরিনারায়ণ এই সময়ে আচার্য্য প্রভুর নিকটে দীক্ষা প্রার্থী হ'ন। আচার্য্য প্রভু স্বয়ং দীক্ষা না দিয়া শ্রীরঙ্গক্ষেত্র হইতে ত্রিমল্ল ভট্টের (শ্রীগোপাল ভট্ট প্রভুর খুল্লতাত) পুত্রকে আনাইয়া দেন। তিনি পঞ্চকোটে গিয়া হরিনারায়ণের প্রার্থনা মত রাজাকে শ্রীরাম মন্ত্রে দীক্ষা দান করেন।

কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত শ্রীকালাচাঁদের সেবা বনবিষ্ণুপুরে এখনও যথারীতি চলিয়া আসিতেছে।

রাজা বীরহাম্বীর এই সময়ে একদিন স্বপ্নাবস্থায় দুইখানি অমূল্য পদ রচনা করিয়াছিলেন। পদ দুইখানি এই :—

(১)

"প্রভু মোর শ্রীনিবাস, পূরাইলে মনের আশ,
তুয়া বিনু গতি নাহি আর।
আছিনু বিষয় কীট, বড়ই লাগিত মিঠ,
ঘুচাইলা রাজ অহঙ্কার॥
করিতু গরল পান, সে ভেল ডাহিন বাম,
দেখাইলা অমিয়ার ধার।
পিব পিব করে মন, সব ভেল উচাটন,
এ সব তোমার ব্যবহার॥
রাধা পদ সুধা রাশি, সে পদে করিলা দাসী,
গোরা পদে বাঁধি দিলা চিত।
শ্রীরাধিকাগণ-সহ, দেখাইলা কুঞ্জ গেহ,
জানাইলা দুহু প্রেম রীত॥
যমুনার কুলে যাই, তীরে সখী ধাওয়া ধাই,
রাধা কানু বিলসয়ে সুখে।
এ বীর হাম্বীর হিয়া, ব্রজ পুর সদা ধিয়া,
যাঁহা অলি উড়ে লাখে লাখে॥"

(২)

"শুনগো মরম সখি, কালিয়া কমল আঁখি
কিবা কৈল কিছুই না জানি।
কেমন করয়ে মন, সব লাগে উচাটন,
প্রেম করি খোয়ানু পরশী॥

শুনিয়া দেখিনু কালা, দেখিয়া পাইনু জ্বালা,
নিবাইতে নাহি পাই পানী।
অগুরু চন্দন আনি, দেহেতে লেপিনু ছানি
না নিবায় হিয়ার আগুনি॥
বসিয়া থাকিয়ে যবে, আসিয়া উঠায় তবে,
লৈয়া যায় যমুনার তীর।
কি করিতে কিনা করি, সদাই ঝুরিয়া মরি,
তিলেক নাহিক রহি থির॥
শাশুড়ী ননদী মোর, সদাই বাসয়ে চোর,
গৃহপতি ফিরিয়া না চায়।
এ বীর হাম্বীর চিত, শ্রীনিবাস অনুগত,
মজি গেলা কালাচাঁদের পায়॥"

আচার্য্য প্রভুর শ্রীধাম হইতে প্রত্যাবর্ত্তন এবং বিষ্ণুপুরে অবস্থানের সংবাদ পাইয়া বিরহ কাতর যাজিগ্রামবাসী ও শ্রীখণ্ডের ভক্তগণ তাঁহাকে যাজিগ্রামে ফিরিয়া আসিবার নিমিত্ত সকাতর অনুরোধ সহকারে পত্র লিখিয়াছিলেন। আর কালবিলম্ব না করিয়া তিনি রামচন্দ্রের সহিত বিষ্ণুপুর হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন। বিদায় দান করিতে আসিয়া রাজা অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িলেন এবং শ্রীগুরুদেবের চরণ দুইটী ধরিয়া ব্যাকুল ভাবে কাঁদিতে লাগিলেন। আচার্য্য প্রভু তাঁহাকে সস্নেহে আলিঙ্গন দান করিয়া আশ্বাস প্রদান পূর্ব্বক বলিলেন 'তুমি দুঃখিত হইও না। আমি যাজিগ্রাম হইয়া একবার শ্রীখণ্ডে গমন করিব। সেখান হইতে খেতুরী হইয়া পুনরায় শীঘ্রই এখানে চলিয়া আসিব। নরোত্তমের সহিতও তোমার শীঘ্রই সাক্ষাৎকার হইবে। ইতোমধ্যে সে যদি যাজিগ্রামে আসে তবে তোমাকে সংবাদ দিব। সর্ব্বপ্রকার মনো বেদনা ত্যাগ করিয়া ভজনে নিবিষ্টচিত্ত হইয়া পরমানন্দে কাল যাপন করিও', ইত্যাদি নানা কথায় প্রবোধ দান পূর্ব্বক আচার্য্য প্রভু বিদায় গ্রহণ করিলেন। রাজা বহুদূর পর্য্যন্ত তাঁহার

পশ্চাৎ পশ্চাৎ অনুগমন করিয়া অবশেষে দুঃখিত অন্তরে অশ্রু মুছিতে মুছিতে প্রাসাদে ফিরিয়া আসিলেন।

যাজিগ্রামে প্রত্যাবর্ত্তন, শ্রীখণ্ড ও কাটোয়া গমন।

আচার্য্য প্রভু যথা সময়ে একদিন যাজিগ্রামে আসিয়া উপনীত হইলেন। একদিন মাত্র গৃহে অবস্থান করিয়া পরদিবসে পুনরায় যাজিগ্রাম ত্যাগ কারয়া শ্রীখণ্ড অভিমুখে রওনা হইলেন। সরকার ঠাকুর মহাশয়ের অদর্শনের পর বিরহ বেদনায় কাতর হইয়া তিনি মনের আবেগে বৃন্দাবন যাত্রা করিয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহার অদর্শনের পর আজ এই প্রথম তিনি শ্রীখণ্ডে চলিয়াছেন। পথে চলিতে চলিতে তাঁহার মনে বিরহ বেদনা পুনরায় জাগিয়া উঠিল। শ্রীনিবাস বলিয়া স্নেহময় কণ্ঠে আর কেহ ডাকিবেন না। আলিঙ্গনে আবদ্ধ করিয়া অকপট করুণা ধারায় তাঁহার মস্তক সিক্ত করিয়া দিবার মত আপন জন এখন আর কেহ নাই। অন্তরের জ্বালা জুড়াইবার স্থানও আর রহিল না। এই সমস্ত কথা চিন্তা করিতে করিতে তিনি চলিয়াছেন, উত্তরীয়ের প্রান্ত দিয়া মধ্যে মধ্যে অশ্রুমোচন করিতেছেন। এইরূপে কাঁদিতে কাঁদিতে তিনি শ্রীখণ্ডে আসিয়া প্রবেশ করিলেন এবং রঘুনন্দনের নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বিরহের জ্বালায় রঘুনন্দনের অবস্থাও হইয়াছে শোচনীয়। তাঁহার শীর্ণ কলেবর এবং বেদনাহত অবস্থা দর্শনে আচার্য্য প্রভু অত্যন্ত বিচলিত হইয়া উঠিলেন। হৃদয়ের আবেগ আর সংযত করিতে না পারিয়া হাহাকার করিতে করিতে তাঁহার চরণ জড়াইয়া পড়িলেন। তাঁহাকে দেখিয়া রঘুনন্দনও ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। পরে তাঁহাকে উঠাইয়া আলিঙ্গন পূর্ব্বক তাঁহার মস্তকটি আপন বুকের উপর চাপিয়া ধরিয়া তিনিও কাঁদিতে কাঁদিতে অধীর হইয়া পড়িলেন।

বহুক্ষণ পর হৃদয়ের ভার ঈষৎ লঘু হইলে উভয়েই স্থির হইয়া বসিলেন। শ্রীধামের সংবাদ এবং অন্যান্য বিষয়ের আলোচনায় কিছু সময় অতিবাহিত হইল। সরকার ঠাকুর মহাশয়ের বিরহোৎসব এখনও উদ্‌যাপিত হয় নাই। দাস গদাধরের উৎসবও এখনও বাকী। আচার্য্য প্রভুর অনুপস্থিতির জন্যই অনুষ্ঠান স্থগিত রহিয়াছে। কিন্তু আর বিলম্ব করা উচিত হইবে না। কার্ত্তিক মাসের কৃষ্ণা অষ্টমী দিবসে দাস গদাধর অন্তর্হিত হইয়াছেন, সরকার ঠাকুর মহাশয়ের অপ্রকট তিথি অগ্রহায়ণের কৃষ্ণা একাদশী উভয়ে পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন—দাস গদাধরের বিরহোৎসব প্রথমে অনুষ্ঠিত হওয়া প্রয়োজন, পরে শ্রীখণ্ডে উৎসব হইবে। গদাধরের সুযোগ্য শিষ্য যদুনন্দনের সহিত যুক্তি করিয়াই দিন স্থির করিতে হইবে। রঘুনন্দন বলিলেন 'যদুনন্দন সেখানে কতদূর কি করিয়াছে জানি না। তুমি একবার অবিলম্বে কাটোয়ায় গিয়া যদি সমস্ত বিষয়ে যথাযথ ব্যবস্থা কর তাহা হইলে ভাল হয়,' আচার্য্য প্রভু তাঁহার কথায় সম্মত হইয়া কাটোয়া অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

যথা সময়ে কাটোয়াতে উপস্থিত হইয়া আচার্য্য প্রভু যদুনন্দনের সহিত মিলিত হইলেন। গদাধরের ব্যবহৃত আসন এবং অন্যান্য স্মৃতি চিহ্ন সকল দর্শন করিতে করিতে আচার্য্য প্রভু বহুক্ষণ বিরহে ব্যাকুল হইয়া অশ্রুপাত করিলেন। পরে হৃদয়ের ভার কিছু কমিলে সংযত হইয়া উপবেশন করিলেন। যদুনন্দনের সহিত উৎসব সংক্রান্ত আলোচনা হইতে লাগিল। যদুনন্দন উৎসবের নিমিত্ত ইতোমধ্যে বহু দ্রব্য সামগ্রী সংগ্রহ করিয়াছেন। দ্রব্যাদির প্রাচুর্য্য দর্শন করিয়া আচার্য্য প্রভু বিস্মিত এবং পরম পরিতৃপ্ত হইলেন। উৎসবের দিন নির্দ্ধারিত হইয়াছে এবং আচার্য্য, মোহান্ত ও বৈষ্ণবগণের নিকটে আমন্ত্রণ পত্রও প্রেরিত হইয়াছে। আচার্য্য প্রভু দেখিলেন আমন্ত্রিত মহাত্মগণের যথাযোগ্য বাসস্থানের ব্যবস্থাও সাধ্যমত করা হইতেছে। যদুনন্দনের সুব্যবস্থায় তিনি পরম আনন্দিত হইয়া শ্রীখণ্ডে প্রত্যাগমন

করিলেন। রঘুনন্দন সমাচার অবগত হইয়া পরম তৃপ্তি লাভ করিলেন। আচার্য্য প্রভু দেখিলেন রঘুনন্দনও ইতোমধ্যে উৎসবের আয়োজনে উদ্যোগী হইয়াছেন। আর কাল বিলম্ব না করিয়া তিনি যাজিগ্রামে ফিরিয়া আসিলেন।

কাটোয়া শ্রীখণ্ড ও কাঞ্চন গড়িয়ায় মহোৎসব।

শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর পুত্র বীরচন্দ্র প্রভু, অদ্বৈত প্রভুর সন্তানগণ এবং অন্যান্য বিশিষ্ট আচার্য্য, বৈষ্ণব ও মহাত্মাগণ উৎসবে শুভাগমন করিবেন। কাটোয়ার মহোৎসব সমাপন করিয়া তাঁহারা যাজিগ্রামে আসিবেন। এখানে কয়েক দিবস অবস্থান করিয়া তাঁহারা শ্রীখণ্ডের উৎসবে গিয়া যোগদান করিবেন, এইরূপ ব্যবস্থা হইয়াছে। আচার্য্য প্রভু যাজিগ্রামে আসিয়া তাঁহাদের বাসস্থান এবং সেবার নিমিত্ত দ্রব্যাদি সংগ্রহে নিযুক্ত হইলেন। কয়েক দিবসের মধ্যে সমস্ত আয়োজন শেষ করিয়া তিনি স্থানীয় ভক্তগণকে লইয়া কাটোয়ায় গমন করিবার নিমিত্ত প্রস্তুত হইলেন। ইতোমধ্যে কাটোয়া গমনের উদ্দেশ্য লইয়া রঘুনন্দন শ্রীখণ্ডবাসী বৈষ্ণবগণের সহিত যাজিগ্রামে আগমন করিলেন—তখন সকলে একত্র রওনা হইলেন। যথা সময়ে কাটোয়ায় উপস্থিত হইয়া তাঁহারা দেখিলেন যে নিমন্ত্রিত বৈষ্ণব ও মোহান্তগণ শুভাগমন করিয়াছেন। কয়েক দিনের মধ্যেই বীরচন্দ্র প্রভু, শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর সন্তান শ্রীকৃষ্ণ মিশ্র প্রভু, গোপাল মিশ্র প্রভু প্রভৃতি আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রকট লীলার বহু চিহ্ন কাটোয়া, তাহার নিজ অঙ্গে ধারণ করিয়া রাখিয়াছে। আচার্য্য প্রভু এক সময় প্রভু পাদগণকে সেই পবিত্র স্থানগুলি দর্শন করাইয়া আনিলেন। কেশব ভারতীর আশ্রম, প্রভুর মস্তক মুণ্ডনস্থান। প্রভুর কেশের সমাধি প্রভৃতি স্থানে আসিয়া প্রভুপাদগণ প্রভুর বিরহে কাতর হইয়া অশ্রু

বিসর্জ্জন করিলেন। আচার্য্য প্রভু ক্রমে তাঁহাদিগকে অন্যান্য দ্রষ্টব্য স্থানগুলি দর্শন করাইয়া যথা সময়ে সকলকে লইয়া ফিরিয়া আসিলেন।

নানাস্থান হইতে বৈষ্ণব ও মোহান্তগণ একে একে কাটোয়ায় শুভাগমন করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের আগমনে কাটোয়া পূর্ণ হইয়া উঠিল। পাঠ-প্রসঙ্গ এবং নাম সঙ্কীর্ত্তনের ধ্বনিতে কাটোয়া নগরী অপরূপ শ্রী ধারণ করিল। যদিও নির্দ্ধারিত সময়ের বহু পূর্ব্ব হইতেই মহামহোৎসবের সূচনা হইয়া গিয়াছে, তথাপি আনুষ্ঠানিক ভাবে সপ্তমী, অষ্টমী এবং নবমী এই তিন দিন ব্যাপী যথা নির্দ্দিষ্ট ব্যবস্থা-সূচি অনুসারে নাম সংকীর্ত্তন পাঠ এবং বৈষ্ণব সেবাদির অনুষ্ঠান বিশেষভাবে প্রতিপালিত হইল।

উৎসব সমাপ্তির পর এক সময় সমাগত ভক্তবৃন্দ এবং প্রভুপাদগণের নিকটে আসিয়া আচার্য্য প্রভু তাঁহাদিগকে করজোড়ে বলিলেন—'শ্রীখণ্ড-উৎসবের এখনও কিছু বিলম্ব আছে। অতএব এই অবসরে সকলে অনুগ্রহপূর্ব্বক যদি যাজিগ্রামে শুভাগমন করেন তাহা হইলে গ্রামবাসিগণ কৃতার্থ হয়, আপনাদের অনুমতি পাইলেই যাত্রার উদ্যোগ করিতে পারি।' প্রভুপাদগণ সাগ্রহে তাঁহার আমন্ত্রণ স্বীকার করিলেন।

আচার্য্য প্রভু তখন সকলকে লইয়া যাজিগ্রামে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। বীরচন্দ্র প্রভু, অদ্বৈত প্রভুর সন্তানগণ, প্রেমিক ভক্তবৃন্দ এবং প্রসিদ্ধ কীর্ত্তনীয়াগণ সকলেই শুভাগমন করিলেন। ভগবৎ প্রসঙ্গ এবং নাম সঙ্কীর্ত্তনের রোলে যাজিগ্রাম টলমল করিতে লাগিল। ছাত্র ও শিষ্যগণ এবং ঠাকুরাণীর সহায়তায় আচার্য্য প্রভু সকলের সেবার ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের আন্তরিক সেবায় মুগ্ধ হইয়া সকলে যাজিগ্রামে কয়েকদিন অবস্থান করিলেন। পরে তাঁহারা আচার্য্য প্রভুর সহিত যথাসময়ে যাত্রা করিয়া শ্রীখণ্ডে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রঘুনন্দন তাঁহাদিগকে গ্রামের প্রান্ত হইতে আহ্বান জানাইয়া পরম সমাদরে লইয়া আসিলেন এবং তাঁহাদের

বাসস্থানাদির যথাযথ ব্যবস্থা করিয়া দিলে সকলে প্রসাদাদি গ্রহণপূর্ব্বক বিশ্রাম করিলেন। যদুনন্দনও কাটোয়ার ভক্তবৃন্দসহ ইতোমধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

বিভিন্ন স্থান হইতে সাধু বৈষ্ণব ও মহাত্মগণের আগমনে শ্রীখণ্ড এক অপূর্ব্ব শ্রীধারণ করিয়াছে। অগ্রহায়ণ মাস, হেমন্তের শান্ত শীতল সমীরণ প্রবাহিত হইতেছে, আকাশ নির্ম্মল, শীত বা গ্রীষ্মের কোনরূপ তীব্রতা নাই, প্রকৃতির আবহাওয়া অতি মনোরম। সেই মনোমুগ্ধকর পরিবেশের মধ্যে ভক্তগণ স্থানে স্থানে একত্র হইয়া কোথাও নাম সঙ্কীর্ত্তনে মত্ত হইয়াছেন. কোথাও শাস্ত্র পাঠ হইতেছে. কোথাও বা ভগবৎ প্রসঙ্গে রত হইয়া ভক্তগণ পরমানন্দে নিমগ্ন, আবার কোথাও বা একজন সরকার ঠাকুর মহাশয়ের পূত চরিত আলোচনা করিতেছেন আর অন্যান্য সকলে সেই চরিত-সুধা পান করিতেছেন। শ্রীখণ্ড যেন আনন্দ সিন্ধুর প্রেম তরঙ্গে উচ্ছল।

আজ কৃষ্ণা একাদশী, সরকার ঠাকুর মহাশয়ের তিরোভাব দিবস। দ্বিজ বাণীনাথ, রঘুনন্দন প্রভৃতি পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন যে. দিবসে আচার্য্য প্রভু শ্রীমদ্ভাগবৎ পাঠ করিয়া সকলকে শ্রবণ করাইবেন এবং নাম সঙ্কীর্ত্তনে রাত্রি অতিবাহিত হইবে। প্রভুপাদগণের নিকটে এই বিষয়ে অনুমতি প্রার্থনা করা হইলে তাঁহারা সর্ব্বান্তঃকরণে এই প্রস্তাবে সম্মতি প্রদান করিলেন। তখন সকলের অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক আচার্য্য প্রভু মঙ্গলাচরণপূর্ব্বক পাঠ আরম্ভ করিলেন। রাস পঞ্চাধ্যায় হইতে পাঠ আরম্ভ হইল। আচার্য্য প্রভুর সম্মুখেই প্রভুপাদগণ উপবেশন করিয়াছেন। শত শত সাধু ও বৈষ্ণব তাঁহাদিগকে ঘিরিয়া একাগ্রচিত্তে পাঠ শ্রবণ করিতেছেন। আচার্য্য প্রভু পাঠ করিতেছেন আর অবিরল নয়ন ধারায় তাঁহার সুপরিসর বক্ষ সিক্ত হইতেছে। ভাবাবেশে মধ্যে মধ্যে তাঁহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া যাইতে লাগিল। পাঠ শ্রবণে শ্রোতৃবৃন্দ বিস্মিত, মুগ্ধ। তাঁহাদের নয়নেও অশ্রুর ধারা নামিয়াছে। স্বচ্ছন্দ

গতিতে পাঠ চলিতে লাগিল। অভূতপূর্ব্ব আনন্দের মধ্য দিয়া সকলের অজ্ঞাতসারে দিবাভাগ অতিক্রান্ত হইল। সন্ধ্যা সমাগত দেখিয়া আচার্য্য প্রভু পাঠে বিরতি দিলে পর সকলের বাহ্যজ্ঞান ফিরিয়া আসিল। তাঁহারা যেন কোন এক আনন্দ লোক হইতে প্রাকৃত রাজ্যে ফিরিয়া আসিলেন। সকলের জয় ধ্বনিতে শ্রীখণ্ড টলমল করিতে লাগিল, প্রভুপাদগণ অশ্রুপূর্ণ নয়নে আচার্য্য প্রভুকে বার বার আলিঙ্গন দান করিতে লাগিলেন।

পাঠের পর শ্রীগৌরাঙ্গ অঙ্গনে সকলে একত্র হইয়া আরতি দর্শন করিলেন। অতঃপর শ্রীশ্রীনাম সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভের ব্যবস্থা হইল। অগণিত খোল করতাল এবং মৃদঙ্গাদি সংগ্রহ করা হইয়াছে। মাল্য চন্দনাদির দ্বারা যথারীতি খোল মঙ্গলের পর সেই প্রসাদী মাল্য চন্দন অর্পণপূর্ব্বক প্রভুপাদগণের বন্দনা করা হইল। পরে বীরচন্দ্র প্রভু স্বহস্তে রঘুনন্দনকে মাল্যচন্দনাদির দ্বারায় ভূষিত করিলেন। রঘুনন্দন আচার্য্য প্রভুকে মাল্যচন্দন দিলেন। তৎপরে সকলে সুসজ্জিত চন্দ্রাতপের নীচে আসিয়া দাঁড়াইলেন। নাম আরম্ভ হইল, প্রথমে ধীরে ধীরে নাম চলিতে লাগিল। রাত্রি গভীর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নামের ধ্বনিও ক্রমে উচ্চ হইতে উচ্চতর গ্রামে উঠিতে লাগিল। সেই ধ্বনি রাত্রির নিস্তব্ধতা ভেদ করিয়া দশ দিক কম্পিত করিতে লাগিল। সঙ্কীর্ত্তনের আনন্দে সকলেই যেন আত্মহারা হইয়া পড়িলেন। পুলকাশ্রু পরিব্যাপ্ত কলেবরে কেহ নৃত্য করিতে লাগিলেন, কেহ বা প্রেমাবেশে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। সঙ্কীর্ত্তন-কমলের মধু পান করিতে করিতে ভক্তগণ উন্মত্ত হইয়া উঠিলেন।

রাত্রি অবসানের সঙ্গে সঙ্গে নাম সঙ্কীর্ত্তন সমাপ্ত হইল, মঙ্গল আরতি দর্শনের পর কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করিয়া সকলে স্নানাদি প্রাতঃকৃত্য সমাধা করিলেন। একাদশী ব্রত উপলক্ষ্যে পূর্ব্ব দিবস হইতে সকলেই উপবাসী আছেন, তদুপরি সমস্ত রাত্র-ব্যাপী নাম সঙ্কীর্ত্তনের পরিশ্রমে সকলেই ক্লান্ত। রঘুনন্দন তত্ত্বাবধান পূর্ব্বক যতশীঘ্র সম্ভব

রন্ধনাদি করাইয়া ভোগ নিবেদন করাইলেন। এবং প্রচুর পরিমাণে অন্ন ব্যঞ্জন পিষ্টক, মিষ্টান্ন ও পায়সাদির দ্বারায় পরম যত্নে প্রভুপাদ-গণকে এবং ভক্তবৃন্দকে পরিতোষ পূর্ব্বক প্রসাদ সেবন করাইলেন। প্রসাদ গ্রহণের পর সকলে বিশ্রামার্থে নিজ নিজ আবাসে গমন করিলে পর রঘুনন্দন একটী পাত্রে প্রসাদ সাজাইয়া সরকার ঠাকুর মহাশয়ের ভজন কুটীরে আসিলেন এবং তাঁহাকে মানসে আহ্বান পূর্ব্বক প্রসাদ সমর্পণ করিতে বসিলেন। প্রসাদ নিবেদন করিতে বসিয়া রঘুনন্দন আর ধৈর্য্য ধারণ করিয়া থাকিতে পারিলেন না, বিরহে অধীর হইয়া তিনি ব্যাকুলভাবে কাঁদিয় উঠিলেন, সেই নির্জ্জন কক্ষে রঘুনন্দন একাকী বালকের ন্যায় বহুক্ষণ কাঁদিলেন, অবশেষে অতি কষ্টে রোদনের বেগ সংবরণ করিয়া প্রসাদ সমর্পণ পূর্ব্বক দ্বার রুদ্ধ করিয়া বাহিরে আসিলেন। কিছুক্ষণ পর আচমন দিবার উদ্দেশ্যে দ্বার উন্মুক্ত করিতেই সম্মুখে যাহা দেখিলেন তাহাতে বিস্ময়ে আনন্দে তাঁহার হৃদয় পূর্ণ হইয়া গেল। দেখিলেন—সরকার ঠাকুর মহাশয় তাঁহার কাতর আহ্বান উপেক্ষা করিতে না পারিয়া প্রকট স্বরূপে আবির্ভূত হইয়া প্রসাদ গ্রহণ করিতেছেন! এই মহিমময় দৃশ্য দেখিতে দেখিতে রঘুনন্দন আত্ম-বিস্মৃত হইয়া পড়িলেন। পরে প্রকৃতিস্থ হইতেই দেখিলেন—সরকার ঠাকুর মহাশয় অন্তর্হিত হইয়াছেন! রঘুনন্দন ব্যাকুলভাবে কাঁদিতে কাঁদিতে সেই পদাঙ্কিত আসন একবার মস্তকে আর একবার হৃদয়ে ধারণ করিতে করিতে ভূমিতে লুটাইতে লাগিলেন। লোক চক্ষুর গোচরে প্রকাশিত হইলেই তাহা প্রকট লীলা। অপ্রকট লীলা সর্ব্ব সাধারণের চক্ষুর অন্তরালে প্রকটিত থাকিলেও ভাগ্যবানগণের চক্ষে তাহা প্রকটিতই থাকেন। লীলা ত্রিকাল সত্য; গৌর, গৌরগণ নিত্য, কেও কোথাও যান না, মৃত্যু বৈষ্ণবের অঙ্গ স্পর্শ করে না। জগবাসী নরনারী এই মহাসত্যের প্রমাণ আরও একবার পাইল। রঘুনন্দন ভূমিতে পড়িয়া বহুক্ষণ রোদন করিলেন। পরে ঈষৎ সংযত হইয়া উঠিয়া বসিলেন এবং আচমন দিলেন। স্থানীয় বৈষ্ণবগণ এখনও

অভুক্ত রহিয়াছেন, মনে হইতেই তিনি অশ্রু মুছিতে মুছিতে অবশেষে প্রসাদ পাত্র লইয়া বাহিরে চলিয়া আসিলেন। অতঃপর রঘুনন্দন আচার্য্য প্রভুকে ডাকিয়া নিকটে বসাইলেন এবং স্বহস্তে পরিবেশন পূর্ব্বক সেবন করাইলেন। অন্যান্য সকলের প্রসাদ গ্রহণের পর আপনিও কিঞ্চিৎ গ্রহণ করিলেন।

নাম সঙ্কীর্ত্তন ও পাঠ প্রসঙ্গে আরও দুই তিন দিন পরমানন্দে কাটিয়া গেল। অতঃপর এই অনাবিল আনন্দের স্মৃতিটুকু হৃদয়ে ধারণ করিয়া ভক্তগণ একে একে শ্রীখণ্ড হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন। আচার্য্য প্রভু স্বয়ং যোগদান করিয়া মধুমতীর অবতার সরকার ঠাকুর মহাশয়ের বিরহোৎসবটীর সূত্রপাত করিয়া দিয়াছিলেন, প্রতি অগ্রহায়ণের কৃষ্ণা একাদশীর সেই পুণ্যতিথিটীতে সেই উৎসবের স্মৃতিটুকু বুকে লইয়া শ্রীখণ্ডবাসী ভক্তগণ এখনও পালন করিয়া আসিতেছেন। শত শত ভক্ত সেই উৎসবে যোগদান করিয়া এখনও সরকার ঠাকুর মহাশয়ের চরণ পূত শ্রীখণ্ডের পবিত্র রজরেণুতে লুণ্ঠিত হইয়া হৃদয়ের প্রেম নিবেদন করেন।

উৎসবান্তে প্রভুপাদ ও বৈষ্ণবগণকে বিদায় দিয়া আচার্য্যপ্রভু যাজিগ্রামে ফিরিয়া আসিলেন এবং পূর্ব্ববৎ ছাত্রগণকে লইয়া অধ্যয়ন অধ্যাপনায় মনোনিবেশ করিলেন। পূর্ব্ব বৎসর মাঘী কৃষ্ণা একাদশীতে দ্বিজ হরিদাসাচার্য্য শ্রীধামে নিত্যলীলায় প্রবিষ্ট হইয়াছেন, তাঁহার বিরহোৎসবের ব্যবস্থাও এইবার করিতে হইবে। তাঁহার উৎসবের আয়োজনাদি করিবার নিমিত্ত আচার্য্য প্রভু একদিন হরিদাসাচার্য্যের পুত্র গোকুলানন্দ ও শ্রীদাসকে কাঞ্চন গড়িয়াতে পাঠাইয়া দিলেন। তাঁহার আদেশে ভ্রাতৃদ্বয় সমুদয় আয়োজন করিয়া আচার্য্য প্রভুকে সংবাদ দিলে তিনি রামচন্দ্র এবং অন্যান্য শিষ্যগণকে লইয়া কাঞ্চন-গড়িয়া গমনপূর্ব্বক উৎসব সুসম্পন্ন করিলেন। নিমন্ত্রিত বহু বৈষ্ণব ও মোহান্তগণ যোগদানপূর্ব্বক মহোৎসব সাফল্যমণ্ডিত করেন। গোকুলানন্দ, শ্রীদাস ও আরও অনেকে এই সময়ে আচার্য্য প্রভুর

নিকটে যুগল মন্ত্রে দীক্ষা লাভ করেন। কয়েকদিন কাঞ্চন গড়িয়াতে থাকিয়া আচার্য্য প্রভু, রামচন্দ্র এবং আরও কয়েকজন শিষ্যসহ বুধরি যাত্রা করিলেন।

গোবিন্দ কবিরাজের সহিত মিলন।

রামচন্দ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা গোবিন্দ ১৪৬১ শকে (বা ১৪৫৯) জন্মগ্রহণ করেন। কথিত আছে গোবিন্দের জন্মের সময় জননী সুনন্দা দেবী প্রসব বেদনায় অতিশয় কাতর হইয়া পড়েন এবং তাঁহার অস্থিরতায় বিচলিত হইয়া তাঁহার পরিচারিকা ছুটিয়া আসিয়া দামোদর সেন মহাশয়কে সংবাদ প্রদান করে। দামোদর তখন মন্দিরে দেবী আরাধনায় বসিয়াছেন, সুতরাং কোন কথা না বলিয়া তিনি ইঙ্গিতে শ্রীদুর্গা দেবীর 'যন্ত্রের' প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া কি যেন বুঝাইয়া দিলেন। পরিচারিকা সে ইঙ্গিতের মর্ম্ম যেরূপ বুঝিল সেইরূপ করিল। সেই 'দেবী যন্ত্র' ধৌত করতঃ সেই পবিত্র বারি আনিয়া সুনন্দা দেবীকে পান করাইয়া দিল। এই ঘটনার ঠিক পরেই গোবিন্দ ভূমিষ্ঠ হইলেন। দেবীর কৃপা প্রভাবে এবং দামোদরের সঙ্গগুণে বয়ঃপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে গোবিন্দ, দেবীর চরণে অসাধারণ ভক্তি নিষ্ঠা লাভ করিয়া তাঁহার আরাধনায় আত্মনিয়োগ করেন। তাহা ব্যতীত তিনি দামোদরের পাণ্ডিত্যের এবং কবিত্ব প্রতিভারও যোগ্য উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। গোবিন্দ রচিত দেবী মাহাত্ম্য মূলক পদাবলীগুলি ভক্ত সমাজের এবং সাহিত্য জগতের পরম আদরের বস্তু। কথিত আছে রামচন্দ্র গোবিন্দকে বৈষ্ণব ধর্ম্ম গ্রহণ করিবার নিমিত্ত পুনঃপুনঃ অনুরোধ করিয়াছিলেন। কিন্তু দেবীর চরণে আত্ম-সমর্পিত গোবিন্দ নিষ্ঠাবশতঃ শক্তি উপাসনা ত্যাগ করিতে অসমর্থ হন। রামচন্দ্র ইহাতে তাঁহার প্রতি বিরক্ত না হইয়া তাঁহার

ইষ্টনিষ্ঠা দর্শন করিয়া বিশেষ পরিতুষ্টই হইয়াছিলেন। পরবর্ত্তীকালে তিনি তাঁহাকে এই বিষয়ে আর কখনও অনুরোধ করেন নাই। দুইটি ভাই দুইটি পথ ধরিয়া চলিয়াছেন। ইহাতে বাদ বিসংবাদের অবশ্য কিছুই নাই। তথাপি মধ্যে মধ্যে রামচন্দ্রের মনে হয় 'প্রভু যদি কৃপা করিয়া গোবিন্দকে আমাদের সহযোগী করিয়া দেন তবে বড়ই সুখের হয়।' রামচন্দ্র প্রভুর চরণে এই প্রার্থনা সর্ব্বদাই করিতেন। অবশেষে প্রভু রামচন্দ্রের প্রার্থনা একদিন শুনিলেন। কিছুদিনের মধ্যেই কয়েকটী আকস্মিক ঘটনা ঘটিয়া গেল এবং তাহারই ফলে গোবিন্দের সাধনার গতি সম্পূর্ণ ভিন্ন পথ ধরিয়া প্রবাহিত হইতে আরম্ভ করিল। দেবী কাত্যায়ণীর উপাসনা করিয়া তাহার ফল স্বরূপে ব্রজরামাগণ একদিন নন্দ-নন্দনকে লাভ করিয়াছিলেন। ভক্তিরূপা সেই যোগমায়া দেবীর কৃপায় গোবিন্দও ব্রজলীলা এবং নদীয়া লীলা এই উভয় লীলাতেই প্রবেশাধিকার লাভ করিলেন।

প্রথম ঘটনাটি ঘটিল বৈষ্ণব কৃপার সূত্র ধরিয়া। শ্রীশ্রীভক্তমাল গ্রন্থ ঘটনাটিকে এই রূপে বর্ণনা করিয়াছেন—কোনও সময়ে একদিন জনৈক মহানুভব বৈষ্ণব গোবিন্দের বাড়ীতে আসিয়া আতিথ্য গ্রহণ করেন; গোবিন্দও তাঁহাকে পরম সমাদরে আহ্বান করিয়া তাঁহার সেবার যথাযোগ্য ব্যবস্থা করিয়া দেন। স্নানাদি সমাপন করিয়া উক্ত মহাত্মা আহ্নিকাদি করিবার জন্য মন্দিরে আগমন করিলেন। প্রথমে ইহাকে তিনি বিষ্ণু মন্দির বলিয়াই মনে করিয়াছিলেন, কিন্তু পরে তিনি মন্দিরের দ্বার খুলিয়া দেখিলেন, সম্মুখে মুণ্ডমালা বিভূষিতা কালী মূর্ত্তি বিরাজ করিতেছেন। পৃথক আসনে এক মূর্ত্তি শালগ্রাম শিলাও রহিয়াছেন। পার্শ্বে নৈবেদ্যাদি পূজার যাবতীয় উপকরণ সুসজ্জিত রহিয়াছে। মহাত্মা তখন প্রণাম বন্দনা এবং নিত্যক্রিয়া সমাপনান্তে সেই পুষ্পাদির দ্বারায় শালগ্রামের অর্চ্চনা করিলেন এবং যাবতীয় নৈবেদ্যাদি তাঁহাকেই অর্পণ করিয়া দিলেন। তিনি মন্দির হইতে চলিয়া যাইবার পর নিত্য পূজক ব্রাহ্মণ মন্দিরে আসিলেন এবং তিনি

যথারীতি দেবী পূজা সমাপণ পূর্ব্বক নিজের অজ্ঞাতসারে শালগ্রামে অর্পিত সেই প্রসাদী নৈবেদ্যই দেবীকে সমর্পণ করিয়া দিলেন। এই ঘটনার দিন, রাত্রে দেবী গোবিন্দের নিকটে স্বপ্নযোগে আবির্ভূ্তা হইয়া সস্নেহে এবং স্মিতহাস্যে বলিলেন—'গোবিন্দ, আমি তোমার গৃহে এতদিন অনিবেদিত বস্তুই গ্রহণ করিয়া আসিতেছি, আমার প্রভুর নিবেদিত প্রসাদ সমর্পণ করিয়া আজ তুমি আমাকে বড়ই তৃপ্তি দান করিয়াছ। সর্ব্বাবতারী শ্রীকৃষ্ণই সকলের প্রভু, আজ হইতে তুমিও তাঁহার উপাসনা কর, কৃতার্থ হইবে।' এই কথা বলিতে বলিতে দেবী অন্তর্হিতা হইলেন। প্রভাতে উঠিয়া গোবিন্দ সেই স্বপ্নানুভূত দেবীর আদেশ বাক্য স্মরণ করিয়া বিস্মিত হইলেন। ইতঃপূর্ব্বে আরও অনুরূপ একটি ঘটনা তাঁহাকে সংশয়ের মধ্যে ফেলিয়া দিয়াছিল, এখন সেটিও তাঁহার মনে পড়িল, রামচন্দ্র তখন বুধরীতে ছিলেন। একদিন প্রভাতে তিনি গোবিন্দের উদ্যানে প্রস্ফুটিত পুষ্প সমূহ দেখিয়া মনে মনে ইচ্ছা করিলেন যে এই পুষ্পগুলি শ্রীকৃষ্ণে অর্পিত হইলে বেশ হয়। তিনি ফুলগুলি না তুলিয়া মনে মনেই শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ করিয়া দিলেন। পরে সেই সমর্পিত পুষ্পগুলি গোবিন্দ চয়ন করিয়া যথারীতি দেবীর চরণে নিবেদন করিতে উদ্যত হইলে কৃপাময়ী জগজ্জননী সাক্ষাৎ আবির্ভূ্তা হইয়া কর প্রসারণ পূর্ব্বক তাঁহাকে বলিলেন—'গোবিন্দ, এই পুষ্পগুলি আমার প্রভুর প্রসাদী, সুতরাং ইহা আমার চরণে দিও না, আমার হস্তে দাও, তিনি আমার প্রভু, এ পুষ্প চরণে দিলে অপরাধ হয়।' গোবিন্দ সেদিন বিস্মিত হইয়া পুষ্পগুলি দেবীর করেই সমর্পণ করিয়াছিলেন। সেই পূর্ব্ব ঘটনার কথাও এখন তাঁহার মনে পড়িতে লাগিল। কিন্তু ইহাতেও তিনি সম্পূর্ণ সংশয়মুক্ত হইতে পারিলেন না। সেবা পূজাদি পূর্ব্বের ন্যায়ই চলিতে লাগিল।

কিছুদিন পর গোবিন্দ অকস্মাৎ গ্রহণীরোগে আক্রান্ত হইলেন। ব্যাধিটি ধীরে ধীরে এইরূপ প্রবল আকার ধারণ করিল যে তাহাতে জীবন-সংশয় দেখা দিল। অন্তিম দশা মনে করিয়া গোবিন্দ তখন

একাগ্র মনে তাঁহার সারা জীবনের আরাধ্যা দেবী যোগমায়ার চরণ যুগল চিন্তা করিতে লাগিলেন। নশ্বর দেহ পরিত্যাগের পর বিশ্ব জননীর পাদপদ্মে আশ্রয় লাভের আশা হৃদয়ে লইয়া তিনি ভক্তি বিগলিত অন্তরে প্রার্থনা জানাইতে লাগিলেন। অবিরল নয়ন ধারায় শয্যা সিক্ত হইতে লাগিল। সন্তানের কাতর আহ্বানে জননী আর নীরব থাকিতে না পারিয়া তাঁহার সমক্ষে আবির্ভূতা হইলেন এবং আশ্বাস প্রদান পূর্ব্বক পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ ভজনের মহিমা বর্ণনা করিয়া তাঁহাকে পুনরায় শ্রীকৃষ্ণ উপাসনার নিমিত্ত উপদেশ প্রদান করিলেন এবং পরে অন্তর্হিতা হইয়া গেলেন।

এইবার সকল সংশয়ের অবসান ঘটিল। আর কোন প্রকার দ্বিধা না করিয়া গোবিন্দ, পুত্র দিব্যসিংহের দ্বারায় রামচন্দ্রের উদ্দেশ্যে একখানি পত্র লিখাইলেন। আপনার ব্যাধির বিবরণ ও জীবনের সংশয় অবস্থার কথা জানাইয়া পরিশেষে আচার্য্য প্রভুকে সঙ্গে লইয়া পত্র পাঠ মাত্র বুধরীতে আগমন করিবার জন্য সকাতরে প্রার্থনা জানাইয়া পত্র লিখা হইল, পরে পাঁচজন কর্ম্মচারী পত্রখানি লইয়া যাজিগ্রাম অভিমুখে যাত্রা করিল। দ্বিজ হরিদাসাচার্য্যের উৎসব উপলক্ষ্যে আচার্য্য প্রভু, রামচন্দ্র এবং অন্যান্য ভক্তগণের সহিত যখন কাঞ্চনগড়িয়া যাত্রার উদ্যোগ করিতেছিলেন তখন পত্র-বাহকগণ আসিয়া পত্রখানি রামচন্দ্রের হস্তে প্রদান করে। রামচন্দ্র পত্রে সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া আচার্য্য প্রভুকে বিবৃত করিলে তিনি পত্রবাহকগণকে বলিয়া দিলেন যে তোমরা অগ্রে চলিয়া যাও, আমরা কাঞ্চনগড়িয়া হইয়া অবিলম্বে বুধরী যাত্রা করিব। পত্রবাহকগণ যথা সময়ে বুধরীতে উপনীত হইয়া দিব্যসিংহের নিকটে আচার্য্য প্রভুর আদেশ জ্ঞাপন করিল। তিনিও সেই সংবাদ গোবিন্দকে নিবেদন করিলেন, গোবিন্দ তাহা শ্রবণ করিয়া পরম পরিতৃপ্ত হইলেন এবং তাঁহাদের আশা পথ চাহিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। আচার্য্য প্রভু কাঞ্চনগড়িয়ার উৎসব সমাধা করিয়া সগণে বুধরীর পথে যাত্রা করিলেন।

দিব্যসিংহ আচার্য্য প্রভুর আগমন উপলক্ষ্যে গ্রামখানি বহু প্রকার মাঙ্গলিক চিহ্নাদির দ্বারায় সুসজ্জিত করিয়াছেন। প্রতি গৃহের দ্বারে দ্বারে পূর্ণ কুম্ভ তদুপরি নারিকেল সমন্বিত আম্রশাখা এবং কদলী বৃক্ষ রোপণ করা হইয়াছে, আম্রশাখার মালিকা রচনাপূর্ব্বক পথের দুই পার্শ্বে টাঙ্গাইয়া দেওয়া হইয়াছে। বুধরী গ্রামখানি যেন আনন্দ কোলাহলে মুখরিত হইয়া উঠিয়াছে। নিজগণের সহিত আচার্য্য প্রভু যথা সময়ে আসিয়া গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। আচার্য্য প্রভুর প্রতি গোবিন্দের এবং দিব্যসিংহের এই সমস্ত প্রীতির নিদর্শন দেখিয়া রামচন্দ্র আনন্দে পুলকিত হইলেন এবং কৌতুকী প্রভুর কৌতুকময় লীলা পরিপাটী দেখিয়া রামচন্দ্র প্রাণ ভরিয়া সেই করুণাময়ের জয় দিতে লাগিলেন। দিব্যসিংহ সংবাদ পাইয়াই ছুটিয়া আসিলেন এবং আচার্য্য প্রভুর চরণে সাষ্টাঙ্গে প্রণতঃ হইলেন। আচার্য্য প্রভুও তাঁহাকে তুলিয়া সস্নেহে আলিঙ্গন দিলেন। অতঃপর দিব্যসিংহ তাঁহাদিগকে বাটীতে লইয়া আসিয়া একে বারে গোবিন্দের শয্যা পার্শ্বে উপস্থিত করিলেন। ব্যাধির তীব্র আক্রমনে গোবিন্দের দেহে আর অবশিষ্ট কিছুই ছিল না। শয্যার উপরে উঠিয়া বসিবার শক্তিটুকুও আর তাঁহার নাই; একখানি চর্ম্মাবৃত কঙ্কাল যেন শয্যার উপরে শয়ন করাইয়া রাখা হইয়াছে। তাঁহার অবস্থা দেখিয়া সকলে মর্ম্মাহত হইলেন, রামচন্দ্র অলক্ষ্যে অশ্রু মার্জ্জন করিলেন। গোবিন্দের বাহ্যজ্ঞানটুকুও যেন ক্রমে লুপ্ত হইয়া আসিতেছিল। আচার্য্য প্রভু নিকটে আসিলে তাঁহাকে কোনও প্রকারে বুঝাইয়া দেওয়া হইল যে, আচার্য্য প্রভু আসিয়াছেন। শুনিয়া, কথা কয়টার তাৎপর্য্য অনুভব করিবার জন্য গোবিন্দ কয়েক মুহূর্ত্ত নীরব থাকিলেন, পরে দেখা গেল তাঁহার মুখ আনন্দের আবেগে প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। অতি কষ্টে নয়ন মেলিয়া তিনি ইতস্ততঃ দৃষ্টি সঞ্চালন করিতে লাগিলেন; অবশেষে আচার্য্য প্রভুর বদনমণ্ডলে আসিয়া তাহা স্থির হইল। গোবিন্দ আপনার শীর্ণ হাত দুইখানি অতি কষ্টে উঠাইয়া প্রণাম জানাইলেন এবং

সর্ব্বান্তঃকরণে তাঁহার চরণে আত্মসমর্পণ করিলেন। সেই আত্ম-নিবেদনের তৃপ্তিতে তাঁহার হৃদয়টী পরিপূর্ণ হইয়া গেল। দুই নয়নের প্রান্ত বাহিয়া অশ্রুর ধারা নামিতে লাগিল। গৃহের মধ্যে অখণ্ড নীরবতা বিরাজ কারতেছে, কিছুক্ষণ পর সকলে বুঝিলেন যে, গোবিন্দ আচার্য্য প্রভুকে যেন কিছু বলিবার চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু অত্যধিক দুর্ব্বলতা বশতঃই হোক্ অথবা সঙ্কোচ বশতঃই হোক্ তিনি মুখ ফুটিয়া কিছু বলিতে পারিলেন না। তবে তাঁহার অন্তরের এই প্রার্থনা আচার্য্য প্রভু বুঝিলেন ; বুঝিলেন, গোবিন্দ দীক্ষা প্রার্থনা করিতেছে। তিনি ইঙ্গিতে তাঁহার প্রার্থনায় সম্মতি প্রকাশ করিলেন। রামচন্দ্র অতঃপর আচার্য্য প্রভুর আদেশে গোবিন্দকে ধরিয়া উপবেশন করাইলেন এবং সেই অবস্থাতেই তাঁহাকে স্নান করাইয়া বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিয়া দেওয়া হইল। রামচন্দ্র তৎপরে তাঁহাকে ক্রোড়ে লইয়া উপবেশন করিলেন। আচার্য্য প্রভু সেই অবস্থাতেই তাঁহাকে যুগলমন্ত্রে দীক্ষা দান করিলেন। পরে রামচন্দ্র আচার্য্য প্রভুর চরণ রেণু লইয়া গোবিন্দের শিরে অর্পণ করিলেন এবং তাঁহাকে পুনরায় ধীরে ধীরে শয্যায় শয়ন করাইয়া দিলেন। আজ আচার্য্য প্রভু গোবিন্দকে অঙ্গীকার করিয়াছেন, গোবিন্দের মনোবাসনা আজ পূর্ণ হইল। এখন ব্যাধিকে তাঁহার আর ভয় নাই, মৃতুকেও আর ভয় নাই। তাঁহার শীর্ণ গণ্ডদেশ বাহিয়া প্রেমাশ্রুর ধারা নামিতে লাগিল, বদন মণ্ডল আনন্দে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল।

দিব্যসিংহ অতঃপর সকলকে সেখান হইতে লইয়া আসিয়া তাঁহাদের আহার ও বিশ্রামের যথাযথ ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। সকলের আন্তরিক প্রার্থনায় আচার্য্য প্রভু বুধরীতে কয়েক দিবস অবস্থান করিতে সম্মত হইলেন। দীক্ষার পর হইতেই করুণাময় প্রভুর ইচ্ছায় গোবিন্দের স্বাস্থ্যের অবস্থা দ্রুত পরিবর্ত্তিত হইতে লাগিল। অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই তিনি সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিলেন। মৃত্যু-কবলিত গোবিন্দ, আচার্য্য প্রভুর কৃপা প্রভাবে

পুনর্জীবন লাভ করিলেন। গোবিন্দ আরোগ্য লাভের পর হইতেই যেরূপ কঠোরতা ও নিষ্ঠা সহকারে যুগল ভজনে আত্ম-নিয়োগ করিয়াছিলেন সেরূপ দৃষ্টান্ত প্রকৃতই দুর্লভ। তিনি অতঃপর তাঁহার পাণ্ডিত্য এবং কবিত্ব প্রতিভাকে শ্রীগুরু বৈষ্ণব ও গৌর গোবিন্দ সেবায় প্রয়োগ করেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর সমসাময়িক এবং পরবর্ত্তী যে সকল পদকর্ত্তা আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ পদকর্ত্তারূপে তাঁহার নাম বৈষ্ণব জগতে চিরদিন স্মরণীয় হইয়া থাকিবে বৈষ্ণব সমাজে এবং সাহিত্য জগতে পদকর্ত্তা গোবিন্দ দাসের নাম এখনও সর্ব্বজন পরিচিত। তাঁহার রচিত পদাবলীগুলির মধ্যে যে সহজ সরল আন্তরিকতার প্রাণময় সুরটী পাওয়া যায় সেটী একান্তই দুর্লভ। সঙ্গীত মাধব নামে তাঁহার রচিত একখানি পাণ্ডিত্য ও কবিত্ব পূর্ণ নাটক আছে, তাহা ব্যতীত একান্নটী পদ সমন্বিত তাঁহার একান্নপদ নামক গ্রন্থখানিও বৈষ্ণব সমাজে সুপরিচিত। কবিত্ব প্রতিভায় তুষ্ট হইয়া আচার্য্য প্রভু তাঁহাকে 'কবিরাজ' উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন। পরবর্ত্তীকালে গোবিন্দ যখন শ্রীধামে গমন করিয়াছিলেন তখন গোস্বামিগণ কর্ত্তৃক এই উপাধি অনুমোদিত হয়। *

দীক্ষা প্রাপ্তির পর গোবিন্দ প্রেম বৈরাগ্যের পরিপূর্ণ আবেগে যে পদখানি রচনা করিয়াছিলেন এবং আচার্য্য প্রভুর করে সমর্পণ পূর্ব্বক নিজের অন্তরের অভিলাষ ব্যক্ত করিয়াছিলেন, সেই সুমধুর পদখানি এখনও ভক্তজনের মুখে মুখে ফিরিতেছে। পদখানি আমরা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

ভজহুঁ রে মন, নন্দ-নন্দন,
অভয় চরণারবিন্দ রে।
দুর্লভ মানব দেহ, সাধু সঙ্গ তরইতে,
এ ভব সিন্ধু রে॥

* কথিত আছে ইতিহাস বিশ্রুত যশোহররাজ প্রতাপাদিত্য গোবিন্দের বিশেষ বন্ধু ছিলেন এবং তিনি ধর্ম্ম বিষয়ে গোবিন্দ কর্ত্তৃক বিশেষ প্রভাবান্বিত হন।

শীত আতপ, বাত বরি খত,
এ দিন যামিনী জাগিরে।
বিফলে সেবিনু, কৃপণ দুর জন,
চপল সুখ লব লাগি রে ॥
এ ধন যৌবন, পুত্র পরিজন,
ইথে কি আছে পরতীত রে।
নলিনী দল জল, জীবন টল মল,
ভজহুঁ হরি পদ নিতি রে ॥
শ্রবণ কীর্ত্তন, স্মরণ বন্দন,
পাদ সেবন দাস্য রে।
পূজহুঁ সখীগণ, আত্ম নিবেদন,
গোবিন্দ দাস অভিলাষ রে ॥

খেতুরী মহোৎসব। *

ঠাকুর মহাশয় লীলাস্থলী পরিভ্রমণের পর যাজিগ্রামে আসিয়া আচার্য্য প্রভুর সহিত মিলিত হইয়াছিলেন। তাহার পর এই দীর্ঘকালের মধ্যে আর তাঁহাদের পরস্পর সাক্ষাৎ হয় নাই। এই সময়ের মধ্যে আচার্য্য প্রভুর মাতৃ-বিয়োগ, বিবাহ, সরকার ঠাকুর মহাশয়, দাস গদাধর এবং হরিদাসাচার্য্যের তিরোভাব প্রভৃতি বহু

* খেতুরী মহোৎসবের কাল নির্ণয়ে ঐতিহাসিকগণের মধ্যে সামান্যই মতভেদ আছে। শ্রীগৌরপদ-তরঙ্গিনীর প্রকাশক জগদ্বন্ধু ভদ্র মহাশয়ের মতে ১৫০৪ শকের অল্প কিছু পরে মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এই মতের সহিত আমাদের সিদ্ধান্তের বিরোধ নাই। বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের মতে (৩৩১ পৃঃ ১৫০৪ শকে এবং বৃহৎ বঙ্গে (৭৫৮ পৃষ্ঠায়) লিখিত আছে ১৫০৫ শকাব্দায় মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে। বুধরীতে কয়েকদিন নাম সঙ্কীর্ত্তন এবং পাঠ প্রসঙ্গে অতিবাহিত করিয়া আচার্য্য "প্রভু একদিন খেতুরীতে ঠাকুর মহাশয়ের নিকটে যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। ইতঃপূর্ব্বে যাজিগ্রামে আসিয়া ঠাকুর মহাশয় আচার্য্য প্রভুর নিকটে শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা এবং সেবা প্রকাশের যে অভিলাষ নিবেদন করিয়াছিলেন তাঁহার সে অভিলাষ এখনও পূর্ণ হয় নাই, সেই কারণেও তাঁহার একবার খেতুরী গমন করা আবশ্যক। একদিন তিনি স্বগণে খেতুরী রওনা হইবার নিমিত্ত প্রস্তুত হইতেছেন এমন সময়ে দুর্গাদাস নামক ঠাকুর মহাশয়ের জনৈক শিষ্য খেতুরী হইতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি আসিয়া বলিলেন 'আপনি বুধরীতে শুভাগমন করিয়াছেন, এই সংবাদ ঠাকুর মহাশয় শুনিয়াছেন। যদিও তিনি জানেন যে আপনি এখান হইতে অবশ্যই খেতুরী যাইবেন, তথাপি ব্যগ্রতা বশতঃ তিনি নিজেই আসিতেছেন। অদ্যই তিনি পদ্মা অতিক্রম করিবেন এবং কল্য প্রভাতে আসিয়া আপনার সহিত মিলিত হইবেন।' এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া সকলেই পরম প্রীত হইলেন। অতঃপর ঠাকুর মহাশয়ের সঙ্কল্পিত বিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা বিষয়ক প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইল। দুর্গাদাস বলিলেন— ঠাকুর মহাশয়ের পরম অনুগত সেবক সন্তোষ দত্ত, তাঁহার মনোবৃত্তি অনুসারে বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার সমস্ত আয়োজন বিশেষভাবেই করিয়াছেন। নূতন শ্রীমন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে। এখন আপনি উপস্থিত হইলেই সঙ্কল্পিত কার্য্য আরম্ভ হইবে।

আচার্য্য প্রভু পরদিন প্রত্যূষে রামচন্দ্র এবং ব্যাসাচার্য্যকে ঠাকুর মহাশয়ের উদ্দেশ্যে পাঠাইয়া দিয়া নিজে তাঁহার আগমন প্রত্যাশায় অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। রামচন্দ্র ইতঃপূর্ব্বে ঠাকুর মহাশয় সম্বন্ধে সকল কথাই শুনিয়াছেন। তাঁহার অদ্ভুত বৈরাগ্যের কথা, গুরু নিষ্ঠার কথা, আচার্য্য প্রভুর প্রতি অসাধারণ ভক্তি এবং ভজন নিষ্ঠার কথা প্রভৃতি শুনিয়াছেন। সেই সমস্ত কথা তিনি যতই

শুনিয়াছেন, তাঁহার প্রতি ততই আকৃষ্ট হইয়াছেন এবং দর্শন লাভের নিমিত্ত ততই ব্যাকুল হইয়াছেন। কিন্তু সুযোগের অভাব বশতঃ এখনও তাঁহাদের মিলন হয় নাই। 'অদ্য অবিলম্বেই তাঁহার দর্শন পাইব' এই কথা রামচন্দ্র যতই ভাবিতেছেন ততই আনন্দে আত্মহারা হইতেছেন। বিশেষতঃ পূর্ব্বরাত্রের ঘটনায় তাঁহার অন্তরের উৎকণ্ঠা আরও যেন বাড়িয়া উঠিয়াছে। গতরাত্রে নিত্যকৃত্যাদি সমাধা করিয়া তিনি যথারীতি শয়ন করিয়াছিলেন। সেই সময় তন্দ্রাবেশের মধ্যে অকস্মাৎ শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বয়ং আবির্ভূত হইয়া তাঁহাকে উদ্দেশ্য করিয়া বলেন—'আগামী কল্য নরোত্তমের সহিত তোমার মিলন হইবে। নরোত্তম তোমার নিত্য সঙ্গী। তাহার সহিত মিলন হইবামাত্র যাবতীয় পূর্ব্বলীলা রহস্য তোমাদের মনে স্ফূর্ত্তিলাভ করিবে।' কথিত আছে, সেই সময়ে রামচন্দ্র শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপায় আচার্য্য প্রভুর স্বরূপ রহস্যও অবগত হইয়াছিলেন। পূর্ব্ব রাত্রির ঘটনার বিষয় চিন্তা করিতে করিতে রামচন্দ্র ব্যাসাচার্য্যকে সঙ্গে লইয়া আনন্দে পূর্ণ হইয়া দ্রুত গতিতে চলিয়াছেন। এদিকে ঠাকুর মহাশয় প্রভাতেই যাজিগ্রাম অভিমুখে যাত্রা করিয়াছিলেন। সুতরাং অল্পক্ষণের মধ্যে সেই পথের উপরেই পরস্পরের সাক্ষাৎ হইয়া গেল। রামচন্দ্র এতদিন ধরিয়া এইরূপ গভীরভাবে ঠাকুর মহাশয়ের বিষয়ে অনুধ্যান করিয়াছিলেন যে—তাহার ফলে তাঁহার মূর্ত্তিখানি রামচন্দ্রের হৃদয়ে সর্ব্বদাই প্রকাশিত হইয়া থাকিত। রামচন্দ্র প্রথম দর্শনেই তাঁহাকে চিনিলেন। পরিচয় গ্রহণ করিবার কিছুমাত্র আবশ্যক হইল না। দ্রুত গতি অগ্রসর হইয়া রামচন্দ্র তাঁহার চরণে পতিত হইলেন। ঠাকুর মহাশয়ও স্নেহরসে বিগলিত হইয়া তাঁহাকে তুলিয়া আলিঙ্গনাবদ্ধ করিলেন। উভয়ের নয়নে প্রেমের ধারা বহিতে লাগিল। তখন তাঁহাদিগকে দেখিয়া সকলের মনে এই ভাবই জাগিতে লাগিল যে, তাঁহারা যেন পরস্পরকে বুকে পাইয়া বহুদিনের অতৃপ্ত বাসনা প্রাণ ভরিয়া তৃপ্ত করিয়া লইতেছেন। বিরহ কাতর রামচন্দ্র ও ঠাকুর

মহাশয়, তাঁহাদের দীর্ঘ দিনের অভাবটাকে পুনর্মিলনের আনন্দ দিয়া যেন ভরিয়া লইতেছেন ব্যাসাচার্য্য প্রভৃতি যাঁহারা নিকটে ছিলেন, তাঁহাদের সেই প্রেমময় অবস্থা দর্শন করিয়া সকলেই অভিভূত হইয়া পড়িলেন।

পরস্পর কুশলাদি বিনিময়ের পর সকলে ঠাকুর মহাশয়কে সঙ্গে লইয়া বুধরী অভিমুখে অগ্রসর হইতে হইতে অল্পকালের মধ্যেই আচার্য্য প্রভুর নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ঠাকুর মহাশয়ের জন্য তিনি অপেক্ষা করিয়াই বসিয়া ছিলেন। ঠাকুর মহাশয় তাঁহাকে প্রণাম করিলে তিনি তাঁহাকে উঠাইয়া সাগ্রহে আলিঙ্গন করিলেন। দীর্ঘ অদর্শনের পর এই মিলনে তাঁহাদের অন্তরে আনন্দের তরঙ্গ উঠিল ভাবাবেশে দেহ কম্পিত হইতে লাগিল। উভয়ের দেহ উভয়ের নয়ন ধারায় সিক্ত হইয়া উঠিল। রামচন্দ্র নিকটে দাঁড়াইয়া এই প্রেমমিলন দেখিতেছেন আর পুনঃ পুনঃ অশ্রু মার্জ্জন করিতেছেন। আচার্য্য প্রভুর প্রতি ঠাকুর মহাশয়ের ভক্তি এবং ঠাকুর মহাশয়ের প্রতি আচার্য্য প্রভুর স্নেহের গভীরতা কতখানি, এই মিলন দৃশ্য দেখিয়াই তিনি তাহা অনুভব করিতে পারিলেন। অতঃপর সকলে একত্র হইয়া উপবেশন করিলে, নানা বিষয়ে আলোচনা চলিতে লাগিল। আচার্য্য প্রভু তাঁহার বৃন্দাবন ভ্রমণের কথা, লোকনাথ প্রভুর এবং অন্যান্য সমস্ত বিবরণ ঠাকুর মহাশয়কে শ্রবণ করাইলেন। আচার্য্য প্রভুর বিবাহ বার্ত্তাও ঠাকুর মহাশয় কথা প্রসঙ্গে শ্রবণ করিলেন। অতঃপর ঠাকুর মহাশয়ের বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা বিষয়ক আলোচনা আরম্ভ হইল। ঠাকুর মহাশয় তখন ভক্তি বিগলিত কণ্ঠে ধীরে ধীরে এক আশ্চর্য্য কাহিনী বিবৃত করিলেন। তিনি আচার্য্য প্রভুকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—শ্রীধাম হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের সময় শ্রীগুরুদেব আদেশ করিয়াছিলেন 'নরোত্তম, তুমি খেতুরী গমন পূর্ব্বক সেখানে শ্রীগৌরাঙ্গ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিয়া সেবা প্রকাশ করিবে। পরে যুগল বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিয়া তাঁহাদেরও যথোপযুক্ত সেবার ব্যবস্থা করিও।' শ্রীগুরুদেবের সেই আদেশ বাক্য

অনুসারে এবং আপনার ইঙ্গিত ক্রমে, নীলাচলাদি ভ্রমণের পর যাজিগ্রামে আপনার শ্রীচরণ দর্শনান্তে খেতুরীতে গিয়া আমি সেই চেষ্টাতেই নিযুক্ত ছিলাম। ইতোমধ্যে একদিন স্বপ্নযোগে—এই পর্য্যন্ত বলিয়া ঠাকুর মহাশয় ভাবাবিষ্ট হইয়া পড়িলেন, আবেগে তাঁহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গেল। নয়নে প্রবল ধারায় অশ্রু নির্গত হইতে লাগিল। অকস্মাৎ তাঁহার এইরূপ অবস্থা দেখিয়া সকলে বিস্মিত হইলেন এবং তাঁহার অবশিষ্ট কাহিনীটুকু শ্রবণ করিবার নিমিত্ত ব্যগ্র হইয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পর ভাবাবেগ সংযত করিয়া ঠাকুর মহাশয় পুনরায় বলিতে আরম্ভ করিলেন, তিনি বলিলেন—'প্রিয়াজী সহ শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং বল্লভীকান্ত, শ্রীকৃষ্ণ, ব্রজমোহন, রাধাকান্ত ও রাধারমণ ইঁহারা সকলেই একদিন স্বপ্নযোগে যুগল স্বরূপে আসিয়া আমাকে দর্শন দিলেন এবং তাঁহাদের বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিবার নিমিত্ত আমাকে আদেশ প্রদান করিলেন। তাঁহাদের আদেশ অনুসারে আমি ভাস্কর ডাকিয়া শ্রীমূর্ত্তি নির্ম্মাণের ব্যবস্থা করিলাম। প্রিয়াজী সহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর মূর্ত্তি ব্যতাত অন্য সকল মূর্ত্তিই প্রকাশিত হইলেন। তাঁহাদের অপরূপ লাবণ্যময়ী আকৃতি দেখিয়া আমি আনন্দে আত্মহারা হইলাম। ইঁহাদের মূর্ত্তি নির্ম্মাণ শেষ করিয়া ভাস্কর প্রিয়াজী সহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিলেন। মূর্ত্তি নির্ম্মিত হইলেন বটে, কিন্তু সেই মূর্ত্তির লাবণ্যহীন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের অবস্থা দেখিয়া আমি বড়ই বেদনা অনুভব করিতে লাগিলাম। আমি কোন প্রকারেই সেগুলিকে আমার প্রভু এবং প্রিয়াজীর মূর্ত্তি বলিয়া ধারণা করিতে সমর্থ হইলাম না। প্রভু কেন প্রকাশিত হইলেন না, আমার কোন অপরাধে এইরূপ অঘটন ঘটিল। অতঃপর কি উপায় হইবে, কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া আমি ব্যাকুল হইয়া উঠিলাম এবং নিরন্তর প্রভুর চরণে প্রার্থনা জানাইতে লাগিলাম। এইরূপে কয়েকদিন অতিবাহিত হইলে পর একদিন প্রভু স্বপ্নযোগে আবির্ভূত হইয়া আমাকে বলিলেন 'নরোত্তম, তুমি আমার মূর্ত্তি

নির্ম্মাণের চেষ্টা ছাড়িয়া দাও। আমি যখন সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলাম তাহার কিছুকাল আগে আমার দ্বিতীয় দেহ প্রকাশ করিয়া গঙ্গাগর্ভে রাখিয়া গিয়াছিলাম। এখন সেই মূর্ত্তিখানি তোমার নিমিত্ত তোমারই প্রতিবেশী বিপ্রদাসের ধান্য গোলার মধ্যে রক্ষিত আছে। তুমি সেই মূর্ত্তি আনয়ন পূর্ব্বক প্রতিষ্ঠা কর।' এই কথা বলিয়া প্রভু অন্তর্হিত হইলেন, সঙ্গে সঙ্গে আমারও নিদ্রাভঙ্গ হইল। আনন্দের আবেগে আমি তৎক্ষণাৎ শয্যা ত্যাগ করিয়া স্নানান্তে বিপ্রদাসের ধান্য গোলায় গিয়া উপস্থিত হইলাম এবং যথাস্থানে প্রিয়াজী সহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিগ্রহ লাভ করিলাম। সেই মূর্ত্তি-যুগলের অপরূপ রূপলাবণ্য এবং মাধুর্য্য দর্শন করিয়া আমি আনন্দে আত্মহারা হইয়া সেই দিনেই তাঁহাদিগকে লইয়া আসিয়াছি।' ঠাকুর মহাশয়ের মুখে বিগ্রহগণের আবির্ভাবের এইরূপ অলৌকিক কাহিনী শ্রবণ করিয়া সকলে বিস্মিত হইলেন এবং প্রভুর অপরিমেয় করুণার কথা স্মরণ করিতে করিতে অশ্রু মোচন করিতে লাগিলেন। ঠাকুর মহাশয় বলিলেন 'আগামী ফাল্গুনী পূর্ণিমায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব তিথিতে উৎসবের দিন নির্দ্ধারিত হইয়াছে। উৎসবের আয়োজনও প্রায় সম্পূর্ণ হইয়াছে।' আচার্য্য প্রভুর প্রতি লক্ষ্য করিয়া ঠাকুর মহাশয় বলিলেন—'আয়োজন সম্পূর্ণ হইলেও আপনার অনুপস্থিতি বশতঃ এখনও নিমন্ত্রণ-পত্রী কোথাও প্রেরিত হয় নাই। আমাদের সামর্থ্য অনুসারে যতদূর সম্ভব আয়োজন করিয়াছি। অতঃপর আপনি স্বয়ং সেখানে উপস্থিত হইয়া যেরূপ আদেশ করিবেন সেইরূপ করিব।'

আসন্ন উৎসব সংক্রান্ত নানাপ্রকার আলোচনার মধ্যে সেদিন অতীত হইল। রাত্রিতে সকলে যথাস্থানে শয়ন করিলেন। উদ্বেগ বশতঃ সে রাত্রি আচার্য্য প্রভু এক প্রকার বিনিদ্রভাবেই অতিবাহিত করিলেন। কথিত আছে সেই রাত্রে শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহাকে দর্শন দান করেন এবং উৎসবের ব্যবস্থাদি করিবার নিমিত্ত উৎসাহিত করেন। পরদিবস রামচন্দ্র, আচার্য্য প্রভুর আদেশে সুললিত সংস্কৃত শ্লোকে

নিমন্ত্রণ পত্র রচনা করিয়া ঠাকুর মহাশয়কে দিলেন। তিনি সেই পত্রের প্রতিলিপি লিখাইয়া আচার্য্য প্রভুর আদেশ অনুসারে বিভিন্ন স্থানে নিমন্ত্রণ পাঠাইয়া দিলেন। নবদ্বীপ, কাটোয়া, শান্তিপুর, শ্রীখণ্ড, উড়িষ্যা এবং অন্যান্য যে সমস্ত স্থানে প্রভুর পরিকরগণ, বৈষ্ণব ও মোহান্তগণ ছিলেন, সর্ব্বত্র পত্র প্রেরিত হইল। দুই এক দিনের মধ্যেই আচার্য্য প্রভু, ব্যাসাচার্য্য ও রামচন্দ্র প্রভৃতির সহিত ঠাকুর মহাশয়কে খেতুরীতে পাঠাইয়া দিলেন। কয়েক দিন পর তিনিও খেতুরী যাইবেন এইরূপ স্থির হইল। কথিত আছে এই সময়ে আচার্য্য প্রভু রামচন্দ্রকে ঠাকুর মহাশয়ের করে সমর্পণ করিয়াছিলেন।

ঠাকুর মহাশয় প্রভৃতির খেতুরী গমনের পর আচার্য্য প্রভু যে কয়দিন বুধরীতে ছিলেন, সেই কয়দিনও নাম সঙ্কীর্ত্তন ও পাঠ প্রসঙ্গে গ্রাম মুখরিত হইয়া রহিল। বুধরীর অদূরবর্ত্তী বাহাদুরপুর গ্রামে বংশী দাস চক্রবর্ত্তী নামে জনৈক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির বাস ছিল। এই সময় একদিন রাত্রে আচার্য্য প্রভু স্বপ্নযোগে তাঁহাকে দর্শন দান পূর্ব্বক কৃপা করেন, পরদিন প্রত্যূষে তিনি আসিয়া তাঁহার শরণাপন্ন হইলে আচার্য্য প্রভু দীক্ষা দান পূর্ব্বক তাঁহাকে অঙ্গীকার করেন। সে দিবসে আরও অনেকে তাঁহার নিকটে দীক্ষা লাভ করিয়াছিলেন। কয়েক দিবস পরে গোবিন্দ প্রভৃতির সহিত আচার্য্য প্রভু একদিন খেতুরী আগমন করেন। তাঁহাদের আগমন সংবাদ শ্রবণ করিয়া সন্তোষ দত্ত, ঠাকুর মহাশয় প্রভৃতি সকলে অগ্রসর হইয়া তাঁহাদিগকে সমাদর করিয়া লইয়া আসিলেন।

বুধরীতে আসিয়াই আচার্য্য প্রভু বিগ্রহগণকে দেখিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে, সন্তোষ দত্ত প্রভৃতি সকলে তাঁহাকে যথাস্থানে লইয়া আসিয়া শ্রীমূর্ত্তি সমূহ দর্শন করাইলেন। অতি মনোহর সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর বিগ্রহগুলি দর্শন করিয়া তিনি পরম আনন্দ লাভ করিলেন। ইতঃপূর্ব্বে আচার্য্য প্রভু ও তাঁহার সেবকবৃন্দের জন্য যে গৃহ নির্ম্মিত হইয়াছিল, অতঃপর তাঁহাদিগকে সেই স্থানে আনয়ন পূর্ব্বক তাঁহাদের

আহারাদি ও বিশ্রামের ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া হইল। উৎসবের এখনও কয়েকদিন বিলম্ব আছে, বিদেশীয় ভক্তগণ একে একে আসিতেছেন। আচার্য্য প্রভুর আদেশানুসারে ঠাকুর মহাশয়, সন্তোষ দত্ত, রামচন্দ্র প্রভৃতি সকলে তাঁহাদের বাসস্থান এবং সেবা পরিচর্য্যাদির যথাযোগ্য ব্যবস্থা করিয়া দিতে লাগিলেন। তাঁহাদের আন্তরিক সেবা প্রচেষ্টা, সুব্যবস্থা এবং আয়োজনের প্রাচুর্য্য দেখিয়া সকলেই পরম পরিতৃপ্ত হইলেন।

কয়েক দিনের মধ্যেই নিমন্ত্রিত সাধু, মোহান্ত ও বৈষ্ণগণের শুভাগমনে খেতুরী আনন্দ কলরবে মুখরিত হইয়া উঠিল। শ্যামানন্দ উড়িষ্যা হইতে একদিন রসিকানন্দ, কিশোরী দাস প্রভৃতি ভক্তগণকে সঙ্গে লইয়া আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অম্বিকা কালনা হইতে শ্যামানন্দের গুরুদেব হৃদয় চৈতন্য প্রভু, শান্তিপুর হইতে অদ্বৈত প্রভুর সন্তান অচ্যুতানন্দ প্রভু গোপাল দাস প্রভু প্রভৃতি প্রভু পাদগণ শান্তিপুরবাসী ভক্তবৃন্দ ও শিষ্যগণের সহিত আগমন করিলেন। শ্রীপাট খড়দহ হইতে আসিলেন জাহ্নবা দেবী; বৃন্দাবন দাস, বলরাম দাস প্রভৃতি ভক্তগণ তাঁহার সহিত আগমন করিলেন। শ্রীপতি, শ্রীনিধি প্রভৃতি শ্রীমন্মহাপ্রভুর পরিকরগণ নবদ্বীপ হইতে আগমন করিলেন। আকাইহাট গ্রামবাসী কৃষ্ণদাস, স্থানীয় ভক্তবৃন্দ সহ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কাটোয়া হইতে যদুনন্দন, শ্রীখণ্ড হইতে রঘুনন্দন ও লোচনানন্দ, শ্রীখণ্ডবাসী ভক্তগণ সহ আসিলেন। শত শত সাধু মোহান্ত ও বৈষ্ণবগণের আগমনে খেতুরাতে যেন আনন্দের হাট বসিয়া গেল। শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রকটকালে রথযাত্রা উৎসবটীকে উপলক্ষ্য করিয়া গৌড়ীয় ভক্তগণ প্রভুর চরণ দর্শনের নিমিত্ত শ্রীক্ষেত্রে আসিয়া সকলে একত্র হইতেন। প্রভুর অন্তর্ধানের পর হইতে এই দীর্ঘকালের মধ্যে এত বড় ভক্ত সম্মিলন আর হয় নাই, বিশেষতঃ এই কারণেও খেতুরী মহোৎসবটী বৈষ্ণব জগতের এক অন্যতম স্মরণীয় ঐতিহাসিক ঘটনা হইয়া রহিয়াছে।

সমাগত ভক্তবৃন্দ ও প্রভুপাদগণের সেবা পরিচর্য্যাদি পরিদর্শনের নিমিত্ত প্রতি গৃহে অন্ততঃ একজন করিয়া স্থানায় ব্যক্তি সর্ব্বদা নিযুক্ত রহিলেন। রামচন্দ্র, শ্যামানন্দ, ব্যাসাচার্য্য, গোবিন্দ প্রভৃতি সকলেই এক এক গৃহে নিযুক্ত হইলেন। প্রতি গৃহে পৃথক পৃথক ভাণ্ডারের ব্যবস্থা করা হইল, প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সেইখান হইতে সকলকে সরবরাহ করা হইতে লাগিল। বৃদ্ধ রাজা কৃষ্ণানন্দ, সন্তোষ দত্ত, ঠাকুর মহাশয়, আচার্য্য প্রভু প্রভৃতি সকলে ঘুরিয়া ঘুরিয়া সেবা পরিচালনা করিতে লাগিলেন।

এইরূপে নির্দ্ধারিত তিথির বহু পূর্ব্ব হইতে খেতুরীতে আনন্দের হাট বসিয়া গেল। শুক্লা পঞ্চমীর দিন কয়েক দল বাদ্যকর তাহাদের বাদ্যভাণ্ডাদি সহ আসিয়া উপস্থিত হইল। রাজা কৃষ্ণানন্দের আদেশে তাহারা নৃত্য গীতাদির সহিত বাদ্য কোলাহলে খেতুরী মুখরিত করিয়া দিল। এইরূপ আনন্দময় পরিবেশের মধ্য দিয়া চতুর্দ্দশী অতীত হইল।

আজ দোল পূর্ণিমা, প্রেমাবতার শ্রীমন্মহাপ্রভুর শুভ আবির্ভাব দিবস। ছয় বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিয়া ঠাকুর মহাশয় সেই পবিত্র তিথিটীকে আরও একবার সুচিহ্নিত করিয়া দিলেন। ঊষাকালে স্নান ও প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপনের পর সকলে নব নির্ম্মিত মন্দিরে আসিয়া সমবেত হইলেন। নূতন বস্ত্র, প্রসাদী চন্দন এবং মাল্যাদির দ্বারায় সকলকে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করা হইল। কদলী বৃক্ষ আম্র মালিকা, নারিকেল ও পূর্ণ কুম্ভাদির দ্বারা মন্দির প্রাঙ্গণ অতি অপরূপ ভাবে সজ্জিত করা হইয়াছে। সুচিত্রিত চন্দ্রাতপ দ্বারা প্রাঙ্গণের উপরিভাগ আবৃত। সুগন্ধি ধূপাদির গন্ধে চারিদিক আমোদিত হইয়া উঠিয়াছে। ভক্তবৃন্দ সহ প্রভু পাদগণ নববস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক মাল্য চন্দনাদির দ্বারা পরিশোভিত হইয়া সকলে মন্দির প্রাঙ্গণে উপবেশন করিলে, অতি রমণীয় পরিবেশের সৃষ্টি হইল। স্ত্রী ভক্ত পরিবৃতা হইয়া জাহ্নবা ঠাকুরাণী আসিয়া অন্তরালে উপবেশন

করিলেন। 'শ্রীবিগ্রহগণের অভিষেক কার্য্য কে করিবেন', প্রভুপাদগণের নিকটে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হইলে, তাঁহারা সকলে একবাক্যে আচার্য্য প্রভুকে নির্ব্বাচন করিলেন। আচার্য্য প্রভু তখন তাঁহাদের আদেশ বাক্য শিরোধার্য্য করিয়া লইলেন। আচার্য্য প্রভু প্রথমে তাঁহাদের উদ্দেশ্যে প্রণাম করিলেন, তৎপরে মন্দিরের ভিতর প্রবেশ করিয়া শ্রীবিগ্রহগণের উদ্দেশ্যে প্রণত হইলেন। শ্রীরূপ গোস্বামি-কৃত বিধি অনুসারে অভিষেক কার্য্য আরম্ভ হইল। যথাবিধি অভিষেকাদির পর আচার্য্য প্রভু মূল্যবান বস্ত্র এবং অলঙ্কারাদি দ্বারা শ্রীবিগ্রহগণকে সুসজ্জিত করিলেন। ঠাকুর মহাশয় স্বপ্নযোগে শ্রীবিগ্রহগণের যে নামগুলি শ্রবণ করিয়াছিলেন, সেই সেই নাম উল্লেখ পূর্ব্বক আচার্য্য প্রভু দশাক্ষর গোপাল মন্ত্র সহযোগে বিগ্রহগণের পূজা করিলেন। বস্ত্র, অলঙ্কার, পুষ্প ও চন্দনাদির দ্বারায় সুসজ্জিত বিগ্রহগণের অপরূপ সৌন্দর্য্য দর্শন করিয়া ভক্তগণ মুহুর্মুহুঃ জয়ধ্বনি দিতে লাগিলেন। বেদবিদ্ ব্রাহ্মণগণের বেদ পাঠ, হরিধ্বনি, শঙ্খধ্বনি এবং বিবিধ বাদ্যধ্বনির মধ্যে পূজা সমাপ্ত হইল। অবশেষে ভোগ ও আরতি সমাপন পূর্ব্বক আচার্য্য প্রভু অঙ্গণে আসিয়া শ্রীবিগ্রহগণের উদ্দেশ্যে সাষ্টাঙ্গে প্রণত হইলেন। তখন প্রভুপাদগণের সহিত অন্যান্য সকলেও ভূলুণ্ঠিত হইয়া প্রণাম করিলেন। ঠাকুর মহাশয় অশ্রু-কম্প পুলকাদি পূর্ণ কলেবরে সাশ্রু গদ গদ কণ্ঠে প্রণাম মন্ত্র উচ্চারণ করিতে লাগিলেন।

গৌরাঙ্গ বল্লভীকান্ত শ্রীকৃষ্ণ ব্রজমোহন।
রাধারমণ হে রাধে রাধাকান্ত নমোঽস্তুতে ॥

প্রভুপাদগণ অতঃপর নাম সংকীর্ত্তন আরম্ভ করিবার জন্য ঠাকুর মহাশয়কে আদেশ প্রদান করিলেন এবং সকলে চন্দ্রাতপের নিম্নে আসিয়া মণ্ডলী বদ্ধ হইয়া দাঁড়াইলেন। ঠাকুর মহাশয় তখন নতশিরে এবং অতি দীন ভাবে সকলের মধ্য স্থলে আসিয়া দাঁড়াইলেন। রঘুনন্দন তৎপরে নব নির্ম্মিত খোল করতালাদির পূজা এবং যথাবিধি

মঙ্গলাচরণ করিয়া ভক্তবৃন্দের হাতে হাতে তুলিয়া দিলেন। দেবীদাস, বল্লভ প্রভৃতি বিখ্যাত মৃদঙ্গ বাদকগণ খোল ও মৃদঙ্গ ; গৌরাঙ্গ দাস প্রভৃতি ভক্তগণ করতালাদি গ্রহণ পূর্ব্বক, ঠাকুর মহাশয়কে বেষ্টন করিয়া দাঁড়াইলেন। রঘুনন্দন আসিয়া ঠাকুর মহাশয়ের গলায় প্রসাদী মালা এবং ললাটে চন্দন লেপন করিয়া দিলে, ঠাকুর মহাশয় তাঁহাকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন। অতঃপর তিনি প্রভুপাদ ও বৈষ্ণবগণের উদ্দেশ্যে প্রণাম পূর্ব্বক মনে মনে তাঁহাদের নিকট হইতে কৃপা শক্তি প্রার্থনা করিয়া সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। প্রথমে ঠাকুর মহাশয়ের শিষ্য গোকুল দাস, তাঁহার ইঙ্গিতক্রমে কিছুক্ষণ বিবিধ রাগ রাগিনী অবলম্বনে পদাবলী কীর্ত্তন করিলেন, পরে ঠাকুর মহাশয় নিজেই গাহিতে আরম্ভ করিলেন। অগণিত ভক্তবৃন্দের শ্রবণে ঠাকুর মহাশয়ের সেই প্রেম মধুর কণ্ঠের ধ্বনি প্রবিষ্ট হইয়া তাঁহাদিগকে ভাবাবেশে বিহ্বল করিয়া দিতে লাগিল। সঙ্কীর্ত্তন ও তাহার ইতিহাস বিষয়ে যাঁহারা সংবাদ রাখেন, বিখ্যাত 'গড়ান হাটি' কীর্ত্তনের কথা তাঁহারা সকলেই অবগত আছেন। গড়ের হাট পরগণায় এই জাতীয় কীর্ত্তনের উদ্ভব হয় বলিয়া ইহার এই নামেই প্রসিদ্ধি। ঠাকুর মহাশয়ই এই কীর্ত্তনের প্রবর্ত্তক। তাঁহার নিজস্ব সুর ও তালের একটী বিশেষ পদ্ধতি ছিল, তাহার সহিত তাঁহার অপরূপ কণ্ঠ ধ্বনি ও প্রেমোন্মাদনাকারী শক্তির সম্মিলনে তাঁহার প্রবর্ত্তিত এই গড়ান হাটি' কীর্ত্তন তখন একটি বিশিষ্ট রূপ লইয়াই জন সমাজে প্রকটিত হয়। ঠাকুর মহাশয়ের প্রেমময় কণ্ঠের ধ্বনি ক্রমে উচ্চ হইতে উচ্চতর গ্রামে উঠিতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে যেন এক অনির্ব্বচনীয় শক্তির প্রভাবে শ্রোতৃমণ্ডলী ধীরে ধীরে স্থূল রাজ্য হইতে যেন ভাব রাজ্যের দিকে অগ্রসর হইয়া চলিলেন। একে একে সকলেই ভাবাবেশে আচ্ছন্ন হইয়া বাহ্যজ্ঞান শূন্য হইয়া পড়িলেন। সঙ্কীর্ত্তন অব্যাহত গতিতে চলিতে লাগিল। সকলেরই নয়নে প্রেমের ধারা। প্রেম মদিরা পানে সকলেই উন্মত্ত। সেই উন্মত্ততা যেন ক্রমেই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে

লাগিল এবং তাঁহাদের ভাব সংবরণের শক্তি ক্রমে অন্তর্হিত হইয়া আসিতে লাগিল। আনন্দে বিবশ হইয়া সকলে নৃত্য করিতে লাগিলেন। সেই প্রেম তরঙ্গে নৃত্য করিতে করিতে কেহ কেহ এক একবার উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিতেছেন, কহবা এইরূপ কাতর কণ্ঠে রোদন করিতেছেন যে তাহা শ্রবণ করিলে পাষাণও বিদীর্ণ হইয়া যায়, কেহ বা গভীর মূর্চ্ছায় আক্রান্ত হইয়া ধূলি ধূসরিত অবস্থায় ভূমিতে পড়িয়া আছেন, পরে আপনি চৈতন্য লাভ করিয়া পুনরায় নৃত্য কীর্ত্তনে যোগদান করিতেছেন, সঙ্কীর্ত্তনৈকপিতা শ্রীমন্মহাপ্রভু সপার্ষদে সর্ব্বদা এবং সর্ব্বত্র তাঁহার অভিন্ন স্বরূপ শ্রীশ্রীনাম সঙ্কীর্ত্তনে বিহার করেন; ইহা শাস্ত্র সিদ্ধান্ত হইলেও তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ অতীব বিরল, কিন্তু অদ্য সেই সিদ্ধান্ত জগতে সুসত্য ও সুপ্রচারিত করিবার জন্য তিন প্রভু সপার্ষদে সঙ্কীর্ত্তন মধ্যে অবতীর্ণ হইয়া নৃত্য করিলেন। সঙ্কীর্ত্তনোন্মত্ত ভক্তগণ অকস্মাৎ দেখিলেন,—সঙ্কীর্ত্তনের মধ্যস্থলে শ্রীমন্মহাপ্রভু, শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু, শ্রীলঅদ্বৈত প্রভু প্রভৃতি সকলে তাঁহাদের প্রকট অপ্রকটগণের সহিত নৃত্য করিতেছেন। তাঁহাদের জ্যোতির্ম্ময় অঙ্গকান্তি এবং প্রেমবৈভব দর্শনে সকলের বাহ্যদৃষ্টি লুপ্ত হইল। ভক্তের আকর্ষণে আজ প্রকটলীলা এবং অপ্রকটলীলা একীভূত হইয়া গেল! অশ্রু কম্প পুলকাদিতে বিভূষিত হইয়া ভক্তগণ আনন্দে উন্মত্তের ন্যায় নৃত্য করিতে লাগিলেন। বাহ্যানুসন্ধান রহিত হইয়া তাঁহারা নৃত্য করিতেছেন, কিন্তু দৃষ্টি তাঁহাদের স্থির হইয়া আছে সঙ্কীর্ত্তনের মধ্যস্থলে। তাঁহারা দেখিতে লাগিলেন প্রভু নৃত্য করিতেছেন, আর মধ্যে মধ্যে মৃদুহাস্য করিতে করিতে একবার আচার্য্য প্রভুর দিকে আর একবার ঠাকুর মহাশয়ের দিকে সস্নেহে দৃষ্টিপাত করিতেছেন, প্রভু মধ্যে মধ্যে তাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া অনুচ্চস্বরে কি যেন বলিতেছেন। শ্রীমন্মহা-প্রভু তাঁহারগণ সহ প্রকটিত হইয়া তাঁহাদের সহিত নৃত্য করিতেছেন! এই কল্পনাতীত সৌভাগ্য লাভের আনন্দ, তাঁহাদের সেই অল্প পরিসর হৃদয়গুলিতে আবদ্ধ করিয়া রাখিবেন কি প্রকারে? তাঁহাদের হৃদয়ে

আনন্দের তুফান ছুটিতে লাগিল। অনেকেই ভাবাবেগে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। কিন্তু প্রভু সম্মুখে নৃত্য করিতেছেন, অতএব দর্শন সুখে বঞ্চিত হইয়া পড়িয়া থাকাই বা কিরূপে সম্ভব? চৈতন্য লাভ মাত্রে তাঁহারা তড়িৎবেগে উঠিতেছেন এবং ব্যাকুল দৃষ্টিতে দেখিতেছেন, এখনও প্রভু রহিয়াছেন অথবা অন্তর্হিত হইয়াছেন। কেহ আবার ক্রমাগত উচ্চ হাস্য করিতেছেন, সে হাস্যের আর বিরাম হইতেছে না। কেহ বা ক্রন্দন করিতেছেন, সে ক্রন্দনের সুর এত করুণ যে শ্রবণ মাত্রে হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়। কেহবা আনন্দের আবেগে জড়বৎ নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়া আছেন; চোখে পলক-টুকুও নাই। শ্রীনাম সঙ্কীর্ত্তন আজ যেন তাঁহার মহিমাময়ী মূর্ত্তি লইয়া যজ্ঞস্থলে বিরাজ করিতে লাগিলন, কিন্তু প্রাকৃত রাজ্যে থাকিয়া কেহ এই অপ্রাকৃত আনন্দ অধিকক্ষণ ভোগ করিতে পারেন না। নিরবিচ্ছিন্ন আনন্দ সম্ভোগের স্থান ইহা নহে। শীঘ্রই এই আনন্দের অবসান ঘটল। কিছুক্ষণের মধ্যেই শ্রীমন্মহাপ্রভু সগণে সঙ্কীর্ত্তন স্থল হইতে অন্তর্হিত হইলেন। তখন অকস্মাৎ তাঁহাদিগকে দেখিতে না পাইয়া ভক্তগণ হাহাকার করিয়া উঠিলেন। সঙ্গে সঙ্গে অনেকেই আর্ত্তনাদ করিতে করিতে মূর্চ্ছিত হইয়া ভূমিতে লুটাইয়া পড়িলেন। কেহ বা আপন বক্ষে ও ললাটে করাঘাত করিতে করিতে কাঁদিতে লাগিলেন। সঙ্কীর্ত্তন মণ্ডলীর মধ্যে হাহাকার ও ক্রন্দনের রোল উঠিল। ঠাকুর মহাশয়ের অবস্থা হইল আরও শোচনীয়, নয়নে পিচকারির ন্যায় ধারা, এক একবার ব্যাকুল ভাবে রোদন করিতেছেন, আবার এক একবার প্রবল বেগে অট্টহাস্য করিয়া উঠিতেছেন, কখনও বা এইরূপ উদ্দণ্ড নৃত্য করিতে করিতে আছাড় খাইয়া পড়িতেছেন যে, দশ জনেও রক্ষা করিতে পারিতেছেন না। প্রতি লোমকূপে পুলকাবলী যেন কদম্বের আকার ধারণ করিয়াছে, দেহের বর্ণ মুহুর্মুহুঃ পরিবর্ত্তিত হইতেছে। আচার্য্য প্রভুর অবস্থাও তদ্রূপ। রামচন্দ্র, শ্যামানন্দ, ব্যাসাচার্য্য প্রভৃতি সকলেই উন্মত্ত।

কে কাহাকে দেখিবে তাহার ঠিক নাই। আবার বৃদ্ধ রাজা কৃষ্ণানন্দের অবস্থা দেখিলে হৃদয় দ্রব হইয়া যায়। প্রভুর পদাঙ্কিত সেই পবিত্র ভূমিতে বৃদ্ধ এক একবার লুটাইতেছেন, ধূলি-ধূসরিত দেহে আবার উঠিয়া দাঁড়াইতেছেন। কখনও বা ভক্তগণের চরণে ধরিয়া পড়িয়া পড়িয়া রোদন করিতেছেন। এক একবার গৃহের অভ্যন্তরে গমন করিয়া নিকটে যাহা পাইতেছেন লইয়া আসিয়া বিতরণ করিয়া দিতেছেন। কখনও বা স্বীয় পুত্র, ঠাকুর মহাশয়েরই চরণ জড়াইয়া পড়িতেছেন। আনন্দের আতিশয্যে বৃদ্ধ যেন একেবারে জ্ঞান-রহিত হইয়া গিয়াছেন। কি বলিতেছেন, কি করিতেছেন, কিছুমাত্র বোধ নাই। কল্পনাতীত সৌভাগ্যের গৌরবে কৃতার্থ হইয়া এক একবার দুই বাহু তুলিয়া নৃত্য করিতেছেন, নয়নে অশ্রুর ধারা ঝরিয়া পড়িতেছে। সম্মুখে যাহাকেই পাইতেছেন, তাঁহার হাত দুইটী ধরিয়া বলিতেছেন 'আজ আমি ধন্য ! নরোত্তমের ন্যায় সন্তান পাইয়াছিলাম বলিয়াই আজ 'ব্রজ-নদীয়ার' সম্পদ গৃহে বসিয়া লাভ করিলাম, আজ আমি কৃতার্থ, সার্থক আমার জীবন' ; বার বার এই কথা বলিতেছেন আর উন্মত্তের ন্যায় নৃত্য করিতেছেন।

বহুক্ষণ পর এই অদ্ভুত নৃত্যকীর্ত্তনের বিরাম ঘটিল। ক্রমে সকলেই একে একে বাহ্যদশা লাভ করিয়া উপবেশন করিলেন। যাঁহারা এখনও মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছিলেন, সকলের পরিচর্য্যায় তাঁহারাও একে একে প্রকৃতিস্থ হইয়া উঠিয়া বসিলেন। আচার্য্য প্রভু ঠাকুর মহাশয়কে আলিঙ্গন দিয়া নিকটে বসাইলেন এবং স্নেহ মধুর-কণ্ঠে বলিলেন—'তোমার প্রতি প্রভুর অপার করুণা, তোমারই কল্যাণে আজ আমরা এই অভূতপূর্ব্ব আনন্দ উপভোগ করিয়া কৃতার্থ হইলাম।' এই কথা বলিতে বলিতে আচার্য্য প্রভু স্মিতমুখে হাসিতে লাগিলেন। ঠাকুর মহাশয় অশ্রু মুছিতে মুছিতে অতি দীনভাবে তাঁহার চরণে পড়িলেন। আচার্য্য প্রভুও তাঁহাকে উঠাইয়া পার্শ্বে বসাইলেন। জাহ্নবা দেবী উভয়কে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—'তোমাদের

প্রতি প্রভুর অসীম কৃপা, একথা অতি সত্য, প্রভু আজ সপরিকরে প্রকটিত হইয়া সঙ্কীর্ত্তন যজ্ঞে নৃত্য করিলেন, এই ঘটনাকে মনের কল্পনা বিভ্রম বলিয়া মনে করিও না। তাঁহার কৃপায় শত শত বিষয়ী বহির্ম্মুখী জীব আজ প্রেম ভক্তি লাভে কৃতার্থ হইল। তোমরা অতি ভাগ্যবান।' অতঃপর দেবী বলিলেন 'আর কাল বিলম্ব না করিয়া এইবার হোলি খেলার আয়োজন কর।' দেবীর কথায় সকলের চমক ভাঙ্গিল, সঙ্কীর্ত্তনের আনন্দে তাঁহারা যেন ভুলিয়াই গিয়াছিলেন যে আজ হোলি উৎসবের দিন। দেবীর আদেশ পাইয়া আচার্য্য প্রভু উঠিয়া দাঁড়াইলেন। ভক্তগণ পরমানন্দে মুহুর্ম্মুহুঃ হরি ধ্বনি করিতে লাগিলেন। আচার্য্য প্রভু প্রথমে একটী পাত্রে ফাগু আনয়ন পূর্ব্বক জাহ্নবা ঠাকুরাণীর করে দিলেন, পরে অচ্যুতানন্দ গোপাল মিশ্র প্রভৃতি প্রভূ পাদগণের হস্তে অর্পণ করিলেন। দেবী তখন মন্দিরে প্রবেশ করিয়া শ্রীবিগ্রহগণের অঙ্গে ফাগু সমর্পণ করিলেন। প্রভু পাদগণও শ্রীবিগ্রহগণকে ফাগু দিলেন। পরে তাঁহারা পরস্পর পরস্পরকে ফাগু মাখাইতে আরম্ভ করিলেন। ভক্তগণও তখন নিজ নিজ হস্তে ফাগু লইয়া সকলকে মাখাইতে লাগিলেন। কেহ কেহ ফাগু দ্বারায় অঞ্জলি পূর্ণ করিয়া জনতার প্রতি সবেগে নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। এইরূপে আর এক জাতীয় আনন্দের আস্বাদনে ভক্তগণ পুনরায় উন্মত্ত হইয়া উঠিলেন। মন্দির, সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণ এবং পার্শ্ববর্ত্তী স্থানগুলি একেবারে লাল হইয়া উঠিল। ভক্তগণের অঙ্গ, তাঁহাদের বস্ত্র, উত্তরীয় প্রভৃতি সমস্তই রক্তিম হইয়া গেল। বসন্ত রাগে হোলি কীর্ত্তন গাহিতে গহিতে তাঁহারা সেই অবস্থায় নৃত্য করিতে লাগিলেন। বাদ্যকরেরাও সেই সুমধুর নৃত্যে যোগ দিয়া সঙ্কীর্ত্তনের তালে তালে বাজাইতে লাগিল। ব্রজ কিশোর কিশোরীগণের সেই সুমধুর প্রেম-লীলা আবার যেন প্রকটিত হইল। স্থান কালাদির কথা বিস্মৃত হইয়া সকলে সেই অপরূপ লীলা মাধুরীতে অবগাহন করিতে লাগিলেন। এইরূপে পরমানন্দে হোলি উৎসব

আস্বাদনের পর সকলে বসিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। এদিকে দিবাও অবসান হইয়া আসিল। ফাগুর রং এ মন্দির ও সমগ্র প্রাঙ্গণ রক্তিম! ভক্তবৃন্দের বসন ভূষণ, আপাদমস্তক সমস্তই রক্তিম! তাঁহাদের আনন্দোল্লাস দর্শন করিয়া সূর্য্যদেবও যেন পশ্চিমাকাশে হোলি উৎসব আরম্ভ করিলেন। তিনিও আকাশ বাতাস এবং আপন অঙ্গ লালিমারঞ্জিত করিয়া ক্রীড়া করিতে করিতে অস্তাচল গমনে উদ্যত হইলেন।

সন্ধ্যা সমাগত হইল। পূর্ব্বাকাশে চন্দ্রদেব আত্ম-প্রকাশ করিলেন। অল্প কালের মধ্যেই পূর্ণচন্দ্রের নির্ম্মল জ্যোৎস্না ধারায় চতুর্দ্দিক উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। বসন্তের মৃদু সমীরণ আসিয়া আসিয়া শ্রান্ত ভক্তগণের প্রাণে শান্তির স্নিগ্ধ প্রলেপ লেপন করিয়া দিতে লাগিল। প্রকৃতির সেই প্রশান্ত পরিবেশের মধ্যে বসিয়া ভক্তগণ কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিলেন। পরে সকলে উঠিয়া আসিয়া পুনরায় প্রাঙ্গণে সমবেত হইলেন। আচার্য্য প্রভু শ্রীমন্দিরে প্রবেশ করিয়া অভিষেকাদি কার্য্যে রত হইলেন। অভিষেক, শৃঙ্গার ও ভোগ নিবেদনাদির পর আরত্রিক আরম্ভ করিলে ভক্তগণ আরতি কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। বাদ্যকরগণ কীর্ত্তনের তালে তালে সুমধুর বাদ্য সহযোগে নৃত্য করিতে লাগিল। আরত্রিকের পর পুনরায় সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ হইল। সুমধুর স্বর ও তাল সহযোগে শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্ম লীলা গান হইতে লাগিল। সমস্ত রাত্রব্যাপী নৃত্যাদি সহযোগে সঙ্কীর্ত্তন অবিচ্ছিন্নভাবে চলিল। বসন্তের স্নিগ্ধ সমীরণ, পূর্ণচন্দ্রের নির্ম্মল জ্যোৎস্নাধারা এবং অপরূপ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে মণ্ডিত হইয়া ঋতুরাজ মূর্ত্তিমান হইয়া যেন তাঁহাদের সহিত সেই আনান্দাৎসবে আসিয়া যোগদান করিলেন। ভক্তবৃন্দের শ্রীমুখনিঃসৃত সঙ্কীর্ত্তনের ধ্বনি রাত্রির সেই নীরবতা ভেদ করিয়া গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে ছড়াইয়া পড়িতে লাগিল। দেহ স্মৃতি রহিত হইয়া ভক্তগণ সঙ্কীর্ত্তন করিতে করিতে রাত্রি অতিবাহিত করিলেন।

রাত্রিশেষে মঙ্গল আরতির পর সঙ্কীর্ত্তনে বিরতি দিয়া সকলে উপবেশন করিলেন।

প্রভাতে স্নানাদি প্রাতঃকৃত্য সমাপন পূর্ব্বক ভক্তগণ নিজ নিজ আবাসে আসিয়া বিশ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন। জাহ্নবা ঠাকুরাণী প্রত্যূষে স্নানাদি সমাপন করিয়া রন্ধনাদির আয়োজন পূর্ব্বক স্বহস্তে পাক করিলেন এবং মধ্যাহ্ন ভোগ আরতির পর সকলকে প্রসাদ গ্রহণ করাইলেন। সে দিবসেও সন্ধ্যারতির পর কিছুক্ষণ নৃত্য কীর্ত্তন চলিল, অধিক রাত্রিতে প্রসাদাদি গ্রহণের পর মোহান্ত ও প্রভুপাদগণ আচার্য্য প্রভুকে ডাকিয়া নিকটে বসাইলেন। তাঁহারা বলিলেন—'প্রভুর অপার করুণায় এই কয়দিন আমরা অননুভূতপূর্ব্ব আনন্দ উপভোগ করিলাম। অদূর ভবিষ্যতে পুনরায় সে সুযোগ পাইব, সেইরূপ আশাও বিশেষ নাই। এই মহোৎসবে যোগদান করিতে আসিয়া আমরা যাহা সঞ্চয় করিয়া লইয়া যাইতেছি, সারাজীবন ধরিয় তাহাই প্রাণে প্রাণে ভোগ করিব। যাহা হউক, উৎসব এখন সমাপ্ত হইয়াছে, এইবার আমরা বিদায় গ্রহণ করিব। আগামী প্রভাতে আমরা যাহাতে রওনা হইতে পারি আপনি সেইরূপ ব্যবস্থা করুন।' আচার্য্য প্রভু তাঁহাদের কথা শুনিয়া করজোড়ে বলিলেন—'আপনারা যাহা আদেশ করিবেন তাহাই করিব। তবে রাজা সন্তোষ দত্ত আপনাদের নিকট সকাতরে অনুরোধ জানাইয়াছেন এবং আমাদেরও অভিলাষ এই যে আপনারা আরও একটী দিন এখানে অবস্থান করুন। উৎসব জনিত পরিশ্রমে আপনারা সকলেই অত্যধিক ক্লান্ত। প্রসাদ সেবনাদি বিষয়েও যথেষ্ট অসুবিধা হইয়াছে। আগামী কল্য প্রতি গৃহে পৃথক পৃথক ভাবে ভোগ রন্ধন করাইয়া, আপনাদের প্রসাদ সেবনের ব্যবস্থা হোক্, ইহাই রাজার একান্ত ইচ্ছা। আপনাদের চরণে তাঁহার অভিলাষ নিবেদন পূর্ব্বক অনুমতি প্রার্থনা করিবার নিমিত্ত তিনিই আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন।' তাঁহারা আর আচার্য্য প্রভুর অনুরোধ উপেক্ষা করিতে না পারিয়া তাঁহার প্রস্তাবেই সম্মতি প্রদান করিলেন।

সঙ্কল্পিত ব্যবস্থা অনুসারে পরদিন প্রতি গৃহে পৃথক পৃথক ভাবে ভোগ রন্ধন আরম্ভ হইল। আচার্য্য প্রভু, ঠাকুর মহাশয় প্রভৃতি সকলে প্রতি গৃহে পরিদর্শন করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। উৎসবের আজ শেষ দিন। আজ সন্তোষ দত্ত বৈষ্ণব সেবার উদ্দেশ্যে তাঁহার রাজ ভাণ্ডার একেবারে উন্মুক্ত করিয়া দিলেন। প্রতি গৃহে উপাদেয় অন্ন ব্যঞ্জনাদি প্রচুর পরিমাণে প্রস্তুত হইল। ভোগ নিবেদনের পর অগ্রে প্রত্যেকের নিমিত্ত পৃথক পৃথক ভাবে আসন পাতিয়া নূতন অন্নপাত্র, ব্যঞ্জনপাত্র ও জলপাত্র সজ্জিত করিয়া, দধি, দুগ্ধ এবং বিবিধ মিষ্টান্নাদি সহ প্রসাদ সাজাইয়া দেওয়া হইল। পরে বৈষ্ণবগণকে আহ্বান করিয়া পরম পরিতৃপ্তির সহিত প্রসাদ সেবন করান হইল। আচার্য্য প্রভু প্রভৃতি সকলে করজোড়ে সেবা দর্শন করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। তাঁহাদের এইরূপ সেবা পরিপাটী দর্শন করিয়া সকলে তৃপ্তির সহিত প্রসাদ গ্রহণ করিলেন। মোহান্ত ও বৈষ্ণবগণের পর সমাগত গ্রামবাসিগণ প্রসাদ গ্রহণ করিলেন।

সন্ধ্যায় আরতির পর নাম সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ হইল। ঠাকুর মহাশয়ের শিষ্য গোকুল দাস, সেদিন কীর্ত্তন গাহিতে লাগিলেন। প্রেম মধুর কণ্ঠে তিনি পদ ধরিলেন—

ও মুখ সম্মুখে ধরি, নয়ন অঞ্জলি ভরি,
পিবইতে জীউ করে সাধা।
নয়নে লাগিল যেই, পান করে সদা সেই
ঘন ঘন সোঙরই রাধা॥ ইত্যাদি

পদখানি গোকুল দাস স্বর তাল সহযোগে গাহিতে লাগিলেন। কীর্ত্তন বেশ জমাট বাঁধিয়া উঠিয়াছে, এমন সময় ঠাকুর মহাশয় হঠাৎ আবিষ্ট হইয়া পড়িলেন। অশ্রুকম্প পুলকাদিতে পূর্ণ কলেবর হইয়া তিনি বাহ্যজ্ঞান শূন্য হইয়া নৃত্য আরম্ভ করিলেন। এইরূপে নৃত্য করিতে করিতে এক সময় লম্ফ দিয়া একেবারে গোকুল দাসের পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইলেন এবং তাঁহার একখানি হাত দৃঢ় মুষ্টিতে

ধরিয়া পুনরায় নৃত্য করিতে লাগিলেন। তাঁহার স্পর্শে গোকুল দাসের দেহে যেন তড়িৎ খেলিতে লাগিল। তখন তিনিও বাহ্যজ্ঞান শূন্য হইয়া তাঁহার সহিত নৃত্য আরম্ভ করিলেন, গুরু শিষ্য উভয়েই ভাবাবেশে মত্ত। নৃত্য করিতে করিতে ঠাকুর মহাশয় এক একবার আছাড় খাইয়া পড়িয়া যাইতেছেন, পরে আবার উঠিয়া নৃত্যে যোগ দিতেছেন। তিনি অস্ফুট কণ্ঠে মাঝে মাঝে 'সাধা সাধা' বা 'রাধা রাধা' এই শব্দগুলি উচ্চারণ করিতেছেন। মধ্যে মধ্যে আরও কি যেন বলিতেছেন কিছু বুঝা যায় না। তাঁহাকে নিরাপদে রক্ষা করিবার নিমিত্ত অনেকেই সতর্ক ভাবে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ফিরিতেছেন। কিন্তু কাহার সাধ্য যে তাঁহাকে রক্ষা করে? এক একবার তিনি সবেগে আছাড় খাইয়া পড়িতেছেন আর সকলে হাহাকার করিয়া উঠিতেছেন। তাঁহার অবস্থা দেখিয়া মনে হইতে লাগিল, প্রাণ যেন এইবার বাহির হইয়া যাইবে। দেহ প্রবল বেগে কম্পিত হইতেছে, অশ্রু পুলক বৈবর্ণ্যাদি সাত্ত্বিক বিকারগুলি এককালে প্রকাশিত হইয়া তাঁহাকে যেন একেবারে গ্রাস করিয়া ফেলিল। স্বমাধুর্য্য আস্বাদনের অভিপ্রায়ে শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু, ঠাকুর মহাশয় রূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। আজিকার এই পরম মুহূর্ত্তে তিনি বোধ হয় তাঁহার সেই অতৃপ্ত সাধ পূর্ণ করিয়া লইতেছেন। ঠাকুর মহাশয়ের এইরূপ অবস্থা দেখিয়া তাঁহার বৃদ্ধ পিতা কৃষ্ণানন্দ ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। কি করিবেন, কিরূপে তাঁহাকে শান্ত করিবেন, কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া, তিনি ইতস্ততঃ ছুটিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। অন্তঃপুরে বৃদ্ধা জননী নারায়ণী দেবী সংবাদ শ্রবণ করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। ঠাকুর মহাশয়ের এইরূপ নৃত্য-কীর্ত্তন রাত্রি দুই প্রহর অবধি চলিল। অবশেষে আর ভাবাবেগ ধারণ করিতে না পারিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। দেহ নিশ্চল হইয়া ভূমিতে পড়িয়া গেল। কৃষ্ণানন্দ মনে করিলেন, পুত্রের প্রাণ বুঝি এইবার দেহ ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। তিনি হাহাকার

করিয়া ছুটিয়া আসিলেন, ভক্তগণ নানারূপে তাঁহাকে প্রবোধ দিয়া আশ্বস্ত করিলেন। আচার্য্য প্রভুও উদ্বিগ্নচিত্তে আসিয়া ঠাকুর মহাশয়ের পার্শ্বে উপবেশন করিলেন। বিশেষ ভাবে দেহ পরীক্ষা করিয়া বুঝিলেন, প্রাণ এখনও দেহ ত্যাগ করিয়া যায় নাই। তখন তিনি আশান্বিত হইয়া তাঁহার কর্ণের নিকটে মুখ রাখিয়া 'উজ্জ্বল নীলমণি' গ্রন্থোক্ত রূপ বর্ণনামূলক কয়েকখানি শ্লোক পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাহাতেও কোন ফল হইল না. সেই ধ্বনি তাঁহার অন্তঃকরণে প্রবেশ করিল না। বহু চেষ্টার পরেও যখন তাঁহার বাহ্যজ্ঞান ফিরাইয়া আনা গেল না, তখন সকলে মিলিয়া তাঁহাকে সঙ্কীর্ত্তন স্থল হইতে তুলিয়া আনিলেন এবং একটী গৃহের মধ্যে শয়ন করাইয়া দিলেন। বহু প্রচেষ্টায় অবশেষে শেষ রাত্রে তিনি নয়ন উন্মীলন করিলেন। সকলের মন হইতে দুশ্চিন্তার মেঘ কাটিয়া গেল। তাঁহারা আনন্দের আবেগে নাচিতে নাচিতে প্রাণ ভরিয়া করুণাময় প্রভুর জয় দিতে লাগিলেন। ঠাকুর মহাশয় প্রকৃতিস্থ হইলে পর সকলের প্রসাদ গ্রহণের ব্যবস্থা হইল। আচার্য্য প্রভু এবং অন্যান্য সকলে উপস্থিত থাকিয়া বহুবিধ মিষ্টান্ন ও পক্কান্নাদির দ্বারায় ভক্তগণকে পরম যত্নসহকারে প্রসাদ সেবন করাইলেন।

রাত্রি শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আজ খেতুরী অন্ধকার হইবে, আনন্দের হাট ভাঙ্গিয়া যাইবে। সন্তোষ দত্তের অভিলাষ অনুসারে মোহান্তগণকে বিবিধ তৈজসপত্র, পট্টবস্ত্র এবং পাথেয় ও প্রণামী স্বরূপে স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা দেওয়া হইল। অন্যান্য বৈষ্ণবগণকেও যথাযোগ্য বস্ত্র এবং প্রণামী দেওয়া হইল। একটী বড় পাত্রে বিবিধ পক্কান্ন সজ্জিত করাইয়া আচার্য্য প্রভু ভক্তগণের নিকটে লইয়া আসিলেন। পরদিন প্রভাতে তাঁহাদের সহিত ইহা প্রেরিত হইবে। পদ্মা পার হইয়া সকলে স্নানান্তে ইহা হইতে কিছু কিছু গ্রহণ করিবেন। তাঁহাদের বুধরী পৌঁছিতে মধ্যাহ্ন হইয়া যাইবে। অতএব তাঁহাদের

মধ্যাহ্নকৃত্য এবং প্রসাদ গ্রহণের ব্যবস্থা সেইখানেই করা হইবে, এইরূপ স্থির হইল। রন্ধনাদির নিমিত্ত দ্রব্যাদি সহ পাচকগণকে লইয়া গোবিন্দ প্রত্যূষেই চলিয়া যাইবেন। ভক্তগণ বুধরীতে উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই রন্ধনাদি কার্য্য যাহাতে সমাপ্ত হয় গোবিন্দকে সেইরূপ আদেশ দেওয়া হইল। পদ্মা পার হইবার জন্য নৌকার ব্যবস্থা ইতঃপূর্ব্বেই করা হইয়াছে। সমস্ত আয়োজন শেষ করিয়া সকলে বিমর্ষচিত্তে বিদায় গ্রহণ করিলেন।

রজনী প্রভাত হইল, পূর্ব্ব ব্যবস্থা অনুসারে গোবিন্দ পাচকাদি সহ শেষ রাত্রে চলিয়া গিয়াছেন। প্রভুপাদগণ, মোহান্ত ও বৈষ্ণবগণ প্রাতঃকৃত্য সমাধা করিয়া মন্দির প্রাঙ্গণে সমবেত হইয়া মঙ্গল আরতি দর্শন করিলেন। পরে শ্রীবিগ্রহগণের সম্মুখে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত হইয়া কাতর প্রাণে বিদায় ভিক্ষা করিলেন। তৎপরে সাশ্রু বদনে আসিয়া একে একে জাহ্নবা ঠাকুরাণীর চরণে প্রণত হইয়া বিদায় প্রার্থনা করিলেন। অন্যান্য সকলের সহিত বিদায় সম্ভাষণাদি শেষ করিয়া অশ্রু মার্জ্জনা করিতে করিতে সকলে যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইয়া দাঁড়াইলেন। উৎসবের আনন্দময় পরিবেশের মধ্যে এতগুলি ভক্ত-হৃদয়, প্রীতির সম্বন্ধে মিলিত হইয়া যেন এক হইয়া গিয়াছিল। সেই সংযোগ বিচ্ছিন্ন করিতে সকলের প্রাণ যেন কাঁদিয়া উঠিতে লাগিল। কোনও প্রকারে বিদায় গ্রহণ করিয়া নীরবে কাঁদিতে কাঁদিতে অগ্রসর হইয়া চলিলেন। আচার্য্য প্রভু, শ্যামানন্দ প্রভৃতি সকলে অশ্রু মুছিতে মুছিতে পদ্মাতীর পর্য্যন্ত তাঁহাদের অনুগমন করিয়া তাঁহাদিগকে নৌকায় তুলিয়া দিয়া বিষণ্ণ বদনে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। রামচন্দ্র বৈষ্ণবগণের সহিত বুধরী চলিয়া গেলেন। ভক্তগণকে যথা সময়ে বুধরী হইতে বিদায় দিয়া, দুই দিন পর তিনি গোবিন্দের সহিত খেতুরীতে ফিরিয়া আসেন।

খেতুরী উৎসব শেষ করিয়া বৃন্দাবন যাইবেন, এইরূপ সঙ্কল্প করিয়াই জাহ্ণবা ঠাকুরাণী আগমন করিয়াছিলেন। বিদেশীয় ভক্তগণ

প্রায় সকলেই চলিয়া গিয়াছেন। উৎসব-মুখর খেতুরী এখন নীরব, নিস্তব্ধ। সেই নীরবতার মধ্যে থাকিতে তাঁহার প্রাণও আর চাহিতে ছিল না। কোনও প্রকারে আরও একদিন কাটাইয়া পঞ্চমীর দিন তিনি দোলারোহণে শ্রীধাম অভিমুখে যাত্রা করিলেন। মাধবাচার্য্য তাঁহার সহিত গমন করিলেন। ইনি বারেন্দ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণ এবং নিত্যানন্দ প্রভুর মন্ত্র শিষ্য ছিলেন, মাধবাচার্য্য পরম ভক্তিমান, সঙ্গীত বিদ্যাতেও সবিশেষ পারদর্শী ছিলেন। নিত্যানন্দ প্রভুর আদেশে ইনি তাঁহার কন্যা গঙ্গা দেবীর পাণি গ্রহণ করেন। মাধবাচার্য্যের বংশধরগণ এখন 'গঙ্গাবংশ গোস্বামী' বলিয়া আপনাদের পরিচয় প্রদান করেন। শ্রীধামে প্রভুর প্রকট পরিকরগণের শ্রীচরণ দর্শন মানসে, আচার্য্য প্রভুর আদেশ লইয়া গোবিন্দও ঠাকুরাণীর সহিত গমন করিলেন। সন্তোষ দত্ত, তাঁহাদের পাথেয় স্বরূপে প্রচুর অর্থ প্রদান করিলেন এবং শ্রীগোবিন্দ দেব, শ্রীগোপীনাথ প্রভৃতি বিগ্রহগণের নিমিত্ত বহুমূল্য বস্ত্রাভরণ এবং অর্থাদি সহ তাঁহাদিগকে বিদায় দিলেন।

ঠাকুর মহাশয়, শ্যামানন্দ এবং রামচন্দ্র প্রভৃতির সহিত আচার্য্য প্রভু প্রায় একমাস কাল খেতুরীতে অবস্থান করিলেন। পরে তিনিও একদিন বিদায় গ্রহণের অভিপ্রায় লইয়া ঠাকুর মহাশয়কে বলিলেন— 'নরোত্তম! আমার একবার বিষ্ণুপুর যাওয়া প্রয়োজন, শ্যামানন্দেরও আর এখানে থাকিয়া সময় নষ্ট করা উচিত নয়। আমি বুধরী ও যাজিগ্রাম হইয়া বিষ্ণুপুরে যাত্রা করিব, শ্যামানন্দও অম্বিকায় তাহার গুরুদেবের চরণ দর্শন করিয়া উড়িষ্যায় যাইবে। আগামী প্রত্যূষেই যাহাতে আমরা রওনা হইতে পারি তুমি সেই মত ব্যবস্থা কর।' আচার্য্য প্রভু চলিয়া যাইবেন, তাঁহার সুমধুর সঙ্গ হারাইতে হইবে, এই কথা চিন্তা করিতেই ঠাকুর মহাশয়ের মুখ বেদনায় ম্লান হইয়া গেল। তাঁহার সঙ্কল্পে বাধা দিবেন, তাহাও ঠাকুর মহাশয়ের পক্ষে সম্ভব নহে, আবার এই বিচ্ছেদটী সহজ ভাবে গ্রহণ করিতে পারিবেন তাহার সম্ভাবনাও নাই। তিনি মুখ ফুটিয়া কিছু বলিতে পারিলেন না, তাঁহার

সম্মুখে নীরবে অবনত শিরে দাঁড়াইয়া রহিলেন আর নয়ন বহিয়া অশ্রু ঝরিতে লাগিল। তাঁহার মনের ভাব আচার্য্য প্রভুর বুঝিতে বিলম্ব হইল না, তাঁহাকে আকর্ষণ করিয়া সস্নেহে হৃদয়ে ধারণ করিলেন এবং নানা প্রকারে আশ্বাস প্রদান পূর্ব্বক বহু চেষ্টায় তাঁহাকে শান্ত করিলেন। রামচন্দ্র নিকটেই দাঁড়াইয়া ছিলেন, আচার্য্য প্রভুর কথা তিনিও শুনিয়াছেন। তাঁহার হৃদয়েও তখন আশা-নিরাশার দোলা লাগিয়াছে। ঠাকুর মহাশয়ের সহিত রামচন্দ্রের পরিচয় যখন ছিল না, তখন দিন এক প্রকার কাটিয়া গিয়াছে। কিন্তু এখন, তাঁহার সংস্পর্শে আসিবার পর হইতেই তিনি বুঝিয়াছেন যে ঠাকুর মহাশয়ের সঙ্গ ত্যাগ করিয়া থাকা তাঁহার পক্ষে আর সম্ভব নহে। আবার আচার্য্য প্রভুর সঙ্গ ত্যাগ করাও তাঁহার পক্ষে সমধিক বেদনা দায়ক। উভয়কে একত্র লাভ করিতে পারলেই তাঁহার সুখ, কিন্তু তাহাই বা সর্ব্বদা কিরূপে সম্ভব? এইবার অন্ততঃ এক জনের সহিত বিচ্ছিন্ন হইতে হইবে। এই কথা চিন্তা করিয়া রামচন্দ্র কাতর হইয়া পড়িলেন। আচার্য্য প্রভু তাঁহাকে এইখানেই থাকিবার জন্য আদেশ করিবেন অথবা তাঁহার সহিত বিষ্ণুপুরে লইয়া যাইবেন সে বিষয়ে কিছু বুঝিতে পারিলেন না. কিছু জিজ্ঞাসাও করিলেন না। শুধু নিরুৎসাহ ভরে তাঁহার দিকে তাকাইয়া রহিলেন। তাঁহার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া আচার্য্য প্রভু বলিলেন—'তুমি এখন নরোত্তমের নিকটেই থাক, আমি যত শীঘ্র সম্ভব বিষ্ণুপুর হইতে ফিরিয়া আসিতেছি। যাজিগ্রামে আসিয়াই তোমাদিগকে সংবাদ দিব। জাহ্নবা ঠাকুরাণী শ্রীধাম হইতে ফিরিয়া আসিলে তোমরা যাজিগ্রামে সংবাদ পাঠাইবে। তোমাদের সংবাদ পাইলে আমি তাঁহাকে এখান হইতে যাজিগ্রামে লইয়া যাইবার ব্যবস্থা করিব এবং সেখান হইতে তাঁহাকে খড়দহ রওনা করাইয়া দিয়া আমি খেতুরী ফিরিয়া আসিব। তুমি সর্ব্বদা নরোত্তমের অনুগত থাকিয়া কার্য্য করিবে। চিন্তা বা দুঃখ করিবার কোন কারণ নাই। আমাকে এখানে আবার শীঘ্রই আসিতে হইবে এখন বিষ্ণুপুর,

যাজিগ্রাম ও খেতুরী এই তিনটী আমার আশ্রয় স্থান হইল। শ্রীগুরু-চরণনিষ্ঠ রামচন্দ্র গুরুদেবের আদেশ বাক্যের উপর কোনদিন বিচার বুদ্ধি প্রয়োগ করেন নাই, সে আদেশ অবিচারে পালন করাই তাঁহার স্বভাবজাত ধর্ম্ম। আজিও সে আদেশ নীরবেই মানিয়া লইলেন। আসন্ন বিচ্ছেদের বেদনায় তাঁহার অন্তর ভরিয়া উঠিল, নতশিরে উদ্গত অশ্রু গোপন করিবার চেষ্টা করিতে করিতে রামচন্দ্র উত্তরীয়ের দ্বারা বার বার নয়ন মর্জ্জনা করিতে লাগিলেন। আচার্য্য প্রভু তাঁহাকে বুকে ধরিয়া বহু প্রকার স্নেহ বাক্যের দ্বারা প্রবোধিত করিলেন।

আচার্য্য প্রভু খেতুরী হইতে চলিয়া যাইবেন, এই সংবাদ অল্প সময়ের মধ্যেই চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়িল। স্থানীয় বৈষ্ণবগণ সংবাদ পাইয়া তাঁহার চরণ দর্শন করিয়া গেলেন। রাজা সন্তোষ দত্ত বেদনা ভারাক্রান্ত হৃদয়ে তাঁহাদের যাত্রার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। এক জোড়া থান বস্ত্র এবং দুইখানি স্বর্ণ মুদ্রা দিয়া তিনি আচার্য্য প্রভুকে প্রণাম করিলেন। ব্যাসাচার্য্যকে একখানি থান বস্ত্র এবং পাঁচটী মুদ্রা দিয়া প্রণাম করিলেন। তাহা ব্যতীত উপঢৌকন স্বরূপ প্রচুর দ্রব্যাদি তাঁহাদের সহিত প্রেরণ করিবার ব্যবস্থা করিয়া রাখিলেন। শ্যামানন্দের নিমিত্ত প্রণামী স্বরূপ যে সমস্ত দ্রব্য প্রদত্ত হইল, তাহা সমস্তই তৎশিষ্য রসিকানন্দের করে সমর্পণ করিলেন। তাঁহারা আগামী প্রত্যূষে যাহাতে রওনা হইতে পারেন তাহার ব্যবস্থা করিয়া রাখা হইল। বিষাদ ও নিরুৎসাহের ভিতর দিয়া সকলের দিবা ভাগ অতিক্রান্ত হইল। সেদিন আচার্য্য প্রভুর অভিপ্রায় অনুসারে সন্ধ্যারতির পর নাম সঙ্কীর্ত্তনের বিশেষ ব্যবস্থা করা হইল। দেবিদাস ও গোকুল দাসের সহিত ঠাকুর মহাশয় সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। 'সখি হে, ওই দেখ গোরা কলেবর'—বাসুদেব ঘোষ বিরচিত শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই পদখানি ঠাকুর মহাশয় সুর, তাল সহযোগে গাহিতে লাগিলেন। সঙ্কীর্ত্তনের উন্মাদনায় সকলে বিচ্ছেদ তাপ বিস্মৃত হইলেন এবং আনন্দে বিভোর হইয়া আচার্য্য প্রভু, ঠাকুর মহাশয়, রামচন্দ্র, শ্যামানন্দ প্রভৃতি সকলেই

নৃত্য আরম্ভ করিলেন। বহু বহু পদাবলী সহযোগে কীর্ত্তন চলিতে লাগিল। এইরূপে নৃত্য কীর্ত্তনের মধ্য দিয়াই সে রাত্রি অতিবাহিত হইল।

ঊষা কালে যাত্রার নিমিত্ত প্রস্তুত হইয়া সকলে মন্দির প্রাঙ্গণে আসিয়া সমবেত হইলেন এবং বিদায় প্রার্থনা জানাইয়া শ্রীবিগ্রহগণের উদ্দেশ্যে সাষ্টাঙ্গ প্রণত হইলেন। বেদনাময় পরিবেশের মধ্যে পরস্পর যথাযোগ্য প্রণাম বন্দনা এবং আলিঙ্গনাদির পর তাঁহারা সমবেত খেতুরী-বাসিগণের নিকটে বিদায় গ্রহণ করিলেন। ব্যাকুল হৃদয়ে কাঁদিতে কাঁদিতে ঠাকুর মহাশয় ও রামচন্দ্র তাঁহাদের অনুসরণ করিলেন, ইঁহাদিগকে নৌকায় তুলিয়া দিয়া তাঁহারা ফিরিয়া আসিবেন।

নদীয়া ভ্রমণ।

খেতুরী হইতে যাজিগ্রামে আসিবার পর আচার্য্য প্রভু বিষ্ণুপুরে গমন করিয়াছিলেন কিনা, তাহা সবিশেষ জানা যায় না। তবে মনে হয় সেই সময় তাঁহার যাওয়া হয় নাই। কারণ, জাহ্নবা ঠাকুরাণী যখন শ্রীধাম হইতে খেতুরীতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন তখন তিনি যাজি গ্রামেই ছিলেন এবং তাহার অনতিকাল পরে রাজা বীরহাম্বীর তাঁহার চরণ দর্শনের নিমিত্ত উৎকন্ঠিত হইলে আচার্য্য প্রভু তাঁহাকে একবার যাজিগ্রামে আসিবার জন্য আদেশ পত্র প্রেরণ করিয়া ছিলেন। যাহা হউক ঠাকুরাণী প্রত্যাবর্ত্তন করিলে ঠাকুর মহাশয় আচার্য্য প্রভুর নির্দ্দেশ অনুসারে যাজিগ্রামে সংবাদ প্রেরণ করেন এবং দেবীর নির্দ্দেশ অনুসারে ইহাও জানাইয়া দেন যে, তিনি ২।১ দিন খেতুরীতে থাকিয়া কাটোয়া যাত্রা করিবেন এবং সেখান হইতে যাজিগ্রামে যাইবেন। তিনি এবং রামচন্দ্র উভয়েই ঠাকুরাণীর সহিত যাইতেছেন। এই সংবাদ পাইয়া আচার্য্য প্রভু ঠাকুরাণীকে লইয়া আসিবার জন্য কয়েকজন ভক্তের সহিত কাটোয়ায় চলিয়া আসিলেন। এদিকে রামচন্দ্র ও ঠাকুর মহাশয়

যথা সময়ে ঠাকুরাণীকে লইয়া কাটোয়াতে উপস্থিত হইলে আচার্য্য প্রভু তাঁহাদের সহিত মিলিত হইলেন। ইতঃপূর্ব্বে শ্রীজীব তাঁহার বিখ্যাত 'শ্রীগোপাল বিরুদাবলী' গ্রন্থ রচনা শেষ করিয়া গ্রন্থখানি আচার্য্য প্রভুর নিকটে পাঠাইবার নিমিত্ত লোকের সন্ধান করিতেছিলেন। সেই সময় জাহ্নবা দেবী শ্রীধামে গমন করেন। তাঁহাদের প্রত্যাবর্ত্তনের সময় শ্রীজীব গ্রন্থখানি গোবিন্দের করে সমর্পণ করিয়া তাহা সতর্কতার সহিত লইয়া যাইবার জন্য আদেশ করেন। খেতুরী হইতে আসিবার সময় রামচন্দ্র, গোবিন্দের নিকট হইতে গ্রন্থখানি লইয়া আসিয়াছিলেন। গ্রন্থখানি পাইয়া আচার্য্য প্রভু পরম আনন্দিত হইলেন।

যথাযোগ্য কুশলাদি বিনিময় এবং আলাপ আলোচনার পর আচার্য্যপ্রভু এবং অন্যান্য সকলে ঠাকুরাণীকে তাঁহার ভ্রমণ বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনিও বিস্তারিতভাবে সকল কথা তাঁহাদিগকে শ্রবণ করাইলেন। ঠাকুরাণীর ভ্রমণ কাহিনী শুনিতে শুনিতে আচার্য্য প্রভুর অন্তরে তাঁহার সেই ব্রজবাস কালের আনন্দপূর্ণ দিনগুলির কথা বার বার জাগিতে লাগিল। শ্রীজীবের চরণাশ্রয়ে থাকিয়া ভক্তিগ্রন্থ অধ্যয়ন, শ্রীগুরু সেবা, তাঁহার প্রতি শ্রীগুরুদেবের প্রগাঢ় বাৎসল্য পূর্ণ ব্যবহার, পরিক্রমা, ভক্ত সম্মিলন প্রভৃতি সকল কথাই মনে জাগিতে লাগিল। ক্রমে তিনি অত্যন্ত বিচলিত হইয়া পড়িলেন এবং কাঁদিতে কাঁদিতে অধৈর্য্য হইয়া ঠাকুরাণীকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন 'আমি মহা অপরাধী, বোধ হয় সেই কারণেই শ্রীধাম ছাড়িয়া এবং শ্রীগুরু সেবা হইতে বঞ্চিত হইয়া এখানে পড়িয়া রহিয়াছি, শ্রীগুরুদেব আর কি আমাকে তাঁহার চরণাশ্রয়ে লইয়া যাইবেন না ? তাঁহার চরণ সেবার সুযোগ আর কি পাইব না ?' এইরূপ অনুশোচনা করিতে করিতে তিনি ব্যাকুল ভাবে কাঁদিতে লাগিলেন। আচার্য্য প্রভু স্বভাবতঃই অতি সংযত এবং গম্ভীর প্রকৃতির। আজ তাঁহার এইরূপ চাঞ্চল্য দেখিয়া সকলে বিস্মিত হইলেন। বহুক্ষণ পর তিনি ঠাকুরাণীর

প্রবোধ বাক্যে ভাব সংবরণ করিলেন বটে, কিন্তু অন্তর বিরহানলে পুড়িতে লাগিল। সমস্ত দিবস সেই ভাবেই কাটিল। রাত্রে, একাকী নির্জ্জন কক্ষে শয়ন করিয়া প্রাণের আবেগে বহুক্ষণ পর্য্যন্ত ক্রন্দন করিলেন এবং কাঁদিতে কাঁদিতে এক সময় নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন। তাঁহার অন্তরের নিগূঢ় বেদনা তিনি অন্য সকলের নিকটে গোপন করিয়া রাখিলেন বটে, কিন্তু অন্তর্যামী শ্রীগুরুদেবের নিকটে তাহা গোপন রহিল না। গোপাল ভট্ট প্রভু সেদিন স্বপ্নযোগে আবির্ভূত হইয়া তাঁহাকে দর্শন দিলেন এবং বহু প্রকার স্নেহবাক্যে তাঁহাকে আশ্বস্ত করিয়া বলিলেন 'বাবা শ্রীনিবাস! প্রভুরই প্রিয়কার্য্য সাধন করিবার জন্য তোমাকে আমিই গৌড়মণ্ডলে প্রেরণ করিয়াছি। তোমার এই আরব্ধ কার্য্য সম্পূর্ণ করাই এখন তোমার শ্রেষ্ঠ গুরু সেবা বলিয়া জানিবে। ধামবাসী মহাত্মগণ গৌড়দেশে প্রভুর নাম প্রেম প্রচারের সমস্ত দায়িত্ব তোমার হাতে ছাড়িয়া দিয়া তোমার প্রতি তাকাইয়া আছেন। তাঁহাদের আশীর্ব্বাদ হৃদয়ে ধারণ করিয়া তুমি কার্য্য সুসম্পন্ন করিয়া যাও। প্রয়োজন হইলেই আমি তোমাকে নিকটে লইয়া যাইব। আমিত' নিরন্তর তোমার নিকটেই রহিয়াছি, ইহা কি তোমাকে আর বুঝাইয়া বলিতে হইবে?' এই প্রকারে ভট্ট প্রভু তাঁহাকে প্রবোধ দিয়া অন্তর্হিত হইলেন। এই ঘটনার পর আচার্য্য প্রভুর ব্যাকুল হৃদয় অপেক্ষাকৃত সংযত হইল। শ্রীগুরুদেবের করুণার কথা স্মরণ করিতে করিতে তিনি অবিরল ধারে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন।

পরদিন ঠাকুরাণীর সহিত কাটোয়া হইতে যাত্রা করিয়া সকলে যথা সময়ে যাজিগ্রামে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ঈশ্বরী ঠাকুরাণী আসিয়া তাঁহার চরণ বন্দনা করিলেন। জাহ্নবা ঠাকুরাণী তখন তাঁহাকে তুলিয়া পরম স্নেহে ক্রোড়ে ধারণ করিলেন। অতঃপর ঈশ্বরী ঠাকুরাণী তাঁহাকে অন্তঃপুরে লইয়া আসিলেন এবং জননী বুদ্ধিতে পরম ভক্তি সহকারে তাঁহার পরিচর্য্যাদিতে আত্ম নিয়োগ করিলেন।

তাঁহার অকপট ভক্তি এবং সেবা কুশলতায় দেবী পরম পরিতৃপ্ত হইয়া তাঁহাকে সর্ব্বান্তঃকরণে আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন। সেদিন পরমানন্দেই অতিবাহিত হইল। পরদিন ঠাকুরাণী যাজিগ্রাম হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন এবং ক্রমে শ্রীখণ্ড, নবদ্বীপ, অম্বিকা, সপ্তগ্রাম প্রভৃতি লীলাভূমি সকল দর্শন করিতে করিতে যথা সময়ে খড়দহে পদার্পণ করিলেন। আচার্য্য প্রভু, ঠাকুর মহাশয় এবং রামচন্দ্র তাঁহাকে শ্রীখণ্ড পর্য্যন্ত পৌঁছাইয়া দিয়া যথা সময়ে যাজিগ্রামে ফিরিয়া আসেন।

শ্রীখণ্ড হইতে ফিরিয়া আসিবার পর হইতেই আচার্য্য প্রভুর মনে একবার নবদ্বীপ ভ্রমণে যাইবার ইচ্ছা জাগিল। শ্রীমন্মহাপ্রভুর সেবক ঈশান মধ্যে তাঁহাকে একবার আমন্ত্রণও করিয়াছিলেন। বিশেষ প্রতিবন্ধকও এখন নাই, সুতরাং এই সময়েই একবার যাওয়া কর্ত্তব্য, এইরূপ বিবেচনা করিয়া রামচন্দ্র ও ঠাকুর মহাশয়ের নিকটে মনের বাসনা ব্যক্ত করিলেন। তখন তাঁহারাও যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে আচার্য্য প্রভু তাহাতে সম্মতি প্রদান করিলেন। যে সমস্ত ছাত্র তাঁহার নিকটে থাকিয়া শাস্ত্রাভ্যাস করিতে ছিলেন, তাহাদের অধ্যয়ন বিষয়ে যাহাতে কোনরূপ অসুবিধা না হয় সে জন্য আচার্য্য প্রভু তাঁহার সুযোগ্য শিষ্য শ্রীদাস এবং গোকুলানন্দকে অধ্যাপনা কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া দিলেন। রাজা বীর হাম্বীর এই সময় তাঁহার চরণ দর্শনেচ্ছায় ব্যগ্র হইয়া বার বার পত্র লিখিতে ছিলেন। নবদ্বীপ যাইবার পূর্ব্বে আচার্য্য প্রভু তাঁহাকে যাজিগ্রামে আসিবার জন্য পত্র লিখিয়া ছিলেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর নবদ্বীপ বাসী পরিকরগণের মধ্যে যাঁহারা প্রকট ছিলেন তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই তখন লীলা সম্বরণ করিয়াছেন। অবশিষ্ট যাঁহারা আছেন তাঁহাদের মধ্যে আবার অনেকে নবদ্বীপ ছাড়িয়া স্থানান্তরে চলিয়া গিয়াছেন। প্রভুর লীলাভূমি ত্যাগ করিতে না পারিয়া কয়েকজন মাত্র তখনও সেখানে পড়িয়া আছেন। নিশ্ছিদ্র ভজন এবং হা-হুতাশের মধ্যে কোনও প্রকারে তাঁহাদের দিন কাটিতে

ছিল। প্রভুর আবাল্য সঙ্গী এবং সেবক ঈশান, স্মৃতিচিহ্নে ভরা প্রভুর সেই গৃহখানির আকর্ষণ কাটাইতে না পারিয়া সেইখানেই কোনও প্রকারে দিন কাটাইতে ছিলেন। জননী শচী দেবী যতদিন প্রকট ছিলেন, ঈশান তাঁহার সেবা করিয়াছেন। তাঁহার অবর্ত্তমানে প্রিয়াজীর অভিভাবক স্বরূপে থাকিয়া তাঁহার সেবা করিয়াছেন। এখন তিনিও নিত্যলীলায় প্রবিষ্টা, শচীর অঙ্গণ এখন নীরব। তথাপি পূর্ব্ব স্মৃতিটীকে বুকে ধরিয়া বৃদ্ধ ঈশান এখনও সেই শূন্য পুরীতে রহিয়া গিয়াছেন, আর কতদিন পরে প্রভু তাঁহাকে আকর্ষণ করিয়া লইবেন সেই চিন্তাতেই এখন তাঁহার দিন কাটিতেছে।

রামচন্দ্র ও ঠাকুর মহাশয়ের সহিত নবদ্বীপে আসিয়া আচার্য্য প্রভু একেবারে প্রভুর গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং ঈশানের নিকটে আসিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁহার চরণ বন্দনা করিলেন; তিনিও নয়ন বারিতে ভাসিতে ভাসিতে তাঁহাদিগকে উঠাইয়া আলিঙ্গন দিলেন, প্রভুর কথা প্রসঙ্গে সমস্ত দিবস অতিবাহিত হইল। আদ্যোপান্ত নদীয়া লীলার প্রত্যক্ষ সাক্ষী এই বৃদ্ধ ঈশান। আজ তিনিই হইলেন বক্তা, আর আচার্য্য প্রভু ঠাকুর মহাশয় ও রামচন্দ্র হইলেন শ্রোতা। প্রভুর প্রসঙ্গ পাইলে ঈশানের আর বাহ্যজ্ঞান থাকিত না। অশ্রু মার্জ্জন করিতে করিতে তিনি লীলা বর্ণনা করিতেছেন, আর মুগ্ধ হইয়া সকলে শ্রবণ করিতেছেন। সে দিবস এইরূপেই গত হইল।

পরদিন প্রভাতে ঈশান তাঁহাদিগকে লইয়া নগর পরিক্রমায় বহির্গত হইলেন। বিভিন্ন লীলাস্থল এবং পরিকরগণের ভবনে ভবনে গিয়া তিনি দর্শন করাইতেছেন, আর সঙ্গে সঙ্গে প্রভুর পূর্ব্ব পূর্ব্ব লীলা কথা সকল আবিষ্ট চিত্তে বর্ণনা করিয়া শ্রবণ করাইতেছেন তাঁহারা এইরূপে দর্শন করিতে করিতে সমগ্র নবদ্বীপ পরিক্রমা করিলেন। রাত্রে প্রভুর অঙ্গণে সকলের শয়নের ব্যবস্থা হইল। আচার্য্য প্রভু একান্তে শয়ন করিয়া প্রভুর লীলা কথা চিন্তা করিতে করিতে যেন সেই

অপরূপ লীলা মাধুরীতে অবগাহন করিতে লাগিলেন। লীলা অদর্শনের বেদনায় মর্ম্মাহত হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে আচার্য্য প্রভু প্রায় সমস্ত রাত্রি এক প্রকার বিনিদ্রভাবে অতিবাহিত করিলেন। অবশেষে শেষ রাত্রে একটু যেন নিদ্রাকর্ষণ হইল। সেই সময় প্রভু স্বপ্নযোগে আবির্ভূত হইয়া তাঁহাকে দশন দিলেন। আচার্য্য প্রভু দেখিলেন, এক অপরূপ রত্নময় সিংহাসনে প্রভু উপবিষ্ট রহিয়াছেন, বদনে তাঁহার অপরূপ ভুবন ভোলান হাসি, লক্ষ্মীপ্রিয়া দেবী বাম পার্শ্বে এবং দক্ষিণে বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী সহাস্য বদনে বসিয়া আছেন এবং স্নেহপূর্ণ নয়নে তাঁহার প্রতি চাহিয়া আছেন। শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু এবং অদ্বৈত প্রভুও, অন্যান্য পরিকরগণের সহিত আবির্ভূত হইয়া সেদিন তাঁহাকে দর্শন দান করেন। প্রেমময় প্রভু এবং তাঁহার পরিকরগণের করুণার নিদর্শন দেখিয়া আচার্য্য প্রভুর হৃদয় ভাবাবেশে উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। অতিকষ্টে ভাব সংবরণ করিয়া তিনি উষাকালে শয্যা ত্যাগ করিলেন।

যাজিগ্রাম রওনা হইবার মানসে তাঁহারা প্রভাতে প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন করিয়া ঈশান মহাশয়ের নিকটে আসিলেন এবং চরণ বন্দনা পূর্ব্বক বিদায় প্রার্থনা করিলেন। বিরহ বেদনায় কাতর হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে তিনি সকলকে একে একে আলিঙ্গন দিলেন। পরে আচার্য্য প্রভুর প্রতি একবার এক রহস্যপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাইয়া হস্তের দ্বারায় বিচিত্রভাবে এক প্রকার ভঙ্গী করিলেন। সে ইঙ্গিতের মর্ম্ম অপর কেহ বুঝিতে না পারিলেও আচার্য্য প্রভু বুঝিলেন। তিনি বুঝিলেন এইবার ইনিও লীলা সংবরণ করিবেন। এ জগতে তাঁহার সহিত দেখা শোনার সুযোগ বোধ হয় আর হইবে না। ইহাই বোধ হয় তাঁহাদের শেষ সাক্ষাৎকার। আচার্য্য প্রভু বিশেষ বিচলিত হইয়া পড়িলেন; কিন্তু অসাধারণ সংযম শক্তির প্রভাবে সে চাঞ্চল্য তিনি বাহিরে প্রকাশ পাইতে দিলেন না। মনের ভাব গোপনে রাখিয়া, ঠাকুর মহাশয়ও রামচন্দ্রের সহিত অশ্রু মুছিতে মুছিতে নবদ্বীপ ছাড়িয়া

চলিলেন। কিছু দূর আসিয়া যাজিগ্রামে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বেই তাঁহারা সংবাদ পাইলেন, ঈশান মহাশয় লীলা সংবরণ করিয়াছেন। আচার্য্য প্রভুর আশঙ্কা সত্যে পরিণত হইল। তিনি বুঝিলেন, তাঁহাদিগকে দর্শন দান করিবার জন্যই তিনি অপেক্ষা করিতেছিলেন এবং সেই কারণেই তিনি নবদ্বীপে যাইবার জন্য পুনঃ পুনঃ আহ্বান করিতেছিলেন। তাঁহার বিরহে ব্যাকুল প্রাণে কাঁদিতে কাঁদিতে আসিয়া সকলে যাজিগ্রামে প্রবেশ করিলেন।

রাজা বীরহাম্বীর কয়েক দিনের মধ্যেই আসিয়া পড়িলেন। রাজমহিষী সুলক্ষণাদেবীও সঙ্গে আসিয়াছেন। যাজিগ্রামে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বেই তাঁহারা রাজবেশ ছাড়িয়া দিয়া দীন বেশ ধারণ করিলেন। অশ্বপদাতিকাদি গ্রামের প্রান্তদেশে রাখিয়া দুই একজন ভক্তিমান পার্ষদকে সঙ্গে লইয়া পদব্রজে গুরু গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং আচার্য্য প্রভুর নিকটে আসিয়া রাজা ও রাণী উভয়েই তাঁহার চরণ প্রান্তে পতিত হইলেন। আচার্য্য প্রভু রাজাকে তুলিয়া সস্নেহে আলিঙ্গন দিলেন এবং রাজমহিষীর শিরে হস্তার্পণ পূর্ব্বক আশীর্বাদ করিলেন, পরে তাঁহাকে অন্তঃপুর মধ্যে পাঠাইয়া দিলেন। অন্যান্য সকলকেও যথাযোগ্য স্নেহ সম্ভাষণ পূর্ব্বক উপবেশন করাইলেন। রাজা বসিলেন না, অদূরে করজোড়ে দাঁড়াইয়া রহিলেন। রাজার সহিত মিলিত হইবার ইচ্ছা ঠাকুর মহাশয়ের অন্তরে বহুদিন হইতেই ছিল, তাঁহার মনোবাসনা এখন পূর্ণ হইল। রাজার ভক্তিপূর্ণ ব্যবহার ও দীনভাব দর্শন করিয়া তিনি বিস্মিতভাবে রাজার প্রতি চাহিয়াছিলেন। রামচন্দ্র উভয়ের পরিচয় করাইয়া দিলেন। রাজা তখন সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাতে তাঁহার চরণ বন্দনা করিলেন, ঠাকুর মহাশয়ও তাঁহাকে স্নেহভরে আলিঙ্গন দিলেন।

বীরহাম্বীর যাজিগ্রামে আসিয়া আচার্য্য প্রভু, ঠাকুর মহাশয় ও রামচন্দ্রের সঙ্গ লাভ করিয়া এবং শ্রীগুরু সেবার সুযোগ পাইয়া কৃতার্থ হইলেন। মহারাণী সুলক্ষণাদেবী গুরুদেব ও গুরু মাতার সেবায়

আত্ম নিয়োগ করিলেন। এইরূপে রাজ দম্পতির দিন পরমানন্দেই অতিবাহিত হইতে লাগিল। কিছুদিন এইরূপেই কাটিল। পরে আচার্য্য প্রভু একদিন রাজাকে ডাকিয়া বলিলেন প্রভুর লীলা নিকেতন শ্রীধাম নবদ্বীপ এবং অন্যান্য লীলাভূমি সকল একবার দর্শন করা প্রয়োজন। সেই স্থান সমূহ দর্শন করিয়া যাজিগ্রামে চলিয়া আসিবে এবং এখান হইতে বিষ্ণুপুরে গমন করিবে। রাজার অন্তরে তখন বৈরাগ্যের প্রবল স্রোত বহিতেছে। বিশেষতঃ অতীত জীবনের কালিমালিপ্ত দিন গুলির কথা স্মরণ করিতে করিতে তিনি সর্ব্বদা আত্ম-গ্লানিতে পুড়িতে ছিলেন। এখন শ্রীগুরু সন্নিধানে এই আনন্দময় পরিবেশের মধ্যে থাকিয়া সেই জ্বালা ভুলিয়া পরম সুখে দিন কাটাইতে ছিলেন। পুনরায় শুষ্ক রাজনীতির মধ্যে প্রবেশ করিবার ইচ্ছা তাঁহার আর ছিল না। পতি-পত্নী উভয়ে যুক্তি করিয়া স্থির করিয়াই আসিয়াছিলেন যে, পুত্রের হস্তে রাজ্যভার তুলিয়া দিয়া অতঃপর তাঁহারা শ্রীগুরু সেবায় আত্ম নিয়োগ করিয়া তাঁহারই আশ্রয়ে অবশিষ্ট জীবন অতিবাহিত করিবেন। আচার্য্য প্রভুর আদেশ বাক্য শ্রবণ করিয়া রাজা তাঁহার নিকটে নিজ অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন। কিন্তু আচার্য্য প্রভু তাহাতে সম্মত হইলেন না, কোনও প্রকারে প্রবোধ দিয়া তাঁহাদিগকে গৌড়মণ্ডল দর্শনের নিমিত্ত পাঠাইয়া দিলেন। গুরুদেবের আদেশানুসারে তাঁহারা যাজিগ্রাম হইতে রওনা হইয়া একে একে প্রভুর লীলাভূমি সকল দর্শন করিলেন এবং কিছুদিন পর পুনরায় যাজিগ্রামে ফিরিয়া আসিলেন। মনে মনে স্থির করিয়া আসিলেন যে, আচার্য্য প্রভু যদি তাঁহাদিগকে নিতান্তই বিষ্ণুপুরে প্রেরণ করেন তবে, যাহাতে তিনিও বিষ্ণুপুরে গিয়া অবস্থান করেন, শ্রীচরণে ধরিয়া সেইরূপ অনুমতি চাহিয়া লইতে হইবে।

জাহ্নবা ঠাকুরাণী যখন শ্রীধামে গিয়াছিলেন তখন গোপীনাথ দর্শন করিতে করিতে একদিন তাঁহার মনে হইল যে, গোপীনাথের তুলনায় প্রিয়াজীর বিগ্রহ যেন কিছু ছোট দেখাইতেছে। সেই দিনই রাত্রে

গোপীনাথ তাঁহার নিকটে স্বপ্নে আবির্ভূত হইয়া আদেশ করেন তুমি গৌড় দেশ হইতে যথোপযুক্ত আকারে শ্রীমতীর বিগ্রহ নির্ম্মাণ করাইয়া পাঠাইবে। তোমার প্রেরিত বিগ্রহ বাম পার্শ্বে এবং বর্ত্তমানে যিনি রহিয়াছেন তিনি দক্ষিণ পার্শ্বে থাকিবেন। কথিত আছে এই সময় গোপীনাথ আপন কণ্ঠের মালা খুলিয়া জাহ্নবা দেবীর কণ্ঠে স্বহস্তে পরাইয়া দেন। নিদ্রাভঙ্গের পর দেবী সেই মালা গোপন করিয়া ফেলেন। যাহা হউক ঠাকুরাণী খড়দহে আসিয়া গোপীনাথের আদেশ অনুসারে মনের মত করিয়া শ্রীমতীর বিগ্রহ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। পরে কয়েকজন বিশ্বস্ত সেবকের হস্তে শ্রীবিগ্রহ এবং পাথেয় স্বরূপ সাত শত মুদ্রা অর্পণ করিয়া তাঁহাদিগকে বৃন্দাবনের উদ্দেশ্যে পাঠাইয়া দিলেন। তাঁহারা নৌকাযোগে যাত্রা করিয়া কাটোয়ার ঘাটে আসিয়া অবতরণ করিলেন। ঠাকুরাণীর আদেশানুসারে মূর্ত্তি দর্শন করাইবার জন্য আচার্য্য প্রভুর নিকট সংবাদ প্রেরণ করা হইল। সেই সংবাদ পাইয়া ঠাকুর মহাশয়, রামচন্দ্র, বীরহাম্বীর প্রভৃতিকে লইয়া আচার্য্য প্রভু কাটোয়াতে আসেন এবং শ্রীবিগ্রহ দর্শন করিয়া পরম আনন্দ লাভ করেন। বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত রাজা বীরহাম্বীর রামচন্দ্রের দ্বারায় তাঁহাদের করে এক সহস্র মুদ্রা অর্পণ করিয়াছিলেন।

কাটোয়া হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার পর আচার্য্য প্রভু একদিন রাজাকে ডাকিয়া নিকটে বসাইলেন এবং বহু প্রকারে বুঝাইয়া তাঁহাকে বিষ্ণুপুর গমনে সম্মত করাইলেন। তিনি বলিলেন, আমাকে একবার শীঘ্রই খেতুরী যাইতে হইবে। সেখান হইতে ফিরিবার পরই আমি বিষ্ণুপুরে গিয়া তোমাদের সহিত মিলিত হইব। অতএব কোন প্রকার চিন্তা বা দুঃখ করিও না। এই সুখময় সঙ্গ ত্যাগ করিয়া পুনরায় বিষয় কার্য্যে প্রবেশ করিতে হইবে, এই চিন্তাটীও রাজার পক্ষে যেন অসহ্য বোধ হইতে লাগিল। আবার গুরুদেবের আদেশের বিরুদ্ধেও কিছু করিতে সাহস হইল না। অবশেষে একদিন বিষণ্ণ

মনে রাজা তাঁহার পরিজনগণের সহিত শ্রীগুরুদেবের চরণ সেবা ছাড়িয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বিষ্ণুপুর অভিমুখে যাত্রা করিলেন। সুলক্ষণা দেবী ঠাকুরাণীর নিমিত্ত বহুমূল্য অলঙ্কার এবং অন্যান্য যে সমস্ত দ্রব্যাদি লইয়া আসিয়াছিলেন, বিদায় গ্রহণের সময় তিনি সেগুলি তাঁহার চরণে অর্পণ করেন। সেবিকার তৃপ্তির নিমিত্ত ঠাকুরাণীও সেগুলি সবিশেষ আনন্দ সহকারেই অঙ্গীকার করিয়াছিলেন।

রঘুনন্দনের অপ্রকট ও আচার্য্য প্রভুর বিষ্ণুপুরে গমন।

বীর হাম্বীরের বিষ্ণুপুর গমনের পর, পূর্ব্ব সঙ্কল্প অনুসারে আচার্য্য প্রভু, ঠাকুর মহাশয় ও রামচন্দ্রের সহিত কাঞ্চনগড়িয়া ও বুধরী হইয়া খেতুরী গমন করেন এবং সেখানে দুই সপ্তাহ থাকিয়া পুনরায় যাজিগ্রামে ফিরিয়া আসেন। এখানে আসিয়া তিনি কিছুদিন অধ্যাপনাদিতে অতিবাহিত করিলেন। পরে একদিন হঠাৎ শ্রীখণ্ড যাইবার নিমিত্ত তাঁহার প্রাণ চঞ্চল হইয়া উঠিল। অকস্মাৎ মনের এইরূপ অবস্থা কেন হইল কিছু বুঝিতে পারিলেন না, কিন্তু সেই আকর্ষণ ক্রমে যেন প্রবল হইতে লাগিল, অবশেষে আর থাকিতে না পারিয়া এক সময় শ্রীখণ্ডে চলিয়া আসিলেন। রঘুনন্দনও তাঁহাকে পাইয়া পরম আনন্দিত হইলেন। এক সময় তিনি আচার্য্য প্রভুকে নিকটে ডাকিয়া নির্জ্জনে বসাইলেন এবং ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন 'দেখ শ্রীনিবাস, প্রভুর অনুগত যাঁহারা ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে প্রায় সকলেই ত একে একে অন্তর্হিত হইলেন। এইবার আমার সময়ও নিকটবর্ত্তী হইয়া আসিয়াছে। শ্রীগুরু গৌরাঙ্গগণের সেই সুখময় সঙ্গ ছাড়িয়া এইরূপ ভাবে বাঁচিয়া থাকিতেও আর ইচ্ছা হয় না। এখন করুণাময় প্রভু আমার বাসনা কবে পূর্ণ করিবেন, এখন বসিয়া বসিয়া তাহারই দিন গুণিতেছি।' এই কথা বলিতে

বলিতে রঘুনন্দন দীর্ঘ নিঃশ্বাস মোচন করিয়া নীরব হইলেন। আচার্য্য প্রভু তাঁহার ভাব দর্শন করিয়া বুঝিলেন যে, রঘুনন্দনও এইবার প্রকট লীলা সংবরণ করিবেন। কিছুদিন পূর্ব্বে ঈশান মহাশয় লোকান্তরিত হইয়াছেন, সে বেদনা এখনও বুকে চাপিয়া বসিয়া আছে, এইবার ইঁহার সঙ্গও বুঝি হারাইতে হইল। আচার্য্য প্রভুকে অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িতে দেখিয়া রঘুনন্দন তাঁহার অঙ্গে সস্নেহে কর মার্জ্জন পূর্ব্বক নানা প্রকারে প্রবোধ দিয়া আশ্বস্ত কারবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন, 'প্রভু তোমার দ্বারায় বহু কার্য্য সাধন করিয়াছেন এবং এখনও করিবেন। আমার দ্বারায় তাঁহার আদেশ পালনের কিছুই ত হইল না। তুমি দীর্ঘ জীবন লাভ করিয়া তাঁহার প্রীতিকর কার্য্যে নিযুক্ত থাক এবং আমাদের মুখ উজ্জ্বল কর। প্রভুর চরণে ইহাই আমার একমাত্র প্রার্থনা।' রঘুনন্দনের সহিত এই নিভৃত আলোচনার বিষয় আচার্য্য প্রভু গোপনেই রাখিলেন।

রঘুনন্দের ইচ্ছাক্রমে ২।১ দিনের মধ্যেই শ্রীশ্রীনাম-যজ্ঞ আরম্ভ হইল। সেই নাম যজ্ঞে তিনি সর্ব্বান্তঃকরণে যোগ দান করিলেন। অবিচ্ছিন্ন নামের ভিতর দিয়া দুই দিবস কাটিল। তৃতীয় দিবসে এক সময় নাম করিতে করিতে রঘুনন্দন যেন একটু অধিক পরিমাণে ভাব-বিহ্বল হইয়া পড়িলেন এবং সেই অবস্থাতেই তিনি কাতর প্রাণে নানা প্রকার প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। সেই নামের মধ্যেই স্বীয় পুত্রকে প্রভুর চরণে সমর্পণ করিয়া দিলেন, পরে প্রেম বিহ্বল কণ্ঠে 'শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য' এই নাম উচ্চৈশ্বরে পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। নামের সেই প্রাণময় ধ্বনি তাঁহার কণ্ঠ হইতে নির্গত হইয়া সকলের হৃদয়ে আঘাত করিতে করিতে সমস্ত আকাশ বাতাসে প্রতিধ্বনিত হইয়া যেন নিত্য লীলায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর সমীপস্থ হইয়া তাঁহাকে আকর্ষণ করিতে লাগিল। ভক্ত বৎসল প্রভু সেই আহ্বানের মর্ম্ম বুঝিলেন এবং অচিরেই তাঁহার বাসনা পূর্ণ করিলেন। রঘুনন্দনের দেহ ক্রমে স্থির হইয়া আসিল। এক অপ্রাকৃত জ্যোতিতে বদন মণ্ডল উদ্ভাসিত হইয়া

উঠিল। তাঁহার কণ্ঠোদ্গীর্ণ নামের ধ্বনি নীরব এবং দেহ নিস্পন্দ হইল। ধীরে ধীরে বদনে ফুটিয়া উঠিল এক অপরূপ রহস্যময় হাস্যের অভিব্যক্তি। সঙ্কীর্ত্তনোন্মত্ত ভক্তগণ প্রথমে কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। পরে যখন তাঁহারা বুঝিলেন যে, রঘুনন্দন তাঁহাদিগকে ছাড়িয়া গিয়াছেন তখন, সকলে হাহাকার করিয়া ভূমিতে লুটাইয়া পড়িলেন। নাম যজ্ঞের মাঝে ক্রন্দনের রোল উঠিল। শ্রাবণের শুক্লা চতুর্থী দিবসে রঘুনন্দন নিত্য লীলায় প্রবিস্ট হইলেন

রঘুনন্দনের পুত্র কানাই ঠাকুর যথা সময়ে তৎপুত্র মদন ও বংশীকে লইয়া আচার্য্য প্রভুর নির্দ্দেশ অনুসারে পিতৃদেবের বিরহ মহোৎসব সুচারু রূপেই সম্পন্ন করিলেন। উৎসবান্তে আচার্য্য প্রভু বিষাদ পূর্ণ হৃদয়ে যাজিগ্রামে ফিরিয়া আসিলেন। অধ্যয়ন অধ্যাপনা এবং ভজনের মধ্যে ব্যাপৃত থাকিয়া তিনি অন্তরের বেদনাটীকে ভুলিয়া থাকিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু সেই দুর্বিষহ শোক-ভার হৃদয় হইতে কোন রূপেই নামাইতে পারিলেন না, মন যেন ক্রমেই চঞ্চল এবং উদাস ভাব ধারণ করিতে লাগিল। কর্ত্তব্য কর্ম্মে মনোনিবেশ করাও যেন ক্রমে তাঁহার পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিল। মন যেন আর যাজিগ্রামে টিকিতে ছিল না। কয়েক দিন এই ভাবে কাটাইয়া অবশেষে একদিন বিষ্ণুপুর গমনের উদ্যোগী হইলেন। বীরহাম্বীরও এতদিন তাঁহার আগমন পথ চাহিয়া আশায় আশায় দিন গুণিতেছেন, সুতরাং আর কাল বিলম্ব না করিয়া একদিন বিষ্ণুপুরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করিলেন।

যথা সময়ে বিষ্ণুপুরে উপনীত হইলে পর রাজা আচার্য্য প্রভুকে ভক্তি ভরে অভ্যর্থনা করিয়া রাজপুরীতে লইয়া আসিলেন। ইতোমধ্যে রাজা তাঁহার নিমিত্ত একটী নির্জ্জন ও মনোরম স্থান নির্ব্বাচন করিয়া একটী সুরম্য অট্টালিকা নির্ম্মাণ করাইয়া রাখিয়া ছিলেন। আচার্য্য প্রভুর থাকিবার ব্যবস্থা সেইখানেই হইল। রাজা, রাণী এবং অন্যান্য ভক্তবৃন্দের অকপট সেবায় প্রীত হইয়া আচার্য্য প্রভু কিছুদিন

বিষ্ণুপুরে অবস্থান করিবার সঙ্কল্প করিলেন। তাঁহার উপস্থিতিতে রাজ পরিবার সহ বিষ্ণুপুরবাসিগণ সকলেই যেন আনন্দোৎসবে মাতিয়া উঠিলেন।

দ্বিতীয়বার বিবাহ।

একদিন গোপালপুর গ্রাম হইতে রাঘব চক্রবর্ত্তী (মতান্তরে রঘুনাথ) নামে জনৈক ব্রাহ্মণ আচার্য্য প্রভুর নিকটে আগমন করিলেন। আচার্য্য প্রভু তাঁহাকে যথাযোগ্য সম্ভাষণ করিয়া নিকটে বসাইলেন। রাঘব, তাঁহার চরণ বন্দনা করিয়া বিনীত ও সঙ্কুচিত ভাবে উপবেশন করিলেন। আচার্য্য প্রভু তাঁহার আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে ব্রাহ্মণ সঙ্কোচ বশতঃ প্রথমে কোন উত্তর করিতে পারিলেন না। পরে মনের দ্বন্দ্ব কাটাইয়া ধীরে ধীরে তাঁহার বক্তব্য বলিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি এক অপূর্ব্ব ঘটনার বিষয় বর্ণনা করিলেন। ব্রাহ্মণ বলিলেন—'আমার নাম রাঘব চক্রবর্ত্তী, পদ্মাবতী নামে আমার একটি কন্যা আছে। বিবাহযোগ্যা হওয়ায় তাহার বিবাহের নিমিত্ত চেষ্টিত হইয়া কিছুদিন যাবৎ নানা স্থানে পাত্রের সন্ধান করিতেছিলাম। কন্যাটী যদিও রূপে গুণে অতুলনীয়া তথাপি বহু চেষ্টা করিয়াও যখন সম্বন্ধ স্থির করিতে পারিলাম না তখন, নানা প্রকার চিন্তায় সবিশেষ কাতর হইয়া পড়িলাম। সেই সময়, একদিন রাত্রে আমি স্বপ্নে দেখিলাম, আমি যেন পদ্মাবতীকে আপনার করে সমর্পণ করিতেছি। আমার ধারণারও অতীত এইরূপ এক অসম্ভবের সম্ভাবনার বিষয় স্বপ্নে দর্শন করিয়া পরদিন প্রভাতে বিমূঢ়ের ন্যায় বসিয়া ভাবিতেছি, এমন সময় পদ্মাবতীর জননী আসিয়া আমার নিকটে তাঁহার এক স্বপ্ন কাহিনী বিবৃত করিলেন। তিনি নাকি স্বপ্নে জনৈক মহা জ্যোতির্ম্ময় কলেবর মহাপুরুষকে দর্শন করেন। তিনি আবির্ভূত হইয়া তাঁহাকে বলেন—'কন্যার বিবাহের নিমিত্ত

তোমরা ব্যস্ত হইও না, শ্রীনিবাসের সহিত তাহার বিবাহ হইবে। তিনিই তোমার কন্যার পূর্ব্ব নির্দ্দিষ্ট স্বামী। সেই মহাপুরুষ আপনার পরিচয় প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন যে তিনি শান্তিপুর হইতে শুভাগমন করিয়াছিলেন।' চক্রবর্ত্তী মহাশয় বলিতে লাগিলেন—'পদ্মাবতীর জননীর মুখে সেই অলৌকিক স্বপ্নের বিষয় শ্রবণ করিয়া আমি সবিশেষ বিস্মিত হইলাম এবং আমার স্বপ্ন বিবরণও তাঁহাকে যথাযথ বর্ণনা করিলাম। এই স্বপ্ন বিবরণ আপনার কর্ণগোচর করা কর্ত্তব্য মনে করিয়া আমি এখানে আসিয়াছি। আমার যাহা বক্তব্য নিবেদন করিলাম, অতঃপর আপনি যেরূপ আদেশ করিবেন সেইরূপ করিব।'

ব্রাহ্মণের স্বপ্ন বিবরণ শ্রবণ করিয়া আচার্য্য প্রভু বিস্ময় প্রকাশ করিলেন, পরে বিমর্ষ ভাবে বলিলেন 'এ বিষয়ে শ্রীমন্মহাপ্রভুও আমাকে স্বপ্নযোগে আদেশ করিয়াছেন, জানি না ইহাতে তাঁহার কি উদ্দেশ্য সাধিত হইবে।' এই কথা বলিতে বলিতে তিনি গভীর ভাবে চিন্তামগ্ন হইলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর পরিকরগণের অদর্শনজনিত বিরহে তাঁহার হৃদয় সর্ব্বদা পুড়িতেছিল, কঠোর সংযমের দ্বারা সেই বিরহানল তিনি হৃদয়ে গোপন করিয়া রাখিয়াছিলেন বলিয়া তাহার বাহ্য প্রকাশ ছিল না। কিন্তু তাঁহার গাম্ভীর্য্য এবং উদাস ভাব যে দিন দিন বাড়িতেছিল এবং তিনি যে ক্রমেই অন্তর্মনাঃ হইয়া পড়িতেছিলেন, সে কথা, তাঁহার অন্তরঙ্গ পরিকরগণের নিকটে অজ্ঞাত ছিল না। এই অবস্থায় বিবাহে সম্মতি প্রদান করা তাঁহার পক্ষে সহজ ছিল না। কিন্তু শ্রীমন্মহাপ্রভুর চরণে উৎসর্গীকৃত যাঁহার জীবন তাঁহার অন্তরে, আত্মসুখ বাসনা অথবা নিজস্ব ইচ্ছা অনিচ্ছার কোন প্রশ্ন উঠে না। প্রভুর আদেশ অবিচারে পালন করাই তাঁহার সারা জীবনের ব্রত। কিছুক্ষণ নীরবে চিন্তা করিয়া আচার্য্য প্রভু এই বিবাহে সম্মতি প্রদান করিলেন।

কেহ কেহ বলেন দেবী পদ্মাবতীও আচার্য্য প্রভুর গুণে বশীভূতা হইয়া মনে মনে তাঁহার চরণে আত্ম-বিক্রয় করিয়াছিলেন। যাহা

হউক, আচার্য্য প্রভু বিবাহে সম্মতি দিয়াছেন এই কথা শ্রবণ করিয়া রাজা ও রাণী পরম আনন্দে শুভানুষ্ঠানের যাবতীয় উপকরণাদি সংগ্রহে সচেষ্ট হইলেন। স্থানীয় শিষ্য ও সেবকবৃন্দ তাঁহাদের সহযোগিতা করিতে লাগিলেন। অতঃপর একদিন শুভক্ষণে চক্রবর্ত্তী মহাশয় এবং তাঁহার পত্নী মাধবী দেবী, কন্যা পদ্মাবতীকে আচার্য্য প্রভুর করে সমর্পণ করিলেন। বিবাহের পর পদ্মাবতী দেবীর নাম হইল শ্রীগৌরাঙ্গ প্রিয়া। শুভানুষ্ঠানের যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করিবার সুযোগ পাইয়া রাজা আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করিতে লাগিলেন।

বিবাহের পর আচার্য্য প্রভু, দেবী গৌরাঙ্গ প্রিয়াকে সঙ্গে লইয়া গোপালপুর হইতে বিষ্ণুপুরে চলিয়া আসিলেন এবং রাজার অনুরোধে আরও কিছুদিন সেখানে অবস্থান করিতে বাধ্য হইলেন। অতঃপর সকলের নিকট বিদায় লইয়া একদিন দেবীর সহিত যাজিগ্রাম অভিমুখে রওনা হইলেন। রাজা তাঁহাদের সঙ্গে সঙ্গে কিছুদূর আসিয়া তাঁহাদের চরণ বন্দনা পূর্ব্বক কাঁদিতে কাঁদিতে ফিরিয়া আসিলেন। কয়েকজন কর্ম্মচারী রাজদত্ত উপঢৌকনাদি লইয়া তাঁহাদের সহিত যাত্রা করিলেন।

যথা সময়ে সকলে যাজিগ্রামে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সংবাদ পাইয়া ঈশ্বরী ঠাকুরাণী আনন্দে আত্মহারা হইয়া ছুটিয়া আসিলেন এবং সম্মুখে দেবী গৌরাঙ্গ প্রিয়াকে দেখিয়া তাঁহাকে পরম স্নেহে বুকে জড়াইয়া ধরিলেন। তাঁহার অপরূপ রূপমাধুরী দর্শন করিতে করিতে ঈশ্বরী ঠাকুরাণী আনন্দের আবেগে কাঁদিয়া ফেলিলেন। পরে আপনার চাঞ্চল্য প্রকাশে ঈষৎ লজ্জিত হইয়া অঞ্চল প্রান্তে অশ্রু মুছিতে মুছিতে তাঁহাকে অন্তঃপুরে লইয়া চলিলেন। ঠাকুরাণীর এই আন্তরিকতাপূর্ণ ব্যবহার দর্শনে গৌরাঙ্গ প্রিয়া দেবীর অন্তর হইতে অপরিচয়ের সকল সঙ্কোচ মুহূর্ত্তের মধ্যে কাটিয়া গেল। এইরূপ একটী স্নেহময়ী পতিপ্রাণা নারীকে পরমাত্মীয়ারূপে লাভ করিয়া তিনি অন্তর্যামী শ্রীভগবানের চরণে সর্ব্বান্তঃকরণে বার বার

কৃতজ্ঞতা জানাইতে লাগিলেন। তিনি আনন্দাশ্রুপূর্ণ বদনে গৃহে আসিয়া তাঁহার চরণ বন্দনা করিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে চিরদিনের মত সেই চরণে আত্মসমর্পণ করিয়া মনে মনে বলিতে লাগিলেন, 'আজ হইতে অতঃপর যতদিন বাঁচিয়া থাকিব, তোমার স্নেহাঞ্চলের আবরণে থাকিয়া তোমারই আনুগত্যে পতি-সেবায় প্রাণ উৎসর্গ করিয়া জন্ম সফল করিব।' ঈশ্বরী ঠাকুরাণী তাঁহাকে চরণ প্রান্ত হইতে উঠাইয়া পুনরায় হৃদয়ে ধারণ করিলেন এবং অশ্রুপূর্ণ নয়নে তাঁহার প্রতি চাহিয়া অঙ্গে সস্নেহে করমার্জ্জন করিতে করিতে বলিলেন, 'এতদিন এই নির্জ্জন গৃহে একাকী নিঃসঙ্গ অবস্থায় থাকিয়া কষ্ট পাইতেছিলাম, সেইজন্যই পরম করুণাময় প্রভু আজ তোমাকে প্রেরণ করিয়াছেন। এইবার তোমার সাহচর্য্যে থাকিয়া পরম সুখে দিন অতিবাহিত করিব। তোমার ন্যায় সুশীলা পতিপরায়ণাকে স্বামী সেবায় নিযুক্ত করিয়া দিয়া এইবার দেহত্যাগ করিতেও আমার আর কোন কষ্ট নাই।' এই দুইটী স্বার্থশূন্যা সরলা নারীর মিলন এবং তাঁহাদের প্রেমপূর্ণ ব্যবহার দর্শন করিয়া সকলে পরম তৃপ্তি লাভ করিলেন।

যাজিগ্রামে ফিরিয়া আচার্য্য প্রভু পুনরায় অধ্যাপনাদি কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিলেন। সুযোগ মত তিনি মধ্যে মধ্যে খেতুরী গমন করেন এবং রামচন্দ্র ও ঠাকুর মহাশয়ের নিকটে কিছুদিন কাটাইয়া আসেন। কাঞ্চনগড়িয়া এবং বুধরীতেও গিয়া মধ্যে মধ্যে থাকিয়া আসিতেন। আবার বীরহাম্বীর এবং বিষ্ণুপুরবাসী ভক্তগণের অনুরোধে বিষ্ণুপুর বাটীতে গিয়াও সময়ে সময়ে থাকিতে হইত। কখনও একাকী আসিতেন আবার কখনও বা ঠাকুরাণীগণকেও সঙ্গে লইয়া আসিতেন। আচার্য্য প্রভু যখন যাজিগ্রামে থাকিতেন তখন ঠাকুর মহাশয়, রামচন্দ্রকে সঙ্গে লইয়া মধ্যে মধ্যে আসিতেন এবং কয়েকদিন আচার্য্য প্রভু এবং ঠাকুরাণীগণের আশ্রয়ে থাকিয়া সেবা সুখ আস্বাদন করিয়া যাইতেন। বীরচন্দ্র প্রভুর সহিতও আচার্য্য প্রভুর মধ্যে মধ্যে মিলন হইত। গোপাল ভট্ট প্রভু, শ্রীজীব প্রভৃতি

ধামবাসী গোস্বামিগণের সহিতও পত্র বিনিময়ের দ্বারায় সর্ব্বদাই সংযোগ রক্ষা হইত। শ্রীজীব যে সমস্ত গ্রন্থ রচনা করিতেছিলেন, রচনা সমাপ্তির পর তিনি সেই সমস্ত কোনও বিশ্বস্ত বৈষ্ণবযাত্রীর দ্বারায় আচার্য্য প্রভুর নিকটে প্রেরণ করিতেন। তাঁহার বিখ্যাত গ্রন্থ গোপাল চম্পুও এই ভাবেই প্রেরিত হয়। ব্রজলীলার পরকীয়া তত্ত্বটীকে অতি কৌশলে গোপন রাখিয়া শ্রীজীব এই গ্রন্থ রচনা করেন।* অনধিকারী পাঠকগণের দৃষ্টিতে এই গূঢ় তত্ত্বটীকে গোপনে রাখিবার উদ্দেশ্যেই বোধ হয় তিনি এই পন্থা অবলম্বন করেন। আচার্য্য প্রভু এই গ্রন্থ পাঠ করেন এবং শ্রীজীবের রচনা-চাতুর্য্য দর্শন করিয়া পরম বিস্মিত হন। কিন্তু পাঠ করিয়াই বুঝিলেন যে, এই গ্রন্থের প্রকৃত তাৎপর্য্য গ্রহণ করা অন্যের পক্ষে সুকঠিন, সেই কারণেই তিনি তাহা শিষ্যগণকে পাঠ করিতে নিষেধ করেন। তাঁহার আদেশে তাঁহারা নিত্য এই গ্রন্থ পূজা করিতেন। সম্ভবতঃ ব্যাসাচার্য্য, আচার্য্য প্রভুর আদেশের কথা জানিতেন না এবং সেই কারণেই বোধ হয় তিনি একবার গ্রন্থখানি পড়িয়া ফেলেন। কিন্তু শ্রীজীবের প্রকৃত অভিপ্রায় ধারণা করিতে না পারিয়া স্বকীয়াবাদে আস্থাবান হইয়া পড়েন। কিছুদিন পর আচার্য্য প্রভুর চেষ্টায় তাঁহার এই ভ্রম সংশোধিত হয়।

বোরাকুলী গ্রামে গোবিন্দ চক্রবর্ত্তী নামে সঙ্গীত বিদ্যা বিশারদ জনৈক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। আচার্য্য প্রভুর প্রভাবে মুগ্ধ হইয়া

---

* শ্রীজীব গোস্বামী পাদের সূচক কীর্ত্তনে শ্রীল রামদাস বাবাজী মহারাজের উক্তি দ্রষ্টব্য। পরকীয়াবাদ বিষয়ে বুধরি বিলাস গ্রন্থকার শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের রাগবর্ত্ম চন্দ্রিকা হইতে নিম্নোক্ত অংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন :- 'যদ্যপি শ্রীরাধিকা শ্রীকৃষ্ণস্য স্বরূপভূতা হ্লাদিনী শক্তিঃ তস্যা অপি শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় এবং তদপি তয়ো লীলাসহিতয়োরেবোপাস্যত্বং নতুলীলারহিতয়োঃ লীলায়ান্তু তয়ো ব্রজভূমৌ কাপ্যার্ষ শাস্ত্রে দাম্পত্যং ন প্রতিপাদিতমিতি শ্রীরাধাহি প্রকটাপ্রকট প্রকাশয়োঃ পরকীয়ৈব ইতি সর্ব্বার্থনিষ্কর্ষ সংক্ষেপঃ।

শ্রীশ্রীনিতাই সুন্দর পত্রিকা, ১৩৬২ সাল বৈশাখ সংখ্যা হইতে উদ্ধৃত।

তিনি কালক্রমে তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন এবং তাঁহারই আদেশে শ্রীশ্রীরাধাবিনোদ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। সেই উপলক্ষ্যে এক মহা মহোৎসবের অনুষ্ঠান হয়। আচার্য্য প্রভু, ঠাকুর মহাশয়, রামচন্দ্র, বীরচন্দ্র প্রভু, শ্রীকৃষ্ণ মিশ্র প্রভু এবং অন্যান্য বহু মহাত্মা এই উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। শ্যামদাস, দেবীদাস, গোকুলানন্দ প্রভৃতি বিখ্যাত কীর্ত্তনীয়াগণ এই উৎসবে আসিয়া সঙ্কীর্ত্তন করেন। সঙ্কীর্ত্তনানন্দে চক্রবর্ত্তীর প্রেম দর্শন করিয়া সকলে মুগ্ধ হ'ন এবং সেই হইতে তাঁহাকে সকলে ভাবুক চক্রবর্ত্তী বলিয়া ডাকিতেন। এই সময়ে বহু বিখ্যাত ব্যক্তি আচার্য্য প্রভুর প্রেমে বশীভূত হইয়া তাঁহার চরণে আত্ম সমর্পণ করেন। সমগ্র গৌড়রাজ্যে এইরূপ ক্রমে ক্রমে আচার্য্য প্রভুর প্রভাব ছড়াইয়া পড়িতে ছিল।

উক্ত সময়ে আচার্য্য প্রভু শ্রীগুরুদেবের আহ্বানে কয়েকবার বৃন্দাবনেও গমন করিয়াছিলেন।

কালক্রমে ঈশ্বরী ঠাকুরাণীর গর্ভে দুইটী পুত্র সন্তানের জন্ম হয়। শ্রীজীবের আদেশানুসারে আচার্য্য প্রভু তাঁহার জ্যেষ্ঠ সন্তানের নাম রাখেন বৃন্দাবন চন্দ্র এবং দ্বিতীয়ের নাম রাধাকৃষ্ণ, পঞ্চ বিংশতি বৎসর বয়স পর্য্যন্ত দেবী গৌরাঙ্গ প্রিয়ার কোন সন্তানাদি হয় নাই। সেই কারণে ঈশ্বরী ঠাকুরাণীর মনে ক্ষোভের অন্ত ছিল না। পরে আচার্য্য প্রভু যখন সপরিবারে বিষ্ণুপুরের বাটীতে অবস্থান করিতে ছিলেন তখন বীরচন্দ্র প্রভু একবার সেখানে আগমন করেন। দেবী গৌরাঙ্গ প্রিয়ার সেবা কুশলতা এবং ভক্তি দর্শনে প্রীত হইয়া তিনি তাঁহাকে পুত্রবর প্রদান করেন। কথিত আছে বীরচন্দ্র প্রভুর চর্ব্বিত তাম্বুল সেবন করিয়া তাঁহার গর্ভ সঞ্চার হয়। যথা সময়ে সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলে আচার্য্য প্রভু বীরচন্দ্র প্রভুকে সে সংবাদ প্রেরণ করেন। তাঁহার আদেশে আচার্য্য প্রভু, পরম রূপবান এই নবকুমারের নাম রাখেন গতিগোবিন্দ। সর্ব্বসুলক্ষণ যুক্ত হইলেও গতিগোবিন্দের দক্ষিণ চরণখানি কিঞ্চিৎ বক্র ছিল এবং সেই কারণে হাঁটিবার কালে

তিনি একটু খোঁড়াইয়া চলিতেন। গতিগোবিন্দের বয়স যখন ত্রয়োদশ বৎসর তখন তাঁহার দীক্ষার নিমিত্ত আচার্য্য প্রভু বীরচন্দ্র প্রভুকে অনুরোধ করেন, কিন্তু তিনি আচার্য্য প্রভুকেই দীক্ষা দান করিবার জন্য আদেশ করেন। তাঁহার আদেশ ক্রমে আচার্য্য প্রভুই তাঁহাকে দীক্ষা দেন। (আবার কেহ কেহ বলেন, বীরচন্দ্র প্রভু নিজেই গতিগোবিন্দকে দীক্ষা দান করিয়া ছিলেন।) যাহা হউক, গতি গোবিন্দের অধ্যাপনার ভার আচার্য্য প্রভু নিজেই গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার চেষ্টায় অতি অল্পকালের মধ্যেই তিনি সর্ব্বশাস্ত্রে এবং বিশেষতঃ বৈষ্ণব শাস্ত্রে সবিশেষ পাণ্ডিত্য লাভে সমর্থ হ'ন। তাহা ব্যতীত কবিত্ব প্রতিভার নিমিত্তও তিনি সবিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেন। পদকল্পতরু প্রভৃতি কয়েকখানি প্রাচীন পদাবলী গ্রন্থে তাঁহার রচিত পদাবলী দেখা যায়। উত্তরকালে বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি গতিগোবিন্দের প্রভাবে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন।

আচার্য্য প্রভুর তিন পুত্র, কন্যাও তিনজন। কন্যা'দের মধ্যে জ্যেষ্ঠা হেমলতা, মধ্যমা কৃষ্ণপ্রিয়া এবং কনিষ্ঠার নাম কাঞ্চন লতিকা। বৈষ্ণব জগতে মহা তেজস্বিনী এবং ভক্তিমতী হেমলতা ঠাকুরাণীর নাম সর্ব্বজন পরিচিত। বুঁধইপাড়া নিবাসী রামকৃষ্ণ চট্টরাজের পুত্র গোপীজন বহ্লভ বা গোপী বহ্লভের সহিত আচার্য্য প্রভু হেমলতার বিবাহ দিয়াছিলেন।* কুমুদ চট্টরাজের পুত্র শ্রীচৈতন্য চট্টরাজের সহিত কৃষ্ণপ্রিয়ার পরিণয় হয়। কাঞ্চন লতিকাকে আচার্য্য প্রভু কাহার হস্তে সমর্পণ করিয়াছিলেন তাহা জানা যায় না।

---

* বুঁধই পাড়াতে হেমলতা শ্রীবংশীবদন বিগ্রহ এবং শ্রীরাধামাধব বিগ্রহের সেবা প্রকাশ করেন। ঠাকুরাণীর নিজের কোন সন্তানাদি ছিল না। বংশীবদনের প্রতি হেমলতার বাৎসল্য প্রীতি ছিল, একদিন ভোগ লইয়া যাইবার কালে হেমলতার স্তনক্ষীর ভোগে পতিত হয়, এই ঘটনায় তিনি আপনাকে অপরাধিনী জ্ঞান করেন এবং ব্যথিতচিত্তে সেই ভোগ অপসারিত করিয়া পুনরায় ভোগের ব্যবস্থা করেন। সেই রাত্রে বংশীবদন স্বপ্নে আবির্ভূত হইয়া

নরোত্তম ও রামচন্দ্র।

শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু, আর গদাধর পণ্ডিত, উভয়ে উভয়ের প্রেমে মুগ্ধ, শ্রীগৌরাঙ্গ লীলারসের সিঞ্চনে সে প্রণয় নিরন্তর সজীব, মহামাদক গৌর প্রেম রসায়ন তাঁহারা একত্র বসিয়া পান করেন। কিন্তু সে রসের এমনি বিচিত্র মহিমা যে সে বস্তু পান করিতে করিতে

তাঁহাকে বলেন 'আমি তোমার স্তন্য পানাভিলাষী, যে স্তন্য আমি পান করিয়াছি তাহা আর কেহ পাইবে না। অর্থাৎ তোমার বংশে কোন সন্তান জন্মিবে না। আশ্চর্য্যের বিষয় এই বংশে এখনও কোন ঔরস জাত পুত্র নাই। আচার্য্য প্রভুর পুত্র গোতিগোবিন্দের পঞ্চম পুত্র রাধামাধব কে হেমলতা পোষ্য-রূপে গ্রহণ করেন। রাধামাধবের পত্নী কুন্দলতা দক্ষিণ খণ্ড গ্রামের স্বরূপ লাল ঠাকুরকে পোষ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। এইরূপ পোষ্য গ্রহণের ধারা এখনও চলিতেছে, তবে আচার্য্য বংশ ছাড়া পোষ্য গ্রহণের রীতি নাই। (গৌরাঙ্গ সেবক পত্রিকা—১৩১৮ সাল ভাদ্র-আশ্বিন সংখ্যা হইতে প্রাপ্ত।

বনবিষ্ণুপুর হেমলতার পিত্রালয়, সুতরাং এই স্থানেও তিনি মধ্যে মধ্যে আসিয়া বাস করিতেন। শ্রীধাম বৃন্দাবন হইতে প্রিয়াজী সহ শ্রীরাধারমণ বিগ্রহ আনয়ন করিয়া শ্রীমন্দির নির্ম্মাণ পূর্ব্বক তিনি বনবিষ্ণুপুরে স্থাপন করিয়াছিলেন। বনবিষ্ণুপুর গোস্বামী পাড়ায় প্রাচীন বট বৃক্ষের নিকটে (গ্রন্থ লুণ্ঠনের পর আচার্য্য প্রভু বিষ্ণুপুরে আসিয়া এই বৃক্ষতলে বিশ্রাম করিয়াছিলেন। স্থানটি এখনও বিশ্রাম তলা নামে পরিচিত।) শ্রীরাধারমণের মন্দির বর্ত্তমান রহিয়াছে। পরবর্ত্তীকালে আচার্য্য সন্তানগণ বনবিষ্ণুপুর ও তাহার নিকটস্থ কাঁকিলা, গোঁড়াশোল প্রভৃতি স্থানে ছড়াইয়া পড়েন এবং সেই সময়ে তাঁহারা শ্রীরাধারমণকে বনবিষ্ণুপুর হইতে লইয়া আসিয়া কাঁকিলা গ্রামে শ্রীমন্দির নির্ম্মাণ পূর্ব্বক স্থাপন করেন। কালক্রমে সেই মন্দির ভগ্ন দশা প্রাপ্ত হয়। বর্ত্তমানে শ্রীরাধা-রাধারমন নির্দ্দিষ্ট কোন মন্দিরে বাস করেন না। আচার্য্য সন্তানগণ সেবা 'ভাগ' করিয়া লইয়াছেন। এই ব্যবস্থা অনুসারে শ্রীরাধা রমন প্রিয়াজী সহ নির্দিষ্ট সময়ে গোস্বামী সন্তানগণের

পিপাসার নিবৃত্তি আসে না। তৃষ্ণা ক্রমে বাড়িতে থাকে, সঙ্গে সঙ্গে পানের মাত্রা এবং উন্মত্ততাও বাড়িয়া যায়, আর সেই সঙ্গে নিতাই ও গদাধরের প্রণয়াকর্ষণের গাঢ়তাও উত্তরোত্তর বাড়িয়া চলে। শ্রীমন্মহাপ্রভুর সঙ্গ লাভ করিয়া যে ভাবটুকু তাঁহারা সঞ্চয় করিয়া আসেন, উভয়ে একত্র বসিয়া আস্বাদন করিতে না পারিলে তাঁহাদের ভোগটী যেন অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। সে জন্য সময়ে সময়ে তাঁহারা প্রভুর সাক্ষাৎ সঙ্গ ছাড়িয়াও নির্জ্জনে পরস্পর মিলিত হইবার জন্য উৎকণ্ঠিত হ'ন।

স্বমাধুরী আস্বাদনের প্রয়োজনে শ্রীমন্মহাপ্রভু আজ আসিয়াছেন আচার্য্য প্রভু স্বরূপে। নিত্যানন্দ রহস্য ভোগের আশায়

গৃহে গৃহে শুভাগমন পূর্ব্বক সেবা অঙ্গীকার করিয়া আসিতেছেন। বর্ত্তমানে এই প্রথা অনুসারেই সেবা চলিতেছে। গোপাল ভট্ট প্রভু কর্ত্তৃক প্রদত্ত শ্রীবংশী বদন শিলা, আচার্য্য প্রভু নিত্য যাঁহার পূজা করিতেন এবং বিদেশ গমন কালে যাঁহাকে কণ্ঠে ধারণ করিয়া লইয়া যাইতেন, সেই বংশী বদন এখন শ্রীরাধা রমনের সহিত বিরাজ করিতেছেন। শ্রীরাধারমনের বাল্য ভোগের নিমিত্ত বার সের মুড়ি এবং সমস্ত দিনে অন্ততঃ বার সের চাউলের অন্ন ভোগের ব্যবস্থা প্রাচীন কাল হইতে এখনও চলিতেছে, গ্রীষ্মের রাত্রে শীতল অন্ন এবং শীতের রাত্রে উষ্ণ খিচুড়ি ভোগ হয়। শ্রীবিগ্রহ দ্বয়ের মুর্ত্তি অতি মনোরম। শ্রীরাধারমনের সহিত হেমলতার মাতা পুত্র সম্বন্ধ ছিল। কথিত আছে শ্রীরাধারমন প্রকট মূর্ত্তিতে আবির্ভূত হইয়া হেমলতার সহিত এক পাত্রে আহার করিতেন। বনবিষ্ণুপুরে অবস্থান কালে একদিন হেমলতা স্বহস্তে পরিবেশন করিয়া বৈষ্ণবগণকে প্রসাদ সেবন করাইতেছেন, এমন সময় সেই স্থানে গোপীবল্লভ আসিয়া পড়েন। হেমলতার শিরে আবরণ ছিল না, হস্ত দুইখানিও প্রসাদ লিপ্ত কিন্তু তখন ভক্তগণের সহিত গোপীবল্লভ দেখিলেন যে, হেমলতার অঙ্গ হইতে আরও দুইখানি হস্ত প্রকাশিত হইল, সেই হস্ত দ্বয়ের সাহায্যে হেমলতা আপন শিরে অঞ্চল তুলিয়া লইলেন এবং পর মুহূর্ত্তে হস্তদ্বয় অদৃশ্য হইয়া গেল। এই ঘটনার পর হইতে গোপীবল্লভ হেমলতার প্রতি আর পত্নী বুদ্ধি করিতেন না।

নিতাই, ঠাকুর মহাশয় রূপে অবতীর্ণ, আর গদাধর, রামচন্দ্র রূপে আসিয়া স্বমাধুরী আস্বাদন করিতেছেন। নিতাই আর গদাধর, আজ ঠাকুর মহাশয় ও রামচন্দ্র রূপে মূর্ত্তিমান। * তাঁহাদের আবির্ভাবের মূল উদ্দেশ্য স্বমাধুরী আস্বাদন। কিন্তু নিত্যানন্দ ও গদাধরের অন্তরে 'গৌর-রস-বৈচিত্র্য' ব্যতীত আর থাকিবার বস্তু কিছুই নাই। অশেষ বিশেষে সেই রস-বৈচিত্র্য আস্বাদনের উদ্দেশ্যেই এই অবতারে তাঁহারা অবতীর্ণ। গৌরলীলায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর আস্বাদ্য বস্তু শ্রীবৃষভানু নন্দিনী, নিতাই ও গদাধরের আস্বাদনের বিষয় শ্রীগৌর সুন্দর। এই অবতারে আচার্য্য প্রভু আস্বাদন করেন গৌর-রস। আর সেই আচার্য্য প্রভুই হইলেন ঠাকুর মহাশয় ও রামচন্দ্রের ভোগ্য বিষয় এবং সেই অপূর্ব্ব বস্তুটী তাঁহারা ভোগ করেন সেবকের আসনে বসিয়া আর আচার্য্য প্রভুই হইলেন তাঁহাদের সেব্য বিষয়। গৌরলীলা-রস সম্ভোগ কালে আচার্য্য প্রভুর হৃদয়ে ব্রজ অথবা নদীয়া লীলার যে তরঙ্গগুলি উঠিতে থাকে, উভয়ে সেবকের আসনে বসিয়া সেই সেই লীলা এবং তদ্বিভাবিত আচার্য্য প্রভুর হৃদয়টীকে সম্ভোগ করেন। কিন্তু তাঁহাদের দৃষ্টি থাকে সেবার প্রতি, সম্ভোগটী চলিতে থাকে আনুসঙ্গিক ভাবে। সাধন ভজনাদি সমস্ত কিছুর মধ্যে তাঁহাদের দৃষ্টি সর্ব্বদা নিবদ্ধ থাকে সেবায়, সেব্যের মনোবৃত্তির অনুকূল বিষয়ে আত্মনিয়োগ করিয়া তাঁহাকে সুখী করা; এইটীর প্রতিই সর্ব্বদা সেবকের দৃষ্টি নিবদ্ধ। নিত্যানন্দ ও গদাধর, ঠাকুর মহাশয় ও রামচন্দ্র।

---

* ঠাকুর শ্রীনরোত্তম।
নিত্যানন্দের দ্বিতীয় প্রকাশ "
প্রভু মোর রামচন্দ্র
শ্রীগদাধরের দ্বিতীয় প্রকাশ "
তেঁহি তেঁহি মাখামাখি
পূর্ব্ব লীলায় নিতাই গদাইয়ে যেমন দেখি "
রামচন্দ্র সূচকে শ্রীল রামদাস বাবাজী মহারাজের উক্তি।

তাহাদের চরিত্রের এই স্বভাবটী সাধারণ, পরস্পরের অনুকূলতায় তাঁহারা তাঁহাদের এই বাসনা পূর্ণ করেন। সেই উদ্দেশ্যেই তাঁহাদের খেতুরীতে একত্র বাস। উভয়ে একত্রে শয়ন করেন, একত্রে ভজন করেন, একত্রে লীলা রস আস্বাদন করেন। ঠাকুর মহাশয় আকুমার ব্রহ্মচারী, আর রামচন্দ্র বিবাহিত হইয়াও ব্রহ্মচারী। উভয়ে ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে উঠিয়া মঙ্গল আরতি দর্শন করেন। স্নানান্তে তিলকাদি ধারণ করিয়া স্মরণ মননাদিতে নিযুক্ত হন। পরে স্তব পাঠাদি শেষ করিয়া পাঁচ বার মন্দির প্রদক্ষিণ করেন এবং তুলসীতে জল দিয়া ভগবৎ চরণামৃত গ্রহণ করেন। মধ্যাহ্ন ভোগ আরতি দর্শন করিয়া উভয়ে একত্র প্রসাদ সেবন করেন। তৎপরে, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্য ভাগবত, শ্রীকৃষ্ণ মঙ্গল, গোবিন্দ কবিরাজের শ্রীগৌরাঙ্গ বা শ্রীকৃষ্ণ লীলা বিষয়ক পদাবলী, চণ্ডীদাসের বা বিদ্যাপতির পদাবলী অথবা ঠাকুর মহাশয়ের স্বরচিত পদাবলী সমূহ, এই সমস্ত অবলম্বন করিয়া তাঁহারা উভয়ে মিলিয়া রস আস্বাদন করেন এবং সন্ধ্যারতির পর একত্রে নৃত্যকীর্ত্তনে আসিয়া যোগ দেন। রাত্রি দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত এইরূপেই কাটিয়া যায়। ইহা ব্যতীত এক লক্ষ নাম জপ, তাঁহাদের প্রাত্যহিক নিয়মের মধ্যে। রাত্রে চারি দণ্ড বিশ্রামের ব্যবস্থা। তাহাও আবার কোন দিন সঙ্কীর্ত্তনানন্দে সেই সময়টুকু অতিবাহিত হইয়া যায়। কোনও দিন একজন বিগ্রহ সেবা করেন, অপরে ভোগ রন্ধনাদি করেন। এইরূপে পরম আনন্দের মধ্যে তাঁহাদের দিন অতিবাহিত হয়। * তাঁহাদের প্রেম, অপূর্ব্ব বৈরাগ্য এবং ভজন-নিষ্ঠার কথা ক্রমে লোক মুখে ছড়াইয়া পড়িতে লাগিল এবং শত শত বহির্ম্মুখী ব্যক্তি আসিয়া তাঁহাদের আশ্রয় গ্রহণ পূর্ব্বক বৈষ্ণব ধর্ম্মে অনুপ্রবিষ্ট হইতে লাগিল।

---

* খেতুরীতে, শ্রীমন্দিরের দুই মাইল দূরে নরোত্তমের ভজনের টুলি। পার্শ্বেই শ্যামসাগর নামে দীর্ঘিকা। স্থানটী প্রাচীন যুগের তপোবন সদৃশ মনোরম।

বৃন্দাবনের পূজারি ঠাকুরের শিষ্য কৃষ্ণদাস এবং ভূগর্ভের শিষ্য রামদাস, এক সময় শ্রীক্ষেত্র দর্শনের অভিপ্রায়ে শ্রীধাম হইতে আসিতেছিলেন। তাঁহাদের আগমনের পূর্ব্বে শ্রীজীব তাঁহাদিগকে খেতুরী হইয়া নীলাচল যাইবার জন্য আদেশ দেন এবং বলিয়া দেন, তাঁহারা খেতুরীতে উপস্থিত হইয়াই যেন সর্ব্বাগ্রে আহার্য্য প্রার্থনা করেন। তাঁহারা যথা সময়ে খেতুরী আসিলে ঠাকুর মহাশয় তাঁহাদিগকে যথাযোগ্য সম্বর্দ্ধনা করিয়া মন্দিরে লইয়া আসিলেন এবং স্নানাদির নিমিত্ত অনুরোধ করিলেন, কিন্তু শ্রীজীবের শিক্ষা অনুসারে তাঁহারা বলিলেন—'আমাদের অত্যন্ত ক্ষুধা হইয়াছে, স্নানাদির প্রয়োজন নাই, আমরা এখনই ভোজন করিব। আপনি অবিলম্বে তাহার ব্যবস্থা করুন।' তাঁহাদের বাক্য শ্রবণ করিয়া ঠাকুর মহাশয় প্রসাদ আনিবার উদ্দেশ্যে তৎক্ষণাৎ মন্দিরে প্রবিষ্ট হইলেন। কিন্তু মন্দিরে আসিয়া দেখিলেন যে, ভোগের আয়োজন হইয়াছে বটে কিন্তু তখনও নিবেদন করা হয় নাই। এদিকে বৈষ্ণবগণ ক্ষুধার্ত্ত, ভোগ নিবেদনের পর প্রসাদ দিতে হইলে বিলম্ব হইবে, তাহাতে বৈষ্ণবগণের কষ্ট হইবে। ঠাকুর মহাশয় আর দেরী করিলেন না। তিনি সেই অন্নই বিগ্রহের সম্মুখ হইতে তুলিয়া আনিলেন এবং তাঁহাদিগকে পারিতোষ পূর্ব্বক সেবা করাইলেন। পরে পুনরায় রন্ধনাদি করাইয়া ঠাকুরের ভোগ দেওয়া হইল। সেই রাত্রে শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বপ্নযোগে ঠাকুর মহাশয়ের নিকটে আবির্ভূত হন এবং বলেন, 'বৈষ্ণব সেবাতেই আমার সেবা হয়, আমার উদ্দেশ্যে পাক করিয়া সে অন্ন বৈষ্ণবগণকে দিয়াছিলে, আমি তাহাতেই তৃপ্তি লাভ করিয়াছিলাম। পুনরায় রন্ধনাদি করাইয়া ভোগ নিবেদনের কি প্রয়োজন ছিল?' পরদিন প্রভাতে বৈষ্ণবগণ এই অলৌকিক স্বপ্ন বিবরণ শ্রবণ করিয়া বিস্মিত হইলেন এবং শ্রীমন্মহাপ্রভুর বৈষ্ণব প্রীতির কথা স্মরণ করতঃ অশ্রু ত্যাগ করিতে লাগিলেন। বৈষ্ণব কি বস্তু এবং তাঁহাদের মর্য্যাদাই বা কিরূপে দিতে হয়, ঠাকুর মহাশয়ের

আচরণের দ্বারা তাহা জগতে প্রকাশ করিবার জন্যই বোধ হয় শ্রীজীব এই বৈষ্ণবদ্বয়কে খেতুরীতে প্রেরণ করিয়াছিলেন। *

গোয়াস গ্রামে শিবানন্দ আচার্য্য নামে জনৈক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। যদিও শাস্ত্রাদিতে তাঁহার যথেষ্ট পাণ্ডিত্য ছিল তথাপি, রাজসিক এবং তামসিক উপাসনার প্রতি তাঁহার আসক্তি ছিল। ছাগ মহিষাদি বলি দিয়া তিনি মহাশক্তির আরাধনা করিতেন। হরিরাম ও রামকৃষ্ণ নামে তাঁহার পুত্রদ্বয় পিতার প্রভাব বশতঃ শাস্ত্রাদিতে বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করেন এবং পিতার ন্যায় তাঁহারাও পশু বধ সহকারে শক্তি পূজায় উৎসাহিত হইয়া উঠেন। একবার দুর্গোৎসবের সময় বলির প্রয়োজনে ছাগ মহিষাদি সংগ্রহের নিমিত্ত উভয়ে বহির্গত হন এবং অনুসন্ধান করিতে করিতে তাঁহারা পদ্মা পার হইয়া খেতুরীর ঘাটে আসিয়া উপস্থিত হ'ন। ঠিক সেই সময় ঠাকুর মহাশয়, রামচন্দ্রের সহিত স্নানার্থে সেই ঘাটে আসিয়া পড়েন। তাঁহারা লীলাকথা প্রসঙ্গে মত্ত ছিলেন বলিয়া অন্য বিষয়ে তাঁহাদের দৃষ্টি ছিল না। কিন্তু তাঁহাদের মুখে শাস্ত্র কথা শুনিতে পাইয়া ভ্রাতৃদ্বয় কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া তাঁহাদের নিকট অগ্রসর হন এবং তাঁহাদের সহিত বাদানুবাদে প্রবৃত্ত হন। দেখিতে দেখিতে অল্প সময়ের মধ্যে প্রবল তর্ক যুদ্ধ আরম্ভ হইয়া গেল। কিছুক্ষণ নানা প্রকার বাগ্বিতণ্ডার পর রামচন্দ্র ধীরে ধীরে তাঁহাদের প্রতিকূল যুক্তিগুলি খণ্ডন করিয়া দিয়া তাঁহাদিগকে স্বমতে আনয়ন করেন। সৎ সঙ্গের প্রভাবে তাঁহাদের চিত্ত ক্রমে সত্ত্বিকভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া

* কোন সময় অগ্রহায়ণ মাসে দ্বাদশী দিবসে চারি মূর্ত্তি ব্রজবাসী বৈষ্ণব খেতুরীতে আগমন করেন এবং কচি আমের রস খাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। অগ্রহায়ণ মাস আমের কাল নহে। কিন্তু কথিত আছে, বৈষ্ণব সেবাপরায়ণ ঠাকুর মহাশয় এক আমলী বৃক্ষ হইতে আম পাড়াইয়া বৈষ্ণব সেবা করিয়াছিলেন। লোকনাথ গোস্বামী প্রভুই নাকি পরীক্ষার নিমিত্ত বৈষ্ণবগণকে ঠাকুর মহাশয়ের নিকটে প্রেরণ করিয়াছিলেন।

নির্ম্মল আকার ধারণ করিল, তাঁহারা বুঝিলেন যে রাজসিক হিংসাত্মক উপাসনা অপেক্ষা নির্ম্মল প্রেম ধর্ম্মই শ্রেষ্ঠ। অতঃপর তাঁহারা ঠাকুর মহাশয় ও রামচন্দ্রের সহিত খেতুরীতে আসিলেন এবং আগ্রহের সহিত বিগ্রহাদি দর্শন করিলেন। আরতির সময় ভক্তি ভরে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া শ্রীবিগ্রহ দর্শন করিলেন এবং ইঁহাদের ভজন পদ্ধতিটীও বিশেষভাবে লক্ষ্য করিতে লাগিলেন এবং ক্রমেই যেন তাঁহাদের প্রতি আকৃষ্ট হইতে লাগিলেন। পরে নাম সঙ্কীর্ত্তনের সময় ঠাকুর মহাশয় ও রামচন্দ্রের দেহে অপূর্ব্ব প্রেমের বিকাশ দেখিয়া তাঁহারা অবশেষে তাঁহাদের চরণে আত্মসমর্পণ করেন, সকাতরে তাঁহাদের নিকটে দীক্ষা প্রার্থনা করিতে থাকিলে অবশেষে অনুরোধ কোন ক্রমেই উপেক্ষা করিতে না পারিয়া রামচন্দ্র হরিরামকে এবং ঠাকুর মহাশয় রামকৃষ্ণকে, দীক্ষা দান করিলেন। এই মধুময় সঙ্গ ছাড়িতে না পারিয়া তাঁহারা কিছুদিন খেতুরীতেই রহিয়া গেলেন। ভক্তি শাস্ত্র অধ্যয়ন এবং ভজনে তাঁহাদের দিন অতিবাহিত হইতে লাগিল।

কিছুদিন পর ঠাকুর মহাশয়ের আদেশানুসারে হরিরাম ও রামকৃষ্ণ গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। কিন্তু তাঁহারা ব্রাহ্মণ সন্তান হইয়া একজন বৈদ্যবংশোদ্ভব ও আর একজন কায়স্থ সন্তানের নিকট হইতে দীক্ষা গ্রহণ করিয়া আসিয়াছেন। সুতরাং পিতা শিবানন্দের সহিত সাক্ষাৎ হইলে তিনি নানা প্রকার কটুক্তি বর্ষণ করিয়া তাঁহাদিগকে ভর্ৎসনা করিতে লাগিলেন এবং শাস্ত্র প্রমাণাদি দেখাইয়া গুরু ত্যাগ করিবার নিমিত্ত আদেশ করিলেন। কিন্তু পুত্রদ্বয়কে যখন তিনি কোন প্রকারেই স্বমতে আনয়ন করিতে পারিলেন না তখন, তাঁহাদিগকে তিনি স্থানীয় পণ্ডিত সমাজে লইয়া আসিলেন। হরিরাম ও রামকৃষ্ণের ব্যবহার তাঁহাদের জাতির মর্য্যাদায় আঘাত করিয়াছে, সুতরাং তাঁহারাও ভ্রাতৃদ্বয়ের প্রতি নানা প্রকারে কটুক্তি বর্ষণ করিতে লাগিলেন। অবশেষে সকলে এক যোগে তাঁহাদিগকে শাস্ত্র যুদ্ধে

আহ্বান করিলেন। বিচার আরম্ভ হইল, হরিরাম ও রামকৃষ্ণ তাঁহাদের যুক্তিগুলি একে একে খণ্ডন করিয়া দিলেন। তাঁহাদের যুক্তির সারবত্তা অনুভব করিয়া পণ্ডিতগণের মধ্যে অনেকে সেই আলোচনার কালেই প্রকাশ্য ভাবে তাঁহাদের পক্ষ অবলম্বন করিলেন। অবশিষ্ট যাঁহারা রহিলেন পরে তাঁহারাও ভ্রাতৃদ্বয়ের প্রভাব এবং আচরণ দর্শন করিয়া ক্রমে তাঁহাদের প্রতি অনুরক্ত হইয়া পড়িলেন। * পাণ্ডিত্যাভিমান এবং ভক্তির বিচারে ভক্তিই জয়লাভ করিলেন। প্রেম ধর্ম্মের প্রভাব এইরূপে ক্রমে ক্রমে সমগ্র পণ্ডিত সমাজকেই অভিভূত করিয়া ফেলিতে লাগিল। এই সময় শিবানন্দের আহ্বানে মিথিলা নগরীর দিগ্বিজয়ী মুরারি পণ্ডিত আসিয়া আচার্য্য প্রভুর কৃপা-পাত্র বলরাম কবিরাজের দ্বারায় শাস্ত্র যুদ্ধে পরাজিত হ'ন এবং তাঁহার সংশ্রবে আসিয়া পণ্ডিতের মনোবৃত্তিও সম্পূর্ণরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। অবশেষে তিনিও বৈরাগ্য অবলম্বন পূর্ব্বক ভক্তি যাজনে প্রবৃত্ত হ'ন। এই ঘটনার পর শিবানন্দও বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রতি অনুরক্ত হইয়া পড়েন এবং স্বেচ্ছায় সেই ধর্ম্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন।

গঙ্গাতীরে বালুচরের নিকটবর্ত্তী গাম্ভীলা নামে এক গ্রাম আছে। মহামহোপাধ্যায় গঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তী নামে একজন বারেন্দ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণ সেই গ্রামে থাকিয়া অধ্যাপনা করিতেন। পাঁচ শত ছাত্র সর্ব্বদা তাঁহার অন্নে প্রতিপালিত হইয়া বিদ্যাভ্যাস করিতেন।

---

* উত্তরকালে হরিরাম আচার্য্য শ্রীশ্রীকৃষ্ণ রায় বিগ্রহ প্রকাশ করেন এবং সৈয়দাবাদে বসবাস করিতে থাকেন। বহু বহির্ম্মুখী ব্যক্তি দীক্ষা গ্রহণ পূর্ব্বক তাঁহার কৃপা শক্তিতে আদর্শ জীবন লাভ করেন। সৈয়দাবাদ আচার্য্য পরিবারের এক শাখা ইস্‌লামপুরে গিয়া বসবাস করেন। আচার্য্য প্রভুর পরিবার কর্ত্তৃক সেবিত শ্রীশ্রীরাধারমণ বিগ্রহ সেখানে এখনও বর্ত্তমান আছেন। রামকৃষ্ণ আচার্য্যও সৈয়দাবাদে বাস করিতেন। সৈয়দাবাদের শ্রীমোহনরায়জী তাঁহারই প্রতিষ্ঠিত এবং মণিপুর রাজবংশ তাঁহারই শিষ্য পরিবার।

তাঁহার নির্ম্মল চরিত্র এবং পাণ্ডিত্যের খ্যাতি সুদূর প্রসারি ছিল। হরিরাম ও রামকৃষ্ণের দীক্ষা গ্রহণের কাহিনী ক্রমে তাঁহারও কর্ণ গোচর হইল এবং সেই ঘটনা তাঁহার আজন্ম সঞ্চিত জাত্যভিমানের সংস্কারে আসিয়া আঘাত করিল। তাঁহাদিগকে স্বীয় মতে ফিরাইয়া আনিবার উদ্দেশ্যে তিনি ভ্রাতৃদ্বয়কে স্বগৃহে আহ্বান করিয়া তাঁহাদের সহিত বিচারে প্রবৃত্ত হ'ন। কিন্তু অবশেষে তিনিও পরাজিত হন, এবং তাঁহাদের প্রভাবে পড়িয়া বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রতি অনুরক্ত হইয়া উঠেন। পরে তাঁহার ব্যগ্রতা দর্শনে ভ্রাতৃদ্বয় তাঁহাকে ঠাকুর মহাশয়ের নিকট লইয়া আসিলে তিনি তাঁহার চরণে আত্মসমর্পণ পূর্ব্বক দীক্ষা গ্রহণ করেন। দীক্ষা লাভের পর গঙ্গানারায়ণ ঠাকুর মহাশয়ের ইঙ্গিতে ভক্তিশাস্ত্র অধ্যয়নে মনোনিবেশ করেন এবং অচির কালের মধ্যে বৈষ্ণব শাস্ত্রে অসাধারণ পারদর্শিতা লাভ করেন। তাঁহার অপূর্ব্ব ভজন নিষ্ঠা এবং বৈষ্ণব শাস্ত্রে অধিকার দেখিয়া সকলেই বিস্মিত হইতেন। বিষ্ণুপ্রিয়া নাম্নী একটী বিধবা কন্যা ব্যতীত গঙ্গানারায়ণের আর কোন সন্তান সন্ততি ছিল না। রামকৃষ্ণের কনিষ্ঠ পুত্র কৃষ্ণচরণ বাল্যকাল হইতে তাঁহার গৃহে থাকিয়া বিদ্যাভ্যাস করিতে ছিলেন। তিনি তাঁহাকেই পুত্রবৎ প্রতিপালন করিয়াছিলেন। ঠাকুর মহাশয়ের কৃপা প্রাপ্তির পর গঙ্গানারায়ণ কিছুদিন গাম্ভীলাতেই ছিলেন। পরে তিনি তাঁহার যাবতীয় সম্পত্তির ভার কৃষ্ণচরণের হাতে তুলিয়া দিয়া পত্নী ও কন্যার সহিত শ্রীধামে গমন করেন এবং রাধাকুণ্ডের তীরে থাকিয়া কঠোর ভজন অবলম্বন পূর্ব্বক অবশিষ্ট জীবন অতিবাহিত করেন। বৃন্দাবন যাত্রার পূর্ব্বে তিনি বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিকে দীক্ষা দান পূর্ব্বক বৈষ্ণব ধর্ম্মে প্রবিষ্ট করাইয়া ছিলেন। খেতুরীর অধ্যক্ষ ঠাকুরগণ এবং মুর্শিদাবাদ জেলার দৌলতাবাদের অন্তর্গত হাজির ডাঙ্গার ঠাকুর বংশ তাঁহারই শিষ্যানুশিষ্য। * তাঁহার

* শ্রীশ্রীরাধারমণ দেব নামে ধাতুময় বিগ্রহ গঙ্গানারায়ণ কর্ত্তৃক স্থাপিত হ'ন। শ্রীবিগ্রহের পাদ পীঠে গঙ্গানারায়ণের নাম অঙ্কিত আছে।

প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহ শ্রীরাধারমণ যথারীতি এখনও পূজিত হইতেছেন। হরিরাম ও রামকৃষ্ণ; তাঁহাদের ভজননিষ্ঠা এবং বৈষ্ণব শাস্ত্রে অসাধারণ পাণ্ডিত্যের গুণে কালক্রমে দেশবরেণ্য হইয়া উঠেন। তাঁহাদের মহত্ত্বের পরিচয়ে এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে গীতা, শ্রীমদ্ভাগবতাদি শাস্ত্রের প্রসিদ্ধ টীকাকার বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীপাদ রামকৃষ্ণের স্বহস্ত গঠিত এবং তাঁহারই মন্ত্র-শিষ্য ছিলেন। *

আসাম দেশীয় পণ্ডিত রূপনারায়ণ প্রায় সমগ্র ভারত ভ্রমণ করিয়া বিভিন্ন স্থানের পণ্ডিতগণকে শাস্ত্র-যুদ্ধে পরাজিত করিয়া দিগ্বিজয়ী আখ্যা লাভ করেন এবং এক সময় শ্রীধামে শ্রীরূপের নিকটে আসিয়া তাঁহাকে বিচারে আহ্বান করেন। শ্রীরূপ দৈন্যবশতঃ বিচারে অনিচ্ছুক হইয়া তাঁহাকে স্বেচ্ছায় জয়পত্রী লিখিয়া দিয়াছিলেন, কিন্তু শ্রীজীব তাঁহাকে গোপনে পরাজিত করেন। অতঃপর রূপনারায়ণ ভ্রমণ করিতে করিতে পক্ক পল্লীর জমিদার রাজা নরসিংহের নিকটে আসিয়া বাস করিতেছিলেন। ঠাকুর মহাশয় ও রামচন্দ্রের প্রভাবে পণ্ডিতগণের অভিমান যখন চূর্ণ বিচূর্ণ হইতেছিল তখন অন্যান্য স্থানের ন্যায় পক্ক-পল্লীর পণ্ডিত সমাজেও আলোড়নের সৃষ্টি হয়। স্থানীয় পণ্ডিতগণ তখন রূপনারায়ণের নেতৃত্বে দল গঠন করিয়া রাজা নরসিংহের নিকটে উপস্থিত হন এবং তাঁহাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করিয়া বলেন—'আমরা নরোত্তম ও রামচন্দ্রের সহিত বিচার করিতে ইচ্ছা করি, বিচারে তাহাদিগকে পরাজিত করিয়া আমরা সত্যের গৌরব পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিব। আপনি সে বিষয়ে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করুন। রাজা নরসিংহ ঠাকুর মহাশয়ের স্বগণ, সেই কারণে তাঁহার ও রামচন্দ্রের প্রভাবের কথা শুনিয়া তিনি মনে মনে তাঁহাদের প্রতি বিশেষ পরিতুষ্টই ছিলেন। তাঁহাদিগকে একবার দর্শন করিবেন সেইরূপ ইচ্ছাও তিনি অনেক দিন হইতে অন্তরে পোষণ

* কেহ কেহ বলেন বিশ্বনাথ, রামকৃষ্ণের পুত্র—কৃষ্ণচরণের শিষ্য ছিলেন। বিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকা ৪১০ শ্রীগৌরাঙ্গাব্দ ১৬ই চৈত্র সংখ্যা।

করিতেছিলেন। এখন এই সুযোগে তাঁহাদের চরণ দর্শন হইবে এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের পাণ্ডিত্য এবং ভজন বলেরও পরিচয় পাওয়া যাইবে মনে করিয়া তিনি পণ্ডিতগণের প্রস্তাবে সম্মত হইলেন এবং দুই এক দিনের মধ্যেই পণ্ডিতগণকে লইয়া খেতুরী অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

রাজা নরসিংহ খ্যাতিমান পণ্ডিতগণের সহিত শাস্ত্র-যুদ্ধ কামনায় খেতুরী আসিতেছেন, এই সংবাদ ঠাকুর মহাশয়ের নিকটে পৌঁছিল এই সংবাদে ভজন বিঘ্ন আশঙ্কায় তিনি ঈষৎ চিন্তিতও হইলেন। রামচন্দ্র তাঁহার মনের ভাব অবগত হইয়া বলিলেন—'চিন্তার কোন কারণ নাই, আপনার ভজনে যাহাতে বিঘ্ন না ঘটে সেইরূপ ব্যবস্থা আমরা করিব। তাঁহাদের খেতুরী প্রবেশের পূর্ব্বেই আমরা কৌশলে তাঁহাদিগকে পরাজিত করিয়া স্বমতে আনয়ন করিব। আপনি নিশ্চিন্ত হইয়া ভজনে নিযুক্ত থাকুন।' সেই পণ্ডিতগণের সহিত মিলিত হইবার নিমিত্ত রামচন্দ্র অতঃপর এক কৌশল অবলম্বন করিলেন। গঙ্গানারায়ণ, রামকৃষ্ণ, গোবিন্দ, জগন্নাথ আচার্য্য প্রভৃতি ভক্তগণকে ডাকিয়া তিনি তাঁহাদিগকে একে একে কুম্ভকার, তৈলকার, বারুই প্রভৃতির ছদ্মবেশে সজ্জিত করিলেন, নিজেও অনুরূপ সাজে সাজিলেন, পরে সকলকে লইয়া কুমারপুর বাজারে আমগন পূর্ব্বক পৃথক পৃথক ভাবে দোকান সাজাইয়া বসিয়া পড়িলেন। এদিকে রাজা নরসিংহও তখন পণ্ডিতগণকে লইয়া কুমারপুরে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন এবং সেদিন কুমারপুরেই তাঁহাদের থাকিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। পণ্ডিত মহাশয়গণের সহিত তাঁহাদের ছাত্রেরাও কৌতুক দেখিবার নিমিত্ত আসিয়াছেন। ছাত্রগণ ভ্রমণার্থ বহির্গত হইয়া ঘুরিতে ঘুরিতে এক সময় কুমারপুর বাজারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং পসারিগণের নিকটে আসিয়া দ্রব্যাদি দেখিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। এতক্ষণ রামচন্দ্রও তাহাই চাহিতেছিলেন। ছাত্রগণ ক্রমে তাঁহাদের নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং দ্রব্যাদির মূল্য

জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। ছাত্রগণের প্রশ্নের উত্তরে তাঁহারা সংস্কৃত ভাষা ব্যবহার করিতে লাগিলেন এবং সেই সঙ্গে দুই চারিটী করিয়া শ্লোকও আবৃত্তি করিতে লাগিলেন। সামান্য দোকানদারের মুখে নীতিবাক্য ও সংস্কৃত বচন শুনিয়া ছাত্রগণ ক্রোধে একেবারে ক্ষিপ্ত-প্রায় হইয়া উঠিলেন এবং মহা কলরবে তাঁহাদিগকে গালাগালি করিতে আরম্ভ করিলেন। ইঁহারাও নানা প্রকারে দম্ভ প্রকাশ করিয়া তাঁহাদিগকে শাস্ত্র-যুদ্ধে আহ্বান করিতে লাগিলেন। প্রবল তর্ক জমিয়া উঠিল, কিন্তু ছাত্রগণ তাঁহাদের সহিত পারিবেন কেন? ইঁহারা দুই এক কথাতেই তাঁহাদিগকে পরাজিত করিয়া দিলেন, পরে সগর্ব্বে বলিতে লাগিলেন 'আমরা খেতুরীর বাজারে ব্যবসা বাণিজ্য করিয়া খাই; বেদ বেদান্তের ধার ধারিনা বটে, কিন্তু এখানের মহামহোপাধ্যায়গণের চরণাশ্রয়ে বাস করি এবং তাঁহাদের আলোচনাও কিছু কিছু শ্রবণ করিয়া থাকি, অতএব শাস্ত্র কথাও কিছু কিছু শিখিয়া রাখিয়াছি। এখন আমাদের সহিত বিচার করিতে হইলে তোমাদের অধ্যাপকগণকে ডাকিয়া আন, আমরা তাঁহাদের সহিত বিচার করিব; তোমাদের শক্তিতে তাহা কুলাইবে না।' ছাত্রগণ ক্ষিপ্ত প্রায় হইয়া চলিয়া গেলেন এবং পণ্ডিত মহাশয়গণের নিকটে গিয়া সরোষে সকল কথা বিবৃত করিলেন। নগণ্য দোকানদারগণের এইরূপ ধৃষ্টতার কথা শুনিয়া তাঁহারাও ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন এবং তাঁহাদিগকে সমুচিত শিক্ষা দিবার নিমিত্ত সকলে দলবদ্ধ হইয়া বাজারে আসিলেন। উভয় দলের মধ্যে অচিরেই তর্ক বাধিয়া উঠিল। কিছুক্ষণ প্রবল বেগে বাগ্বিতণ্ডা চলিল। কিন্তু পণ্ডিতগণের প্রতিবাদ শক্তি ক্রমেই যেন নিঃশেষ হইয়া আসিতে লাগিল। তথাপি আরও কিছুক্ষণ নিস্ফল প্রতিবাদ করিয়া অবশেষে তাঁহারা নীরব হইলেন। মহতের সংস্পর্শে তাঁহাদের মনের ভাবও পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। আত্মিক উন্নতিতেই শাস্ত্র জ্ঞানের স্বার্থকতা, শুষ্ক পাণ্ডিত্যের মূল্য কিছুই নাই, এই কথা তাঁহারা তখন প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিলেন।

বিশুদ্ধ বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রতি একটী শ্রদ্ধার ভাবও অন্তরে জাগরিত হইল। পণ্ডিতগণ বিনয় নম্র ব্যবহারে তাঁহাদের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন। রামচন্দ্র দেখিলেন, যে উদ্দেশ্যে তিনি ফাঁদ পাতিয়া ছিলেন তাহা সর্ব্বাংশে সফল হইয়াছে। যথাযোগ্য সম্ভাষণে পণ্ডিতগণকে বিদায় দিয়া ছদ্মবেশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক তাঁহারা আনন্দের সহিত খেতুরীতে ফিরিয়া আসিলেন। পরদিন প্রভাতে রাজা-নরসিংহ এবং রূপ নরায়ণকে পুরোভাগে লইয়া পণ্ডিতগণ খেতুরীতে আসিয়া প্রবেশ করিলেন। তাঁহাদের সেই উদ্ধত ভাব আর নাই, অতি দীন ও শান্তভাবেই তাঁহারা ঠাকুর মহাশয়ের নিকটে আসিলেন এবং কয়েকদিন খেতুরাতে অবস্থান করিলেন। এই সময়ে রাজা নরসিংহ ও রূপ নারায়ণের সহিত অনেকেই পাণ্ডিত্য ও জাত্যভিমান ত্যাগ করিয়া ঠাকুর মহাশয়ের চরণে আত্ম-সমর্পণ পূর্ব্বক দীক্ষা গ্রহণ করিলেন। এই ঘটনার পর এক সময় নরসিংহের পত্নী রাণী রূপমালা তাঁহার সহিত খেতুরীতে আসেন এবং তিনিও ঠাকুর মহাশয়ের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। দীক্ষার পর হইতে ইঁহাদের জীবনের গতি সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। প্রত্যহ নিয়মিত ভাবে একলক্ষ নাম গ্রহণ এবং অনলস ভক্তি যাজনে তাঁহাদের অবশিষ্ট জীবন অতিবাহিত হয়।

রাজমহলে চাঁদ রায় নামে একজন প্রতাপশালী জমিদার ছিলেন। কালক্রমে ধনবল ও সৈন্যবলে শক্তিমান হইয়া তিনি নবাবের সরকারে রাজকর প্রেরণ বন্ধ করিয়া দিয়া এক প্রকার স্বাধীন হইয়া উঠেন, নবাব. সৈন্য প্রেরণ করিয়াও তাঁহার কোন ক্ষতি করিতে পারেন নাই। প্রাচীন ইতিহাসে এই চাঁদ রায়ের চরিত্র অত্যাচার, অনাচার ও ব্যভিচারের কলঙ্ক কালিমায় লিপ্ত। এক দল দস্যু সর্ব্বদা তাঁহার অধীনে থাকিয়া সর্ব্বত্র ঘুরিয়া বেড়াইত এবং তাঁহার ইঙ্গিত ক্রমে অপরের ধন সম্পত্তি ও নারী অপহরণ করিয়া তাঁহার নিকটে আনিয়া দিত। অবশেষে এই অত্যাচারের ফল একদিন ফলিল, চাঁদ রায়

উৎকট উন্মাদ রোগে আক্রান্ত হইলেন। সর্ব্বপ্রকার চিকিৎসাতেও যখন রোগের কিছুমাত্র উপশম ঘটিল না, তখন তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা সন্তোষ রায়, ঠাকুর মহাশয়ের শরণাপন্ন হন। সন্তোষ রায়ের কাতর অনুরোধ উপেক্ষা করিতে না পারিয়া তিনি রাজমহালে আসেন এবং চাঁদরায়কে দীক্ষা দান করেন। দীক্ষা লাভের পর কয়েকদিনের মধ্যেই তিনি রোগমুক্ত হন ; সেই সঙ্গে ঠাকুর মহাশয়ের অসীম করুণায় তাঁহাই চরিত্রের কলঙ্কসমূহ বিদূরিত হইয়া যায় এবং আদর্শ চরিত্রের অধিকারী হইয়া ভক্তি যাজনে অবশিষ্ট জীবন অতিবাহিত করেন। তাঁহার পিতা রাঘবেন্দ্র রায় এবং ভ্রাতা সন্তোষ রায়ও ঠাকুর মহাশয়ের চরণে আত্ম-সমর্পণ পূর্ব্বক দীক্ষা গ্রহণ করিয়া ভগবৎ ভজনে আত্ম-নিয়োগ করেন।

জলাপন্থের বিখ্যাত জমিদার হরিরায় বা হরিশচন্দ্র রায়ও ঠাকুর মহাশয়ের চরণাশ্রয় লাভ করেন। তাঁহার ভক্তি এবং দৈন্য-পূর্ণ ব্যবহারে প্রীত হইয়া ঠাকুর মহাশয় তাঁহাকে হরিদাস বলিয়া ডাকিতেন। ইঁহারা ব্যতীত রাজা গোবিন্দরাম প্রভৃতি আরও বহু প্রতাপশালী জমিদার এবং সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ আসিয়া ঠাকুর মহাশয়ের কৃপা লাভ করেন। চাঁদরায়ের এবং অন্যান্য জমিদারগণের আশ্রিত দুর্দ্ধর্ষ দস্যুদলগুলিও একে একে তাঁহার চরণে শরণাগত হয় এবং তাঁহার করুণায় দেবচরিত্রের অধিকারী হয়। যাহাদের নাম শ্রবণে জনসাধারণ আতঙ্কিত হইতেন ; যে সমস্ত ধর্ম্ম ভয়হীন দস্যু এবং দস্যু প্রকৃতির জমিদার, যাঁহাদের অত্যাচারেদেশে শান্তির লেশ মাত্র ছিলনা ; বাংলার নবাব এমন কি দিল্লীর সম্রাটও বাহুবলের দ্বারায় যাহাদিগকে দমন করিতে পারেন নাই ; চিন্তা করিলেআশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয় যে, সেই ব্যক্তিগণকে ঠাকুর মহাশয় প্রেমবলে বশীভূত করিয়া ভক্তিময় জীবন এবং আদর্শ চরিত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া দিয়াছিলেন। এইরূপে একদিকে সমাজের শীর্ষস্থানীয় ব্রাহ্মণ ও পণ্ডিতগণ এবং অপরদিকে অত্যাচারী জমিদার ও দস্যুগণ প্রায় সকলেই একে একে ঠাকুর মহাশয়ের চরণে

আসিয়া শরণ লইলেন। দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপিত হইল। ভক্তির স্রোত প্রবাহিত হইতে আরম্ভ হইল। * এই সময় ভক্তি ভাবের একটী ধারা সাহিত্য ক্ষেত্রেও আসিয়া প্রবেশ করে। ঠাকুর

* আচার্য্য প্রভুর মহিমা মুসলমান সমাজের উপরেও যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। সৈয়দ মুর্ত্তজা তাহার অন্যতম প্রমাণ। ইনি হুসেনশা'র পরবর্ত্তী বাংলার শাসনকর্ত্তা আলালদ্দিনের বংশধর এবং মুসলমান ধর্ম্মযাজক ছিলেন। মুর্শিদাবাদে গঙ্গার ঘাটে ইঁহার সহিত আচার্য্য প্রভুর সাক্ষাৎকার ঘটে। প্রথমতঃ তাঁহার শ্রীঅঙ্গের তেজ দেখিয়া মুর্ত্তজা আকৃষ্ট হন। স্নানান্তে আচার্য্য প্রভু উপরে উঠিলে মুর্ত্তজা কৃতাঞ্জলিপুটে চরণ বন্দনা করেন। পরে মুর্ত্তজার অনুগ্রহে প্রীত হইয়া আচার্য্য প্রভু তাঁহাকে 'গোপী গীতা' হইতে প্রসঙ্গ উদ্ধৃত করিয়া শ্রবণ করান; প্রীতিপূর্ণ এবং সারগর্ভ কিছু উপদেশও প্রদান করেন। এই সময় সম্ভবতঃ আচার্য্য প্রভু তাঁহার প্রতি শক্তি সঞ্চার করিয়াছিলেন এবং তাহারই ফলে মুর্ত্তজা কৃষ্ণপ্রেমে একেবারে উন্মত্ত হইয়া পড়েন এবং সেই অবস্থায় পদ স্ফূর্ত্তি হয়। পদখানি এই :—

শ্যাম বন্ধু চিত নিবারণ তুমি।
কিবা শুভক্ষণে দেখা তব সনে,
পাসরিতে নারি আমি ॥
আচার্য্য মুখেতে যেক্ষণে শুনেছি,
ধৈরজ ধরিতে নারি।
অভাগার প্রাণ করে আন চান,
দণ্ডে দশ বার মরি ॥
মোরে দয়া কর দেহ পদ-ছায়া,
শুনহ পরাণ কানু।
কুলশীল সব ভাসাইব জলে
প্রাণ যায় তোমা বিনু ॥
সৈয়দ মুর্ত্তজা মাগে পদে স্থান,
নিবেদন শুন হরি।
সকল ত্যজিয়া রব তোমা পাশে,
জীবন মরণ ভরি ॥ (পদ সমুদ্র)

মহাশয়ের স্বরচিত প্রার্থনাগুলি এখনও বৈষ্ণবগণের পরম আদরের সম্পত্তি। রামচন্দ্র ও 'অকিঞ্চন সর্ব্বস্ব' নামে এ কখানি অমূল্য গ্রন্থ রচনা করেন। বলরাম দাস, গোবিন্দ দাস, জ্ঞান দাস, রায় বসন্ত, লোচন দাস প্রভৃতি বিখ্যাত পদকর্ত্তাগণ এই সময়েই আবির্ভূত হন। তাঁহাদের সেই সহজ সরল ভক্তি ও বৈরাগ্য ভাব পূর্ণ গ্রন্থ এবং পদাবলীগুলি সাহিত্য জগতে এক নবযুগের সূচনা আনিয়া দেয় এবং জনসমাজের হৃদয়ের মধ্যেও পরিবর্ত্তনের যে আলোড়নের সৃষ্টি করে, তাহাও অকিঞ্চিৎকর নহে। *

রামচন্দ্র-মহিমা।

আপন সুখ সুবিধার প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া এবং অন্তরে অপর কোনও প্রকার বস্তু বা পারিশ্রমিক প্রাপ্তির প্রত্যাশা না রাখিয়া, কায়মনোবাক্যে এবং শ্রদ্ধাপূর্ণ হৃদয়ে প্রভুর আদেশ পালন করাই যেমন ক্রীতদাসের একমাত্র কর্ত্তব্য, গুরুদেবের প্রতি আত্ম-সমর্পণকারী শিষ্যের কর্ত্তব্যও সেইরূপ। একটি যন্ত্রের যেমন নিজস্ব

অতঃপর মুর্ত্তজা শ্রীকৃষ্ণ চরণে আত্ম-সমর্পণ করেন এবং তাঁহার মুসলমান শিষ্যগণকেও শ্রীকৃষ্ণ মন্ত্রে দীক্ষিত করেন। পদ সমুদ্রে এবং পদ কল্পতরুতে মুর্ত্তজা রচিত পদাবলী আছে। মুর্ত্তজার সেবক নসীর মামুদ আচার্য্য প্রভুর সহিত মুর্ত্তজার এই মিলন রঙ্গ দেখিয়াছিলেন। সেই হইতে তাঁহারও চিত্ত নির্ম্মল হইয়া যায় এবং প্রেমে উন্মত্ত হইয়া সর্ব্বদা 'রাম' 'শ্যাম' বলিতে বলিতে গান করিয়া বেড়াইতে থাকেন। ইনি শ্রীকৃষ্ণলীলা বিষয়ক 'পদ' রচনা করিয়া গিয়াছেন। নসীর মামুদ রচিত 'পদ' পদসমুদ্র গ্রন্থে রহিয়াছে। (৪০৭ গৌরাঙ্গাব্দ ১৬ই অগ্রহায়ণ বিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকায় প্রকাশিত জীবন-বৃত্তান্তের সারাংশ)

* সমাজের উপর আচার্য্য প্রভু নরোত্তম ও শ্যামানন্দের প্রভাব সম্বন্ধে দীনেশ সেন মহাশয় লিখিয়াছেন —"......ত্রিপুরা, মণিপুর, ময়নামতী পাহাড়

কোনও প্রকার ইচ্ছা অনিচ্ছা বা কাম্য, অকাম্য বলিয়া কিছু নাই, পরিচালক যে ভাবে তাহাকে চালনা করিতে ইচ্ছা করিবেন, সে যেমন বিনা বিচারে সেই ভাবেই চলিতে থাকে, আত্মসমর্পণকারী শিষ্যকেও সেইরূপ হইতে হইবে। স্ব-প্রয়োজন সিদ্ধির চিন্তা যখন শিষ্যের হৃদয় হইতে সম্পূর্ণরূপে চলিয়া যাইবে এবং চিন্তার ধারাটী গুরুদেবের প্রীতির অনুকূলে প্রবাহিত হইতে থাকিবে, একমাত্র তখনই সেই শিষ্যকে আত্মসমর্পণকারী বলা যাইবে। আত্ম-সমর্পিত শিষ্যের হৃদয়ে ভগবৎ ভজনের যে প্রবৃত্তি দেখা যায় তাহাও গুরু সুখ তাৎপর্য্যময়ী লালসা ব্যতীত আর কিছুই নহে। এই আত্মসমর্পণের পূর্ণ রূপটী দেখিতে হইলে রামচন্দ্রের চরিত্র অনুশীলন করিতে হয়। নানা প্রকার ঘটনার ভিতর দিয়া আচার্য্য প্রভু নিজেই প্রিয়তম সেবকের হৃদয়ের সেই রূপটী প্রকাশ করিয়া দেখাইয়াছেন।

এক সময় আচার্য্য প্রভু, রামচন্দ্রের সহিত অঙ্গণে পদচারণা করিতেছেন, সম্মুখে তৃণ নির্ম্মিত একটী রজ্জু পড়িয়া আছে।

এবং কুকী প্রভৃতি উলঙ্গ পার্ব্বত্য জাতিদের মধ্যে বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রচার হইয়াছিল। পার্ব্বত্য ত্রিপুরা রাজ্যের পাহাড়িয়া লোকদিগকে আমি কুমিল্লার নিম্ন সমতল ভূমে প্রায়ই দেখিয়াছি...... ..তাহাদের কেহ কেহ দোকান হইতে চৈতন্যচরিতামৃত কিনিয়া লইয়া যায়। তাহারা টিপ্রা ভাষায় কথা বলে, সে ভাষা আমাদের নিকট দুর্ব্বোধ, কিন্তু কিছু কিছু বাংলা বলিতে পারে। ......শ্রীনিবাস, নরোত্তমের প্রচারকগণ ও তাঁহাদের বংশধরেরা যে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রচারের জন্য বিপুল আয়োজন করিয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই—" বৃহৎ বঙ্গ—৭৫৬ পৃষ্ঠা।

অকিঞ্চন সর্ব্বস্ব ব্যতীত রামচন্দ্র স্মরণ দর্পণ বঙ্গ-জয় (শ্রীমন্মহাপ্রভুর পূর্ব্ববঙ্গ ভ্রমণ বৃত্তান্ত) প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেন। গোবিন্দের রচনার মধ্যে সঙ্গীত মাধব নামক সংস্কৃত নাটক ও কর্ণামৃত কাব্য উল্লেখ যোগ্য।

আচার্য্য প্রভুর শিষ্য কৃষ্ণদাস বাবাজী এই সময়েই নাভাজী রচিত ভক্তমালের বঙ্গানুবাদ করেন। এই গ্রন্থে নূতন উপাখ্যানও কিছু কিছু সংযোজিত হয়।

আচার্য্য প্রভু হঠাৎ রামচন্দ্রকে তাহা দেখাইয়া বলিলেন 'দেখ দেখ রামচন্দ্র, একটী কিরূপ বিরাট সর্প আসিয়াছে!' সেই কথা শ্রবণের সঙ্গে সঙ্গে গুরুবাক্যে বিশ্বাসী রামচন্দ্রের দৃষ্টিতে সেই রজ্জুটী সর্পরূপে পরিদৃষ্ট হইল! রামচন্দ্র নিঃসংশয়ে সেটীকে সর্প বলিয়াই স্বীকার করিলেন! পরমুহূর্ত্তে গুরুদেব আবার যখনই বলিলেন যে উহা সর্প নহে, রজ্জু মাত্র, তখনই সেই বস্তুর প্রতি তাঁহার সর্প বুদ্ধি সম্পূর্ণরূপে অন্তর্হিত হইয়া গেল! এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহা রামচন্দ্রের দৃষ্টিতে রজ্জুরূপ ধারণ করিল! জন্মজন্মান্তরের অর্জ্জিত আমিত্ব এবং বিচার বুদ্ধিটুকুও রামচন্দ্র আপনার করিয়া রাখেন নাই; তাহাও শ্রীগুরু চরণে অর্পণ করিয়া দিয়াছেন। জগতের কয়জন ব্যক্তি আত্ম-সমর্পণের এই দুরূহ সাধনায় সিদ্ধি লাভ করিতে পারিয়াছেন বলা যায় না, কিন্তু রামচন্দ্র যে ইহাতে সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন তাহা প্রমাণিত হইয়াছে।

এক সময় আচার্য্য প্রভু শ্রীধামের পথে যাইতেছেন, রামচন্দ্রও সঙ্গে রহিয়াছেন। পথে প্রয়োজন অনুসারে রামচন্দ্র পানীয়, আহার্য্য প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়া আনিতেছেন, আবার আচার্য্য প্রভুও সময়ে সময়ে আনিতেছেন। রামচন্দ্রও বিনা দ্বিধায় গুরুদেবের সেবা গ্রহণ করিতেছেন। রামচন্দ্রের হৃদয়ে অহং বুদ্ধি অথবা বিচার বুদ্ধির যদি লেশ মাত্র থাকিত তাহা হইলে, আচার্য্য প্রভুর সেবা গ্রহণ করিবার কল্পনাও তিনি করিতে পারিতেন না। শাস্ত্রের অনুশাসন সাধারণ ব্যক্তিগণের নিমিত্ত, রামচন্দ্রের ন্যায় অসাধারণ ব্যক্তিগণের নিমিত্ত শাস্ত্রের কোনরূপ আদেশ নাই।

শিষ্যের পক্ষে গুরুদেবের আসনে উপবেশন পূর্ব্বক তাঁহারই ব্যবহৃত পাত্রে প্রসাদ গ্রহণ করা নীতি বিরুদ্ধ, কিন্তু রামচন্দ্র অসঙ্কোচে আচার্য্য প্রভুর ব্যবহৃত পাত্র এবং আসন ব্যবহার করিতেন। আচার্য্য প্রভু সময়ে সময়ে রামচন্দ্র ও ঠাকুর মহাশয়কে উভয় পার্শ্বে বসাইয়া প্রসাদ গ্রহণ করিতে বসিতেন। যাহা সুস্বাদু বলিয়া মনে

হইত তাহা আপনার পাত্র হইতে তুলিয়া তাঁহাদিগকে দিতেন। আহারকালে তাঁহাদিগকে স্পর্শও করিতেন। তাঁহাদের কাহারও মনেই এই বিষয়ে কোনও রূপ সঙ্কোচের ভাব উঠিত না। ঠাকুর মহাশয় ও রামচন্দ্র উভয়েই ব্রাহ্মণ নহেন, বিশেষতঃ রামচন্দ্র তাঁহার শিষ্য, তাৎকালীন সমাজ ব্যবস্থা অনুসারে এইরূপ আচরণ রীতি বিরুদ্ধ. ঠাকুরাণীগণ একবার এই সম্বন্ধে আচার্য্য প্রভুর নিকট প্রশ্নও করিয়াছিলেন। আচার্য্য প্রভু তখন স্নিগ্ধকণ্ঠে ঠাকুর মহাশয় ও রামচন্দ্রের গুণের কথা বর্ণনা করিতে করিতে আপনার দেহের প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলেন—'তাহাদের দেহ, আমার এই দেহ হইতে পৃথক বলিয়া জ্ঞান করিও না, তাহারা উভয়ে আমার দুইখানি বাহু মাত্র, সুতরাং ইহাতে কোন দোষ নাই।'

রামচন্দ্র যাজিগ্রামে অবস্থান করিতেছেন, সেই সময় আচার্য্য প্রভু একদিন তাঁহাকে বলিলেন—'তুমি বিবাহ করিয়াছ, অতএব পত্নীর প্রতিও তোমার কিছু কর্ত্তব্য আছে। পত্নী সম্ভাষণার্থে তোমার গৃহে গমন করা উচিত। অতএব তুমি অদ্যই গৃহে গমন কর।' বিবাহিত হইলেও রামচন্দ্র অখণ্ড ব্রহ্মচারী, তাঁহার দেহ স্মৃতি নাই, পুরুষ অভিমান নাই, তাঁহার বাহ্য অভ্যন্তর সমস্তই গুরুময়। গুরুদেবের আদেশ বাক্যের তাৎপর্য্য কি, সে বিষয়ে কিছুমাত্র চিন্তা তাঁহার মনে উদিত হইল না, সুতরাং মনে সঙ্কোচের ভাবও আসিল না। শ্রীগুরুদেবের আদেশ আসিয়াছে, অতএব তাহা পালন করিতে হইবে, রামচন্দ্র ইহার বেশী আর কিছু জানেন না। সেইদিন অপরাহ্নে রামচন্দ্র গৃহাভিমুখে যাত্রা করিলেন। গৃহে চলিয়াছেন বটে, কিন্তু মনপ্রাণ পড়িয়া রহিল যাজিগ্রামে। যথাসময়ে তিনি গৃহে উপস্থিত হইলেন। পত্নী রত্নমালা অপ্রত্যাশিতভাবে তাঁহাকে পাইয়া নিজ কক্ষে লইয়া আসিলেন এবং পরমানন্দে পতি-সেবায় নিযুক্তা হইলেন। রাত্রি আসিল, আহারাদির পর রামচন্দ্র নিভৃত শয়নকক্ষে আসিয়া শয্যায় উপবেশন করিলেন। পরে রত্নমালা

গৃহ কার্য্য সমাপন পূর্ব্বক আসিয়া গৃহ অর্গলাবদ্ধ করিলেন এবং স্মিতমুখে পতিপার্শ্বে উপবেশন করিলেন। পরস্পর কথোপকথন হইতে লাগিল। রামচন্দ্র আর কি কথা বলিবেন, আচার্য্য প্রভুর প্রসঙ্গই আরম্ভ হইল। কি ভাবে তিনি সমস্ত দিবস অতিবাহিত করেন, বিস্তারিতভাবে তাহাই বর্ণনা করিতে লাগিলেন। পরিশেষে তাঁহার স্নেহ ব্যবহারের কথা, সাধন ভজনাদির কথা, আলোচনা হইতে লাগিল। রামচন্দ্র নিজেই বা কিভাবে গুরুসেবা করেন, সেই সমস্ত কথাও তিনি আবিষ্ট চিত্তে রত্নমালাকে শ্রবণ করাইতে লাগিলেন। রাত্রির গভীরতা বাড়িতে লাগিল, রামচন্দ্রের মনও ক্রমশঃ ভাবরাজ্যের গভীরতম প্রদেশে প্রবেশ করিতে লাগিল। তিনি ভাবরুদ্ধ কণ্ঠে শ্রীগুরু মহিমা বর্ণন করিয়া চলিয়াছেন, আর সুপরিসর বক্ষের দুই পার্শ্ব দিয়া প্রেমাশ্রুর ধারা বহিতেছে, রত্নমালা তাঁহার স্থির দৃষ্টি পতির বদন কমলের প্রতি ন্যস্ত রাখিয়া সেই কথামৃত পান করিতেছেন এবং মধ্যে মধ্যে উদ্গত অশ্রুর ধারা অঞ্চল প্রান্ত দিয়া মুছিয়া ফেলিতেছেন। ক্রমে তাঁহার মনও যেন দেহ নিষ্ঠা ত্যাগ করিয়া রামচন্দ্রের ন্যায় গুরু প্রেমে বিভাবিত হইয়া অপ্রাকৃত লোকে বিচরণ করিতে লাগিল। এক দিব্য অনুভূতির আনন্দ-তরঙ্গে পড়িয়া তাঁহারা যেন সুখে সন্তরণ করিতে লাগিলেন। দেহে আবেশ মাত্র নাই, কে পুরুষ, স্ত্রীই বা কে, উভয়ের মধ্যে লৌকিক সম্বন্ধই বা কি, সে কথা তাঁহাদের মনে নাই। তাঁহারা উভয়েই তখন সেবিকা মাত্র। সেবিকা দ্বয় যেন একত্র মিলিত হইয়া প্রভুর লীলারস আস্বাদনে নিমগ্না। রাত্রি পরমানন্দে অতিবাহিত হইয়া গেল। উষার আলোক প্রকাশিত হইবার কিছু পূর্ব্বে রামচন্দ্র সহসা চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। মনে হইল 'সেবার সময় বহিয়া যাইতেছে, সুতরাং আর বিলম্ব করা চলে না।' রত্নমালার নিকট হইতে বিদায় লইয়া রামচন্দ্র পথে নামিলেন। তখনও রাত্রির অন্ধকার সম্পূর্ণ দূরীভূত হয় নাই। রামচন্দ্র আপন মনেই যাজিগ্রাম অভিমুখে অগ্রসর হইয়া চলিলেন।

কিন্তু কিছু দূর আসিয়াই তিনি হঠাৎ দাঁড়াইয়া পড়িলেন। মনে পড়িল, লীলা-প্রসঙ্গের আনন্দে পড়িয়া তিনি গুরু আদেশ বিস্মৃত হইয়াছেন। 'পত্নী সম্ভাষণ হয় নাই!' তখন সেই স্থান হইতে রামচন্দ্র পুনরায় ফিরিয়া চলিলেন। গৃহে আসিয়া রত্নমালাকে আলিঙ্গন দিলেন এবং পরক্ষণেই আবার ফিরিয়া চলিলেন। 'সেবার সময় বহিয়া যাইতেছে, এখন আর দাঁড়াইয়া কথা কহিবার সময় নাই। বিস্মিতা রত্নমালা দাঁড়াইয়া রহিলেন, কিন্তু সেদিকে দৃষ্টি নাই। পথে নামিয়াই তিনি দ্রুত গতিতে অগ্রসর হইয়া চলিলেন। নির্ব্বিকার এবং নিঃশঙ্ক চিত্তেই তিনি চলিয়াছেন। একজন সেবিকা শ্রীগুরু আদেশে অপর একজন সেবিকাকে আলিঙ্গন দান করিলেন, বান্ধবী আসিয়া তাঁহার বান্ধবীকে আলিঙ্গন করিলেন, ইহাতে অপরাধের ছিদ্র কোথায়? চলিতে চলিতে রামচন্দ্র যখন যাজিগ্রামে গুরুদেবের প্রাঙ্গণে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তখন পূর্ব্বাকাশে অরুণোদয়ের সূচনা সবে আরম্ভ হইয়াছে। ঠাকুর মহাশয় সম্মার্জ্জনী লইয়া অঙ্গণে ঝাড়ু দিতে ছিলেন। রামচন্দ্র আসিয়া তাঁহার নিকটে দাঁড়াইলেন। ঠাকুর মহাশয় দাঁড়াইয়া তাঁহার মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে বিস্ময়ে স্তব্ধ হইয়া গেলেন। আত্মবিস্মৃত রামচন্দ্র গৃহ হইতে সেই পত্নী সম্ভাষণের চিহ্ন ললাটে বহন করিয়া আনিয়াছেন। আলিঙ্গন কালে রত্নমালার সীমন্তের সিন্দুর রামচন্দ্রের ললাটে লাগিয়া গিয়াছিল. তাহা তিনি বুঝিতেও পারেন নাই। ঠাকুর মহাশয় সক্রোধে জিজ্ঞাসা করিলেন'কোথায় গিয়াছিল, ললাটে সিন্দুর কেন?' রামচন্দ্র নির্ব্বিকার কণ্ঠে বলিলেন 'গৃহে গমন করিয়াছিলাম. পত্নী সম্ভাষণার্থে গুরুদেব গৃহ গমনের আদেশ করিয়াছিলেন। রত্নমালার সীমন্তের সিন্দুরই সম্ভবতঃ ললাটে লাগিয়া গিয়া থাকিবে।' তাঁহার মুখে নিঃশঙ্ক স্বীকারোক্তি শ্রবণ করিয়া ঠাকুর মহাশয় ক্রোধে যেন জ্বলিয়া উঠিলেন। বিরক্তি পূর্ণ কণ্ঠে তিনি বলিলেন—'ছিঃ ছিঃ, রামচন্দ্র, ধিক্ তোমাকে! এই অপবিত্র দেহ লইয়া তুমি সেবা করিতে আসিয়াছ, তোমার লজ্জা হইল

না ! তোমার এতই সাহস হইয়াছে যে, স্ত্রী সম্ভোগের চিহ্নটুকুও মুছিয়া আসিবার প্রয়োজন বোধ করিলে না ?' এইরূপে তিরস্কার করিতে করিতে ঠাকুর মহাশয় সক্রোধে সেই সম্মার্জ্জনী তুলিয়া লইয়া রামচন্দ্রের পৃষ্ঠদেশে আঘাত করিলেন। পৃষ্ঠে আঘাত পড়িতেই রামচন্দ্রের চমক ভাঙ্গিল ; তাঁহার বাহ্য আবেশ ফিরিয়া আসিল। দেহ বুদ্ধি ফিরিয়া আসিল, বিচার বুদ্ধিও সেই সঙ্গে জাগিয়া উঠিল। তখন অনুতাপে পুড়িতে পুড়িতে তিনি ভাবিতে লাগিলেন, 'হায়, হায় ! আমি একি করিলাম ! আমি নারী দেহ সম্ভোগ করিয়া আসিলাম ! অনুশোচনাভরে কাঁদিতে কাঁদিতে রামচন্দ্র সেই স্থান হইতে অবনত শিরে সরিয়া আসিলেন, পরে স্নানাদি করিয়া বিমর্ষচিত্তে সেবাকার্য্যে আত্মনিয়োগ করিলেন।

আচার্য্য প্রভুর স্নানের সময় ঠাকুর মহাশয় প্রত্যহ স্বহস্তে শ্রীঅঙ্গে তৈল মর্দ্দন করিয়াদেন। যে কয়েক দিন তিনি নিকটে থাকেন এই সেবাটী নিজেই করেন। অন্যান্য দিনের ন্যায় সেই দিনও তিনি তৈল মর্দ্দন করিয়া দিতেছিলেন, মর্দ্দন করিতে করিতে আচার্য্য প্রভুর পৃষ্ঠদেশে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিতে পাইলেন—প্রভাতে রামচন্দ্রের পৃষ্ঠে সম্মার্জ্জনীর যে আঘাত তিনি করিয়াছিলেন, তাহার চিহ্ন আচার্য্য প্রভুর অঙ্গে রক্তিম আকারে সুস্পষ্টরূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে। রামচন্দ্রের দেহটী আচার্য্য প্রভু কর্ত্তৃক অঙ্গীকৃত। সুতরাং সেই দেহ আচার্য্য প্রভুর নিজস্ব। রামচন্দ্রকে উদ্দেশ্য করিয়া যে আঘাত তিনি করিয়াছেন তাহা আচার্য্য প্রভুর অঙ্গেই লাগিয়াছে, অতএব সে আঘাত তাঁহাকেই করা হইয়াছে। তীব্র মর্ম্মবেদনায় ঠাকুর মহাশয় ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন, হৃদয়ে অনুতাপের দাবানল জ্বলিতে লাগিল। তিনি মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন 'হায়, হায় ! আমি একি করিয়াছি ! আমি আচার্য্য প্রভুর অঙ্গে সম্মার্জ্জনীর আঘাত করিয়াছি ! কি উপায়ে আমি এই মহা অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করিব ?' বিবেক-জ্বালায় পুড়িতে পুড়িতে অবশেষে তিনি মনে মনে সঙ্কল্প করিলেন 'যে

হস্তের দ্বারায় আমি আজ আচার্য্য প্রভুর অঙ্গে আঘাত করিয়াছি, সেই হস্তের যথোপযুক্ত শাস্তি হওয়া প্রয়োজন। এই হস্ত দুইখানি অদ্য রাত্রেই অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া ফেলিব।' এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া তিনি পূর্ব্ববৎ তৈল মর্দ্দন করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহার এই ভীষণ সঙ্কল্পের কথা আচার্য্য প্রভুর নিকটে গোপন থাকিল না। তিনি মনে মনেই তাহা অনুভব করিলেন এবং হঠাৎ যেন আপন মনেই বলিয়া উঠিলেন :—

'এ দেশে বিচার নাই বাপ্ রে বাপ্।
দিনে মারে ঝাঁটার বাড়ী রাত্রে পোড়ায় হাত ॥'

ঠাকুর মহাশয় প্রায়শ্চিত্ত নিমিত্ত নিজের হাত দুইখানি দগ্ধ করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার দেহখানিও যে তাঁহার নিজস্ব সম্পত্তি নহে, সেখানিও যে আচার্য্য প্রভুরই অঙ্গীকৃত, মর্ম্ম-বেদনার আতিশয্যে তিনি সেই কথা বিস্মৃত হইয়া গিয়াছিলেন। আচার্য্য প্রভুর কথায় তাহা এইবার মনে পড়িল। তখন বুঝিলেন, কাহার অঙ্গে আঘাত করিয়াছিলেন এবং কাহার হস্ত দাহ করিয়া তিনি প্রায়শ্চিত্ত করিবার সঙ্কল্প করিতেছিলেন। ঠাকুর মহাশয় এতক্ষণ বহু চেষ্টায় হৃদয়ের আবেগ চাপিয়া রাখিয়াছিলেন, আর পারিলেন না। আচার্য্য প্রভুর অপূর্ব্ব করুণার কথা স্মরণ করিতে করিতে ধৈর্য্যের বাঁধ ভাঙ্গিয়া পড়িল। হাহাকার করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে ঠাকুর মহাশয় আচার্য্য প্রভুর চরণে লুটাইয়া পড়িলেন। তিনি ঠাকুর মহাশয়কে সস্নেহে তুলিয়া আলিঙ্গনে আবদ্ধ করিলেন। উভয়েরই নয়নে অশ্রুর অবিরল ধারা ছুটিতে লাগিল। সেই ধারায় উভয়ের অঙ্গ সিক্ত হইতে লাগিল। যেমন প্রভু, তেমনিই তাঁহার সেবক। তাঁহাদের নিগূঢ় লীলার তাৎপর্য্য অনুভব করিতে যাওয়া বহির্ম্মুখী জীবের পক্ষে সহজ নহে। ঠাকুর মহাশয় রামচন্দ্রের হৃদয়ের পরিচয় যতটা জানেন, ততটা আর কেহ জানেন না, তাঁহার মনোবৃত্তি ঠাকুর মহাশয়ের অজ্ঞাত নহে।

রামচন্দ্রের মহিমাটী লোক চক্ষে প্রকাশিত করিয়া দিবার নিমিত্তই তিনি তাঁহার প্রতি এইরূপ আচরণ করিলেন। আর আচার্য্য প্রভু তখন তাঁহাদের উভয়ের মহিমাটীকে প্রকাশ করিয়া দিলেন। পরবর্ত্তীকালে রামচন্দ্র যখন খেতুরীতে বাস করিতেছিলেন তখন, পতির বিচ্ছেদে কাতরা হইয়া রত্নমালা দেবী তাঁহাকে একবার পাঠাইয়া দিবার নিমিত্ত ঠাকুর মহাশয়কে পত্র দিয়াছিলেন। সেই হইতে ঠাকুর মহাশয় মধ্যে মধ্যে রামচন্দ্রকে গৃহে প্রেরণ করিতেন। সেবা ত্যাগ করিয়া যাইতে তাঁহার প্রাণ চাহিত না, তথাপি ঠাকুর মহাশয় তাঁহাকে জোর করিয়া পাঠাইতেন। একবার ঠাকুর মহাশয়ের অনুরোধে রামচন্দ্র গৃহে আসেন, কিন্তু কোনরূপে থাকিতে না পারিয়া সেই মধ্যরাত্রেই গৃহ ছাড়িয়া খেতুরী অভিমুখে যাত্রা করেন এবং ছুটিতে ছুটিতে উষাকালে মন্দির প্রাঙ্গণে আসিয়া উপস্থিত হন এবং অনুশোচনা ভ'রে কাঁদিতে কাঁদিতে মন্দির প্রাঙ্গণে ঝাড়ু দিতে আরম্ভ করেন। ঠাকুর মহাশয় ইতোমধ্যে মন্দিরে আসিয়া রামচন্দ্রকে ঝাড়ু দিতে দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। তিনি অন্তরাল হইতে দেখিলেন রামচন্দ্র ঝাড়ু দিতেছেন আর অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ সেই ঝাড়ু লইয়া আপন অঙ্গে পুনঃ পুনঃ আঘাত করিতেছেন। ঠাকুর মহাশয় তাড়াতাড়ি আসিয়া তাঁহার হস্ত হইতে সম্মার্জ্জনী কাড়িয়া লইলেন এবং নানা প্রকার প্রবোধ বাক্যে তাঁহাকে সান্ত্বনা দিলেন। সেই সময় রামচন্দ্রের অঙ্গের ঝাড়ুর দাগ ঠাকুর মহাশয়ের অঙ্গে ফুটিয়া উঠিয়াছিল।

আচার্য্য প্রভু তখন বিষ্ণুপুরে অবস্থান করিতে ছিলেন। একদিন প্রাতঃকালে বংশী বদনের সেবা যথারীতি সমাপন করিয়া তিনি লীলা স্মরণে বসিলেন। আপন সিদ্ধমঞ্জরী-দেহ স্মরণ পূর্ব্বক সেই দেহে লীলারাজ্যে প্রবেশ করিয়া ধ্যান যোগে কিছুক্ষণ সেবা কার্য্য করা তাঁহার প্রাত্যহিক ভজনের অঙ্গ ছিল। শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বমাধুরী আস্বাদনের নিমিত্ত আচার্য্য প্রভু রূপে অবতীর্ণ ; বিশেষ কোন রস

আস্বাদনের জন্য মণি মঞ্জরীও সেই দেহে প্রকটিত হ'ন। এই মণি মঞ্জরী স্বরূপে অবস্থিত হইয়া তিনি সেই দিনও ধ্যান যোগে লীলায় প্রবিষ্ট হইলেন। তিনি সচরাচর যে সময়টুকু ধ্যান করিতেন সেদিন সে সময়টুকু অতিক্রান্ত হইয়া গেল। সে দিন তিনি যেন ধ্যানের গভীরতম প্রদেশে আসিয়া পড়িলেন। দেহখানি সম্পূর্ণ নিশ্চল হইল। ধীর স্থিরভাবে তিনি আসনে উপবেশন করিয়া আছেন, শ্বাস বহিতেছে কি না সন্দেহ। সেদিন এই ভাবেই সমস্ত দিবস অতিবাহিত হইল, রাত্রি আসিল, প্রহর গণনা করিতে করিতে তাহাও শেষ হইয়া গেল। দেহে চাঞ্চল্য মাত্র নাই। তিনি সেই একভাবেই বসিয়া আছেন! সকলে বিপদ আশঙ্কায় ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। দ্বিতীয় দিবসও দিবা রাত্র সেইভাবেই চলিয়া গেল। তৃতীয় দিবসে সকলের উৎকণ্ঠা চরম সীমায় উপনীত হইল। তাঁহাদের মনে আশঙ্কা জাগিল, তিনি হয়ত এইবার মহা সমাধি অবলম্বনে লীলা সঙ্গোপন করিলেন। ঠাকুরাণী ও অপর সকলে ব্যাকুল হইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। বীর-হাম্বীর, ব্যাসাচার্য্য, কৃষ্ণবল্লভ, বল্লভী কবিরাজ প্রভৃতি সকলেই উপস্থিত আছেন। তাঁহারা আচার্য্য প্রভুর নাসায় তুলা ধরিয়া দেখিলেন নিশ্বাস সম্পূর্ণ বন্ধ। দেহে প্রাণের লক্ষণ কিছুমাত্র নাই। বহু প্রকার চেষ্টা করিয়াও যখন কেহই কিছু করিতে পারিলেন না তখন সকলে নিরুপায় হইয়া ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। গুরুগত প্রাণ রামচন্দ্রের কথা তাঁহাদের মনে পড়িল। আচার্য্য প্রভুর মনোবৃত্তি বুঝিতে পারে রামচন্দ্র ব্যতীত এমন ব্যক্তি আর কেহ নাই, কিন্তু রামচন্দ্র এখানে উপস্থিত নাই। যত শীঘ্র সম্ভব সংবাদ দিয়া তাঁহাকে আনয়ন করাই এখন তাঁহাদের কর্ত্তব্য; কিন্তু এই সুদীর্ঘ সময় অপেক্ষা করাইবা কি প্রকারে সম্ভব? ইতোমধ্যে যদি কিছু অমঙ্গল ঘটে তাহা হইলে কি হইবে? রামচন্দ্রকে আনয়ন করা ব্যতীত আর উপায়ও কিছু নাই। অতএব তাঁহাকে আনয়ন করিবার ব্যবস্থাতেই সকলে সম্মতি প্রকাশ করিলেন;

কিন্তু সংবাদ প্রেরণ করিতে হইল না। রামচন্দ্র আপনিই আসিলেন। বাহ্য বিষয়ে প্রক্ষিপ্ত চিত্তবৃত্তি নিরুদ্ধ করিয়া কেহ যদি তাঁহার চিত্তটীকে গুরুদেবের প্রতি স্থাপন করিতে পারেন এবং কায়মনোবাক্যে একমাত্র গুরুদেব ব্যতীত অপর কোন বস্তুর প্রতি যদি তাঁহার মন সন্নিবিষ্ট না হয় তবে, সেই ভাগ্যবান শিষ্যের হৃদয়ে গুরুদেব চিরতরে আবদ্ধ হইয়া পড়েন। তাঁহার হৃদয়ের প্রত্যেকটী বৃত্তি তখন শিষ্যের অন্তরে প্রকটিত হইতে থাকে। গুরু উপাসনার, এমন কি সর্ব্ববিধ উপাসনার ইহাই চরমতম সিদ্ধি বলা যায়। রামচন্দ্র সেই কঠিনতম সাধনায় সিদ্ধকাম হইয়াছিলেন। তিনি যে স্থানেই থাকুন, গুরুদেবের অন্তরের প্রতিটী সংবাদ তাঁহার হৃদয়ে সর্ব্বদা প্রতিফলিত হইত। বিষ্ণুপুরের এই ঘটনাও রামচন্দ্রের অগোচর রহিল না। সেই ঘটনা প্রাণে প্রাণে অনুভব করিয়া সেই তৃতীয় দিবসেই তিনি বিষ্ণুপুরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং মাতাঠাকুরাণী ও অন্যান্য সকলকে আশ্বস্ত করিয়া বলিলেন—'আপনারা কিছুমাত্র চিন্তা করিবেন না। প্রভু এখনই প্রকৃতিস্থ হইবেন। তিনি কোথায় কোন সুখে মগ্ন হইয়া আছেন, আমি দেখিতেছি। তিনি যেখানেই থাকুন, আপনাদের কৃপা সম্বল করিয়া তাঁহাকে অবিলম্বে ফিরাইয়া আনিব।' এই কথা বলিয়া রামচন্দ্র দেবী গৌরাঙ্গ প্রিয়ার চরণ বন্দনা করিলেন পরে, আচার্য্য প্রভুর নিকটে গমন পূর্ব্বক তাঁহারই পার্শ্বে উপবেশন করিয়া অচিরে ধ্যান মগ্ন হইয়া পড়িলেন। গদাধর স্বমাধুরী আস্বাদনেরনিমিত্তই রামচন্দ্ররূপে বিহার করিতেছেন, আবার ব্রজলীলার একটী বিশেষ রস আস্বাদনের জন্য করুণা মঞ্জরীও সেই দেহে আসিয়া একীভূত হইয়াছেন। রামচন্দ্র ধ্যানযোগে মঞ্জরী আবেশে লীলায় প্রবিষ্ট হইলেন। তিনি দেখিলেন, মঞ্জরীগণ যমুনার জলে অবতরণ করিয়া ব্যাকুলভাবে কি যেন অন্বেষণ করিতেছেন। শ্রীগুরুদেবও মণি-মঞ্জরী স্বরূপে তাঁহাদের সহিত যোগদান করিয়াছেন। রামচন্দ্র করুণা মঞ্জরী স্বরূপে তাঁহার নিকটে আগমন কারলেন। তাঁহাকে

দেখিয়া মণিমঞ্জরী পরম আনন্দিত হইলেন এবং বলিলেন, 'শ্রীমতীর নাসার বেশর পাওয়া যাইতেছে না। সখীগণ প্রভাতে শ্রীমতীর নিকটে গিয়া দেখেন তাঁহার নাসায় বেশর নাই। ইহাতে তাঁহারা অত্যন্ত বিচলিত হইয়া অন্বেষণের নিমিত্ত আমাদিগকে ইঙ্গিত করেন। আমরা স্থির করিলাম গত রাত্রে মহারাসের পর জলক্রীড়ার সময় সম্ভবতঃ এই বেশর যমুনার জলে পড়িয়া গিয়া থাকিবে। ইহাই অনুমান করিয়া আমরা জলের মধ্যে অনুসন্ধান করিতেছি।' রামচন্দ্র বুঝিলেন এই বেশরের অনুসন্ধানেই তিন দিন কাটিয়াছে। আরব্ধ সেবা অসম্পূর্ণ রাখিয়া প্রকট লীলায় প্রত্যাবর্ত্তনের কথা তাঁহার মনে জাগে নাই। তিনি ইহাও বুঝিলেন যে, বেশরের সন্ধান যতক্ষণ না পাইতেছেন ততক্ষণ তিনি ফিরিবেন না। গুরুকৃপা সম্বল করিয়া তিনিও জলে নামিয়া পড়িলেন। এই তিন দিবসের মধ্যে যে বস্তুর সন্ধান পাওয়া যায় নাই, গুরুকৃপাবলে রামচন্দ্র অল্প সময়ের মধ্যেই তাহা এক পদ্মপত্রের তলদেশ হইতে বাহির করিয়া ফেলিলেন। শ্রীগুরু নিষ্ঠার মহিমা জগতে প্রকাশ করিবার জন্যই যেন লীলাময় এই অপূর্ব্ব লীলার বিস্তার করিলেন। করুণা মঞ্জরী স্বরূপে রামচন্দ্র সেই বেশর লইয়া মণি মঞ্জরীকে দিলেন, তিনি পরমানন্দ সহকারে তাহা গুণ মঞ্জরীকে (গোপাল ভট্ট প্রভু) দিলেন, তিনি আবার রূপমঞ্জরীকে (শ্রীরূপ) দিলে, তিনি তাহা লইয়া আসিয়া শ্রীমতীর নাসায় পরাইয়া দিলেন। লীলারাজ্যের আনুগত্যমূলক সেবার এই ক্রমটী লক্ষ্য করিবার বিষয়। স্বতন্ত্রতার কোন স্থান সেখানে নাই। রামচন্দ্র যদি নিজেই সেই বেশর লইয়া শ্রীমতীকে পরাইয়া দিয়া আসিতেন, তবে কার্য্য সিদ্ধ হইত বটে কিন্তু তাহাতে আনন্দ সম্ভোগের এইরূপ চমৎকারিতা থাকিত না। তাহা ব্যতীত মর্য্যাদা লঙ্ঘনজনিত দোষ ঘটিত। আনুগত্যের এই ক্রমটী সাধক-জীবনের অবশ্য অবলম্বনীয় বিষয়। যাহা হউক, বেশর পাওয়া গিয়াছে। শ্রীমতী পরম অনন্দিত হইয়া এই নব সখীদ্বয়কে আপনার

চর্ব্বিত তাম্বুল দান করিয়া পুরস্কৃতা করিলেন ; আরব্ধ সেবা শেষ হইল। আচার্য্য প্রভুও সেই সঙ্গে হুঙ্কার করিতে করিতে সমাধি ত্যাগ করিলেন। রামচন্দ্রও অমনি আসন হইতে উঠিয়া পড়িলেন। ভক্তবৃন্দ যেন দেহে প্রাণ পাইলেন। আনন্দে আত্মহারা হইয়া সকলে নৃত্য করিতে করিতে রামচন্দ্রের জয় দিতে লাগিলেন। সকলেই আনন্দে উন্মত্ত, সেই সময় আবার কোথা হইতে এক অপূর্ব্ব বস্তুর গন্ধ আসিতে লাগিল, সেই গন্ধে তাঁহারা আনন্দে বিবশ হইয়া পড়িলেন। কোথা হইতে এই অপূর্ব্ব গন্ধ আসিতেছে তাহা নির্ণয় করিতে না পারিয়া সকলেই সন্ধান করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পর দেখা গেল, রামচন্দ্রের হস্তস্থিত কোন এক বস্তু হইতে সেই অপূর্ব্ব গন্ধ আসিতেছে। শ্রীমতীর কৃপাদত্ত প্রসাদি তাম্বুল সেই অপ্রাকৃত রাজ্য হইতে স্থূলরাজ্যে আসিয়া পড়িয়াছে, রামচন্দ্রও ইহা দেখিয়া বিস্ময়ে বিমুগ্ধ হইয়া পড়িলেন। তাঁহার নিকট হইতে ভক্তবৃন্দ তাম্বুলের অপূর্ব্ব ইতিহাস শ্রবণ করিলেন এবং প্রসাদ কণিকা লাভ করিয়া সকলে প্রাণ ভরিয়া রামচন্দ্রের জয় দিতে দিতে নৃত্য করিতে লাগিলেন। স্মরণ মননের দ্বারায়, শ্রীগুরু কৃপাবলে ত্রিকাল সত্যলীলায় প্রবেশধিকার লাভ করা যায়। ইহা শুধু কল্পনাবিলাস মাত্র নহে, এই ঘটনার দ্বারা তাহা প্রকৃষ্টরূপে প্রমাণিত হইল। গৌর পরিকরগণের আনুগত্যে ভজন পথে অগ্রসর হইতে পারিলে, ব্রজলীলা এবং গৌরলীলা, এই উভয় লীলাতেই প্রবেশাধিকার লাভ করা যায় এই ঘটনার দ্বারায় সে রহস্যও উদ্‌ঘাটিত হইল। ব্রজলীলায় প্রবেশের নিমিত্ত গৌর পরিকরগণের পক্ষে দেহান্তর গ্রহণেরও আবশ্যকতা নাই, রামচন্দ্রের হস্তস্থিত তাম্বুল সেই তত্ত্বই প্রকাশ করিয়া দিল। ব্রজলীলা আস্বাদনের দেহটী যদি পৃথক হইত তাহা হইলে সেই দেহের হস্তধৃত তাম্বুল এই দেহে আসিত না। শ্রীগুরু চরণে আত্ম-সমর্পণ কাহাকে বলে এবং তাহার দ্বারায় কি বস্তু পাওয়া যায় রামচন্দ্রের চরিত্র অনুশীলন করিলে তাহা বুঝিতে পারা যাইবে। তাঁহার

ন্যায় গুরু-প্রেমিক সিদ্ধ মহাত্মগণের কৃপাশক্তি সম্বল করিতে না পারিলে শুধু সাধনবলের দ্বারায় এই জাতীয় গুরু-প্রীতি লাভের সম্ভাবনা কিছুই নাই। *

অন্ত্য-লীলা।

ঠাকুর মহাশয় ও রামচন্দ্রের পরস্পর সম্প্রীতি এবং তাঁহাদের ভজন নিষ্ঠায় আচার্য্য প্রভু পরম পরিতুষ্ট। তদুপরি, সমাজের শীর্ষ স্থানীয় পণ্ডিত-সমাজ, অত্যাচারী জমিদার এবং দেশের কলঙ্ক স্বরূপ দুর্দ্ধর্ষ দস্যু সম্প্রদায়কে তাঁহাদের আনুগত্য লাভ করতঃ আদর্শ জীবন অবলম্বন করিতে দেখিয়া তিনি পরম-সুখী হইলেন, শ্রীমন্মহাপ্রভু নাম প্রেম প্রচারের যে গুরু ভারটী তাঁহার উপর অর্পণ করিয়াছিলেন, সেই সুকঠিন দায়িত্বটীকে জীবনের ব্রতস্বরূপে গ্রহণ করিয়া গোস্বামিগণের কৃপা শক্তি সম্বল করতঃ তিনি শ্রীধাম হইতে গৌড় মণ্ডলে আগমন করিয়াছিলেন এবং সেই মহান্ ব্রত উদ্‌যাপনের নিমিত্ত দুইটী অপরূপ বস্তু মনের মত করিয়া স্বহস্তে গঠন করিয়াছিলেন। সেই বস্তু দুইটীই ঠাকুর মহাশয় ও রামচন্দ্র। তাঁহাদের প্রসঙ্গ উঠিলেই আচার্য্য প্রভু আনন্দে বিবশ হইয়া সকলকে ডাকিয়া ডাকিয়া শুনাইতেন 'তোমরা নরোত্তম ও রামচন্দ্রকে আমার অভিন্ন স্বরূপ বলিয়াই জানিবে। আমারই দুইখানি বাহু নরোত্তম ও রামচন্দ্র রূপে কার্য্য করিতেছে, তাঁহাদের আপনজন বলিতে আচার্য্য প্রভু ব্যতীত তেমনটী আর কেহ নাই, তাঁহাদের উন্নতিতে সুখানুভব করিতেও আচার্য্য প্রভুর ন্যায় অপর কেহ নাই। ঠাকুর মহাশয় ও রামচন্দ্রের প্রতি আচার্য্য প্রভুর স্নেহ ধারার বেগ কতখানি ছিল, তাঁহার হৃদয়ের কতখানি অংশ

* এই অংশ শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজের সূচক কীর্ত্তনে শ্রীল রামদাস বাবাজী মহারাজে উক্তির তাৎপর্য্য অবলম্বনে লিখিত

তাঁহারা অধিকার করিয়াছিলেন, তাহা কে নির্ণয় করিবে? অধিককাল বিচ্ছেদ সহ্য করিতে না পারিয়া আচার্য্য প্রভু মধ্যে মধ্যে খেতুরী যাইতেন এবং তাঁহাদের সহিত কিছুদিন সেখানে অতিবাহিত করিয়া আসিতেন। তাঁহারাও মধ্যে মধ্যে যাজিগ্রামে আসিয়া কিছুদিন কাটাইয়া যাইতেন। মধ্যে মধ্যে আচার্য্য প্রভুকে কাটোয়া, কালনা, বুধরী প্রভৃতিস্থানেও যাইতে হইত। বীরহাম্বীর ও বিষ্ণুপুরের ভক্তগণের আগ্রহে সেখানে গিয়াও তিনি মধ্যে মধ্যে কিছুদিন থাকিয়া আসিতেন। যাজিগ্রামে যখন থাকিতেন তখন অধ্যাপনাদি কার্য্য যথারীতি নিজেই করিতেন। অন্য সময়ে কোনও সুযোগ্য শিষ্যকে অধ্যাপনাদির ভার দিয়া যাইতেন। দিন এইরূপেই অতিবাহিত হইত।

বসন্তকাল, গৌর পূর্ণিমা আগত প্রায় খেতুরীর সাম্বৎসরিক মহোৎসবে যোগ দানের নিমিত্ত আচার্য্য প্রভু খেতুরী গমনের উদ্যোগ করিতেছেন, ইতোমধ্যে একদিন বীরচন্দ্র প্রভু খড়দহ হইতে শুভাগমন করিলেন। খেতুরী মহোৎসবে যোগদান করিবার নিমিত্ত তিনিও আসিয়াছেন। আচার্য্য প্রভু এবং তাঁহার সন্তান সন্ততিগণ আসিয়া তাঁহার চরণ বন্দনা করিলেন এবং ঠাকুরাণীগণ শ্রদ্ধা সহকারে সেবার ভার গ্রহণ করিলেন। সকলেই যাত্রার নিমিত্ত প্রস্তুত, সুতরাং আর কাল বিলম্ব না করিয়া পরদিবস বীরচন্দ্র প্রভুকে লইয়া আচার্য্য প্রভু খেতুরী অভিমুখে যাত্রা করিলেন, শ্রীদাস, গোকুলানন্দ, ব্যাসাচার্য্য প্রভৃতি শিষ্যবর্গ তাঁহাদের অনুগমন করিলেন। কাটোয়া হইয়া তাঁহারা বুধরীতে আসিলেন। দুই দিবস নাম সঙ্কীর্ত্তনানন্দে অতিবাহিত করিয়া স্থানীয় ভক্তগণের সহিত একত্র হইয়া সকলে খেতুরী অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। হরিরাম, রামকৃষ্ণ, গঙ্গানারায়ণ, রাজা নরসিংহ, রূপনারায়ণ প্রভৃতি এবং অন্যান্য যাঁহারা খেতুরীতে উপস্থিত ছিলেন, সকলে সমবেত হইয়া যথাযোগ্য প্রণাম বন্দনা পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে আহ্বান করিয়া লইয়া আসিলেন। আমন্ত্রিত বৈষ্ণবগণও কয়েক দিনের মধ্যেই একে একে আসিয়া পড়িলেন। মহামহোৎসব

আরম্ভ হইয়া গেল। নাম সঙ্কীর্ত্তনের ধ্বনিতে খেতুরী টলমল করিতে লাগিল। ভক্তগণের অনুরোধ ক্রমে আচার্য্য প্রভু ও রামচন্দ্র শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করিয়া সকলকে শ্রবণ করাইলেন। এই উৎসবে এক মহতী সভার আয়োজন হইয়াছিল। বহু বিশিষ্ট পণ্ডিত এবং ভক্তবৃন্দের সম্মুখে বীরচন্দ্র প্রভু স্বয়ং বক্তৃতা করিলেন। বিভিন্ন শাস্ত্র যুক্তি এবং প্রমাণ সহযোগে তিনি সকলের সমক্ষে বৈষ্ণব ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত করেন, ওজস্বিনী ভাষায় সকলকে বুঝাইয়া দেন, ব্রাহ্মণ অথবা অব্রাহ্মণ যিনিই হউন না কেন, শ্রীকৃষ্ণ মন্ত্রে দীক্ষা যিনিই লাভ করিয়াছেন, তিনিই দ্বিজত্ব এবং ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়াছেন। তিনি যখন সভায় এই কথা মুক্ত কণ্ঠে ঘোষণা করিতে ছিলেন তখন, সকলে ঠাকুর মহাশয়ের গলদেশে এক দিব্য জ্যোতির্ম্ময় যজ্ঞোপবীত দর্শন করেন, বীরচন্দ্র প্রভু সকলকে তাঁহা দেখাইয়া বলেন 'তথাকথিত ব্রাহ্মণগণের যজ্ঞোপবীত থাকে দেহের বহির্ভাগে কিন্তু ভক্তের যজ্ঞোপবীত থাকে হৃদয়ে; দেহের অভ্যন্তরে। সূক্ষ্ম দৃষ্টি যাঁহারা লাভ করিয়াছেন তাহা, তাঁহারাই দেখিতে পান! বীরচন্দ্র প্রভু এই সভায় পণ্ডিত রূপনারায়ণকে গোস্বামী আখ্যা প্রদান করেন।

উৎসবান্তে আচার্য্য প্রভু রামচন্দ্রের সহিত যাজিগ্রামে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। বিদায় গ্রহণের পূর্ব্বে আচার্য্য প্রভু ঠাকুর মহাশয়কে এক নিভৃত স্থানে লইয়া গিয়া তাঁহার সহিত গোপনে কি যেন পরামর্শ করিলেন, কেহ জানিতে পারিল না। এই আলোচনার পর হইতেই ঠাকুর মহাশয়ের মনে ভাবান্তরের সৃষ্টি হইল, দেখিয়া মনে হইতে লাগিল, কোন একটা তীব্র বেদনাকে তিনি যেন প্রাণপণ শক্তির দ্বারায় গোপন করিবার চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু সময়ে সময়ে সেই সংযমের বাঁধ ভাঙ্গিয়া যাইতেছে এবং এক একবার অধীর হইয়া কখনও হাস্য আবার কখনও বা ক্রন্দন করিতে করিতে অঙ্গণময় গড়াগড়ি দিতেছেন! আবার কখনও বা সম্পূর্ণ শান্ত এবং উদাসভাবে অবস্থান করিতেছেন। তাঁহার বাহ্যাবেশ এক প্রকার চলিয়া গেল।

কিছুদিন পর রামচন্দ্র যাজিগ্রাম হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে, তাঁহাকে পাইয়া ঠাকুর মহাশয় অপেক্ষাকৃত শান্ত হইলেন বটে, কিন্তু মুখ দেখিয়া মনে হইতে লাগিল সেই বেদনার ভারটী হৃদয়ে বসিয়াই রহিয়াছে, প্রবল চেষ্টার দ্বারায় তাহার বহিঃপ্রকাশ টুকুই রোধ করিয়াছেন মাত্র।

যাজিগ্রামে প্রত্যাগমন করিয়া আচার্য্য প্রভু যথারীতি অধ্যাপনাদি কার্য্য করিয়া যাইতে লাগিলেন। এই অধ্যাপনা ব্যতীত দিবসের প্রতিটী মুহূর্ত্ত তাঁহার সুসংবদ্ধ প্রণালীতে ভজনানুষ্ঠানের দ্বারায় পরিপূরিত ছিল। দেহ ক্রমেই দুর্ব্বল ও অপটু হইয়া আসিতেছে। যৌবনে উদ্দীপনা এবং প্রাণশক্তি লইয়া যে পরিশ্রম তিনি অক্লেশে করিয়াছেন, সেই কঠোরতা সহ্য করিবার শক্তি সেই দেহে আর ছিল না। তথাপি সেই নিয়মের ব্যতিক্রম কখনও দেখা যায় নাই। পাষাণের রেখা হইতেও সেই প্রণালী যেন অধিকতর দৃঢ় ছিল। তাঁহার মনের সেই প্রবল ইচ্ছাশক্তির নিকটে বয়োধর্ম্ম এবং দেহধর্ম্ম যেন আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হইয়াছিল। ব্রাহ্মমুহূর্ত্ত হইতে আরম্ভ করিয়া মধ্যরাত্রি পর্য্যন্ত তাঁহার নিশ্ছিদ্র ভজনে অতিবাহিত হইত। শেষ রাত্রির দিকে বিশ্রামের জন্য যে সামান্য সময়টুকু নির্দ্দিষ্ট ছিল, কোনও কোনও দিন তাহাও ভজনানন্দে কাটিয়া যাইত। প্রত্যহ এক প্রহরকাল সংখ্যা সহকারে নামমালা জপ, গ্রন্থপাঠে এক প্রহর, এবং নাম-সঙ্কীর্ত্তনে দুই প্রহর অতীত হইত। শ্রীবংশীবদনের সেবা ও লীলা স্মরণেও দিবসের একটী দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হইত এবং গভীর রাত্রিতে অন্তরঙ্গ ভক্তগণের সহিত তিনি নিভৃতে যুগলবিলাস প্রসঙ্গ আস্বাদন করিতেন। কোনও দিন গীতগোবিন্দ, রাম রায়ের নাটক এবং চণ্ডীদাস অথবা বিদ্যাপতির পদাবলী অবলম্বনে আবিষ্ট চিত্ত হইয়া গান গাহিতেন এবং সেই ভাবেই সমস্ত রাত্রি অতিবাহিত হইয়া যাইত। বাহ্য জগত হইতে এইরূপে তিনি ক্রমেই যেন দূরে সরিয়া যাইতেছিলেন। স্থূলজগত বলিয়া যে একটা কিছু আছে সময়ে সময়ে সে অনুভূতিও তাঁহার মন হইতে যেন

সরিয়া যাইত। এই ভাবেই দিন কাটিতেছিল। এই সময় আবার কয়েকটী দুর্বিবষহ আঘাত আসিয়া তাঁহার মনটীকে যেন আরও অন্তর্ম্মুখী করিয়া দিল। শ্রীধাম হইতে একদিন সংবাদ আসিল, লোকনাথ প্রভু অন্তর্হিত হইয়াছেন, পরমারাধ্য শ্রীগুরুদেব গোপাল ভট্ট প্রভুও লীলায় প্রবিষ্ট হইলেন। * আর যাঁহারা ছিলেন তাঁহারাও প্রায় সকলেই ক্রমে ক্রমে অন্তর্হিত হইয়াছেন। এখন শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুও আর আছেন কি না সন্দেহ। যাঁহাদের মুখ চাহিয়া ভজন, সাধন, আমোদ, আহ্লাদ তাঁহারা সকলেই একে একে নিত্যধামে চলিয়া গেলেন। তিনিও এইবার চিন্তা করিলেন— 'শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং শ্রীগুরুগণের আদিষ্ট কার্য্য এই দেহের দ্বারায় যাহা হইবার, তাহা এক প্রকার শেষ হইয়াছে। অতএব আর অকারণে তাঁহাদের সঙ্গচ্যুত হইয়া বাঁচিয়া থাকায় মর্ম্মবেদনা ভোগ করা ছাড়া আর কিছু লাভ নাই। তবে বৃন্দাবনে যাইতে হইবে। অবশিষ্ট যে কয়দিন দেহ ধারণ করিয়া থাকিতে হইবে, শ্রীগুরু গৌরাঙ্গগণের পদাঙ্কিত ভূমিতে গড়াগড়ি দিয়াই সেই কয়দিন অতিবাহিত করিব এবং বসিয়া বসিয়া সেই শুভ-মুহূর্ত্তটীর অপেক্ষা করিব, সেই ঈপ্সিত ইঙ্গিত শ্রীগুরু দেবের নিকট হইতে যেদিন আসিবে সেই দিন, তাঁহার শ্রীচরণ সমীপে উপস্থিত হইবার সৌভাগ্য লাভ করিয়া ধন্য হইব।'

শ্রীধাম যাত্রা করিবার নিমিত্ত আচার্য্য প্রভু ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন, কিন্তু রামচন্দ্রকে সঙ্গে লইতে হইবে। যাত্রার দিন নির্দ্ধারণ করিয়া খেতুরীতে রামচন্দ্রের উদ্দেশ্যে পত্র প্রেরণ করা হইল। সেই পত্র দেখিয়া ঠাকুর মহাশয় ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। খেতুরী মহোৎসবের পর আচার্য্য প্রভু গোপনে তাঁহাকে যে সকল কথা বলিয়া গিয়াছিলেন তাহা আর একবার স্মরণ হইল। তিনি

* "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" গ্রন্থের মতানুসারে গোপাল ভট্ট প্রভু ১৫০৯ শকাব্দায় (১৫৮৭ খ্রীঃ) অন্তর্হিত হন।

বুঝিলেন, ইহাই আচার্য্য প্রভুর শেষ যাত্রা। তাঁহার শ্রীচরণ দর্শনের সৌভাগ্য ইহজীবনে আর হইবে না; রামচন্দ্রের সঙ্গসুখ লাভের সম্ভাবনাও এখন হইতে শেষ হইল। পরমারাধ্য শ্রীগুরুদেব ছাড়িয়া গিয়াছেন, ভট্ট প্রভুও লোকান্তরিত, আবার কিছুদিন পূর্ব্বে জনক জননী রাজা কৃষ্ণানন্দ এবং নারায়ণী দেবীও মর্ত্ত্যজগত ত্যাগ করিয়াছেন। এখন আচার্য্য প্রভুর স্নেহচ্ছায়ায় বসিয়া এবং রামচন্দ্রের সাহচর্য্যে ভজন প্রসঙ্গের মধ্যে থাকিয়া বিচ্ছেদের এই বেদনাটীকে তিনি কোনও প্রকারে ভুলিয়াছিলেন। এইবার আচার্য্য প্রভুও ছাড়িয়া চলিলেন। প্রাকৃত এবং অপ্রাকৃত এই উভয় রাজ্যের ঘনিষ্ঠ সহচর রামচন্দ্রও তাঁহার সহিত চলিলেন। এই সমস্ত কথা ভাবিতে ভাবিতে ঠাকুর মহাশয় অত্যন্ত বিচলিত হইয়া পড়িলেন এবং রামচন্দ্রের নিকটে আসিয়া তাঁহাকে দৃঢ় আলিঙ্গনে অবিদ্ধ করিয়া ব্যাকুল ভাবে কাঁদিতে লাগিলেন। বিচ্ছেদ বেদনায় উভয়েই ব্যাকুল! কে কাহাকে সান্ত্বনা দিবেন? স্থানীয় ভক্তবৃন্দের মধ্যে যাঁহারা নিকটে ছিলেন, তাঁহাদের এই অবস্থা দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। ইতঃপূর্ব্বে আচার্য্য প্রভুর সহিত রামচন্দ্র শ্রীধামে গিয়াছেন, স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া ঠাকুর মহাশয় স্বেচ্ছায় তাঁহাকে বিদায় দিয়াছেন, কিন্তু এইরূপ আর্ত্তি প্রকাশ করিতে কখনও দেখা যায় নাই। কিরূপেই বা তাঁহারা বুঝিবেন যে, এই জগতে ইহাই তাঁহাদের শেষ আলিঙ্গন, ইহাই তাঁহাদের শেষ মিলন। অপর সকলে জানেন এইবার রামচন্দ্রও আচার্য্য প্রভুর সহিত শ্রীধাম দর্শন করিয়া ফিরিয়া আসিবেন এবং খেতুরীতে আসিয়া ঠাকুর মহাশয়ের সহিত আবার মিলিত হইবেন। তাঁহাদের সঙ্গসুখ আস্বাদন করিতে করিতে তাঁহারাও আবার আনন্দ-সাগরে সন্তরণ করিবেন। ঠাকুর মহাশয় ও রামচন্দ্র উভয়ে উভয়কে নিবিড় ভাবে হৃদয়ে ধারণ করিয়া আছেন। উভয়ের নয়ন-ধারায় পরিধেয় সিক্ত হইয়া যাইতেছে। বহুক্ষণ পর, ঠাকুর মহাশয় ঈষৎ সংযত হইয়া রামচন্দ্রের সর্ব্বাঙ্গে সস্নেহে করমার্জ্জন করিতে করিতে অশ্রুসিক্ত কণ্ঠে

বলিলেন—'গুরুদেবের সহিত শ্রীধামে যাইতেছ, ইহা ত মহা সৌভাগ্যের কথা, ইহাতে দুঃখ করিবার কি আছে? তিনি বৃদ্ধ হইয়াছেন, সর্ব্বদা তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া সেবা পরিচর্য্যা করাই এখন আমাদের কর্ত্তব্য। সে সৌভাগ্য আমার হইল না। তুমিই সেই অধিকার লাভ করিয়াছ। এখন প্রাণপণে তাঁহার সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়া জীবন সার্থক করিতে থাক। জানিবে, ইহা অপেক্ষা বড় কর্ত্তব্য আর কিছুই নাই; ইহা অপেক্ষা বড় ভজনও আর কিছু নাই। আমি সর্ব্ব বিষয়েই অযোগ্য সেই কারণেই বোধ হয় তিনি আমাকে এই শূন্য খেতুরীতে ফেলিয়া রাখিয়া যাইতেছেন; নতুবা আমাকেও সঙ্গে লইতেন। তাঁহার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক। বিচ্ছেদ-বিহীন পুনর্ম্মিলনের সময় একদিন আসিবেই। আমি সেই আকাঙ্খিত দিনটীর আশা বুকে ধরিয়া একাকী এইখানেই বসিয়া থাকিব,' এই কথা বলিতে বলিতে ঠাকুর মহাশয় পুনরায় ব্যাকুল আবেগে কাঁদিতে লাগিলেন। পরে বলিলেন—'আমি যথার্থই স্বার্থপর, তুমি শুভকার্য্যে যাইতেছ ইহা জানিয়াও আমি সুখানুভব না করিয়া বেদনা ভোগ করিতেছি। আর আমি দুঃখ করিব না। তুমি পরমানন্দে যাত্রা কর।' এই কথা বলিয়া তিনি রামচন্দ্রকে বুকে ধরিয়া পুনরায় অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন।

রামচন্দ্র ও ঠাকুর মহাশয়, ইঁহাদের পরস্পরের প্রীতির গভীরতা কতখানি তাহা বুঝিবার শক্তি আমাদের নাই, সুতরাং তাঁহাদের এই বিচ্ছেদ বেদনার পরিমাণ নির্দ্ধারণ করিবার চেষ্টা করিতে যাওয়াও বৃথা। একটী প্রাণ যেন দুইটী দেহে বিহার করিতেছে, সেই প্রাণ আজ যেন দুই খণ্ডে বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল। বিদায় কালে রামচন্দ্র ঠাকুর মহাশয়ের চরণে প্রণত হইলেন। ঠাকুর মহাশয় বলিলেন—'শ্রীধাম দর্শনের পর যত শীঘ্র সম্ভব গুরুদেবের সহিত ফিরিয়া আসিবে।' রামচন্দ্রও যেন ইঙ্গিতে সম্মতি প্রদান করিলেন। ইহ জগতে তাঁহাদের আর দেখা-শোনা হইবে না, ইহা জানিয়াও

শুধু মনস্তুষ্টির নিমিত্তই যেন ঠাকুর মহাশয় এই কথা বলিলেন এবং রামচন্দ্রও সেইরূপ উত্তর দিলেন। কিন্তু বাক্যের তাৎপর্য্য অনুভব করিবার মত ব্যক্তি হয়ত সেখানে কেহ ছিলেন না।

রামচন্দ্র যাজিগ্রামে আসিলে পর আর কাল বিলম্ব না করিয়া আচার্য্য প্রভু দুই এক দিনের মধ্যে শ্রীধামের পথে যাত্রা করিলেন। ঠাকুরাণীদ্বয়, তাঁহাদের সন্তান সন্ততিগণ, ছাত্র ও শিষ্যবর্গ এবং অসংখ্য গুণমুগ্ধ প্রতিবেশী সকলে কাঁদিতে কাঁদিতে কিছু দূর অগ্রসর হইয়া তাঁহাদিগকে বিদায় দিয়া আসিলেন এবং শূন্য গৃহে ফিরিয়া আসিয়া সেই প্রথম দিন হইতেই তাঁহারা দিন গণনা করিতে আরম্ভ করিলেন, কবে তাঁহারা ফিরিয়া আসিবেন।

কিন্তু তাঁহাদের আশা আর ফলবতী হইল না। আচার্য্য প্রভু, রামচন্দ্র ; ইঁহাদের মধ্যে কেহই আর ফিরিয়া আসিলেন না। তাঁহাদের প্রত্যাগমনের আশা বুকে ধরিয়া যাজিগ্রাম বাসিগণ কিছুদিন অপেক্ষা করিলেন। পরে একে একে আচার্য্য প্রভু ও রামচন্দ্রের লীলা সংবরণের সংবাদ আসিল। সে কথা ঠাকুর মহাশয়ও যথা সময়ে শুনিলেন। সেই নিদারুণ সংবাদ শ্রবণের পর তাঁহার অন্তরের অবস্থা কিরূপ হইয়াছিল তাহা অনুমান করিবার সামর্থ্য আমাদের নাই। তবে ইঁহাদের লীলা প্রবেশের পর তিনি উভয়কে উদ্দেশ্য করিয়া দুইখানি পদ রচনা করিয়াছিলেন। সেই পদ দুইখানি মহানুভব ভক্তবৃন্দের নিমিত্ত উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। ঠাকুর মহাশয়ের বিরহ বেদনাটী তাঁহারা হৃদয় দিয়া অনুভব করিবেন ঃ—

(১)

বিধি মোরে কি করিল, শ্রীনিবাস কোথা গেল,
হিয়া মাঝে দিয়া দারুণ ব্যথা।
গুণের রামচন্দ্র ছিলা, সেহ সঙ্গ ছাড়ি গেলা,
শুনিতে না পাই মুখের কথা ॥

পুনঃ কি এমন হব, রামচন্দ্র সঙ্গ পাব,
এই জন্ম মিছা বহি গেল।
যদি প্রাণ দেহে থাক, রামচন্দ্র বলি ডাক,
তবে যদি যাও সেই ভাল॥
স্বরূপ রূপ সনাতন, রঘুনাথ সকরুণ,
ভট্ট যুগ দয়া কর মোরে।
আচার্য্য শ্রীশ্রীনিবাস, রামচন্দ্র যাঁর দাস,
পুনঃ নাকি মিলিব আমারে॥
না দেখিয়ে সে না মুখ, বিদরিয়া যায় বুক,
বিষ-শরে কুরঙ্গিনী যেন।
আঁচলে রতন ছিল, কোন্ ছলে কেবা নিল,
নরোত্তমের হেন দশা কেন॥

(২)

রামচন্দ্র কবিরাজ, সেই সঙ্গে মোর কাজ,
তার সঙ্গ বিনা সব শূন্য।
যদি জন্ম হয় পুনঃ, তার সঙ্গ হয় যেন,
নরোত্তম তবে হবে ধন্য॥
আচার্য্য শ্রীশ্রীনিবাস, আছিনু যাঁহার পাশ,
কথা শুনি জুড়াইত প্রাণ।
তেঁহ মোরে ছাড়ি গেলা, রামচন্দ্র না আইলা,
দুঃখে জিউ করে আন চান॥
যে মোর মনের ব্যথা, কাহারে কহিব কথা,
এ ছার জীবনে নাহি আশ।
অন্ন জল বিষ খাই, মরিয়া নাহিক যাই,
ধিক্ ধিক্ নরোত্তম দাস॥

আচার্য্য প্রভু ১৫২৫ শকে (১) কার্ত্তিকী শুক্ল অষ্টমী দিবসে ৮৪ বৎসর বয়সে এবং রামচন্দ্র ১৫৩৪ শকে (২) কার্ত্তিকী কৃষ্ণ অষ্টমী দিবসে লীলায় প্রবিষ্ট হন। তাহার পর ঠাকুর মহাশয়ও তাঁহাদের দুর্বিবষহ বিরহ জ্বালা বুকে ধরিয়া আর বেশী দিন প্রকট রাজ্যে ছিলেন না। অনতি কাল মধ্যেই কার্ত্তিকের কৃষ্ণ পঞ্চমী তিথিতে গঙ্গাতীরে স্বেচ্ছায়, অলৌকিক ভাবে মরজগত পরিত্যাগ করেন। শ্রীধাম বৃন্দাবনে এখনও আচার্য্য প্রভুর সমাধি রহিয়াছেন। সেই সমাধির পশ্চাতেই রামচন্দ্রের সমাধি বর্ত্তমান।

জয় শ্রীনিবাস নরোত্তম।
জয় রামচন্দ্র শ্যামানন্দ॥

সম্পূর্ণ।

(১) এই তারিখটী আচার্য্য প্রভুর বংশধরগণ কর্ত্তৃক রক্ষিত জীর্ণ হস্ত লিখিত 'বংশাবলী' হইতে প্রাপ্ত। শ্রীগৌরাঙ্গ সেবক পত্রিকা; সন ১৩১৮ সালের শ্রাবণ সংখ্যা।

(২) গৌড়ীয় বৈষ্ণব জীবন হইতে প্রাপ্ত তারিখ।

শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ।

ভজ নিতাই গৌর রাধে শ্যাম।
জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম॥

বন্দেঽহং শ্রীগুরোঃ শ্রীযুতপদকমলং শ্রীগুরূন্ বৈষ্ণবাংশ্চ
শ্রীরূপং সাগ্রজাতং সহগণরঘুনাথান্বিতং তং সজীবম্।
সাদ্বৈতং সাবধূতং পরিজনসহিতং কৃষ্ণচৈতন্যদেবং
শ্রীরাধাকৃষ্ণপাদান্ সহগণললিতান্ শ্রীবিশাখান্বিতাংশ্চ॥

ইতিহাস-প্রসঙ্গ।

শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু ও গোস্বামিগণের দ্বারায় শ্রীমন্মহাপ্রভু কলিজীবের হৃদয়ে ভক্তি ধর্ম্মের যে বীজটী রোপণ করিয়া দিয়াছিলেন, শ্রীমন্মহাপ্রভুর দ্বিতীয় প্রকাশ শ্রীল শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর করুণা-সিঞ্চনে তাহা অঙ্কুরিত এবং পুষ্প ফলাদিতে পরিশোভিত হইয়া মনোরম ভক্তিলতারূপে আত্ম-প্রকাশ করে। শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়, রামচন্দ্র কবিরাজ, শ্যামানন্দ প্রভু প্রভৃতি বাহু স্থানীয় শক্তিধর মহাজনগণের সহযোগিতায় ভারতের বুকে ধর্ম্ম, শিক্ষা, সাহিত্য, সমাজ এমন কি রাজনীতিক্ষেত্রেও আচার্য্য প্রভু যে অপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন আনয়ন করিয়া দিয়াছিলেন তাহা ঐতিহাসিকগণকেও বিস্মিত করিয়াছে। যে সমস্ত গ্রন্থ তাঁহার অপূর্ব্ব লীলামধুরী পরিবেশন করিয়াছেন কালপ্রভাবে তাহা যেন ক্রমেই দুর্ল্ভ হইয়া পড়িতেছে, ফলে লীলা আস্বাদন লোলুপ ভক্তগণকে বিশেষ অসুবিধার সম্মুখীন হইতে হইয়াছে। ভক্তবৃন্দের সেই অসুবিধা দূরীকরণের নিমিত্তই আমার এই প্রচেষ্টা। যে গ্রন্থসমূহ আচার্য্য প্রভুর লীলা পরিবেশন

করিয়াছেন, তাহার মধ্যে শ্রীনরহরি দাসের রচিত ভক্তিরত্নাকর, শ্রীনরোত্তম বিলাস, অনুরাগবল্লী, শ্রীনিত্যানন্দ দাসের প্রেম-বিলাস, শ্রীযত্নুনন্দন দাস ঠাকুরের কর্ণানন্দ, বিশেষতঃ এই গ্রন্থগুলিই সঙ্কলন বিষয়ে আমার অবলম্বন। তাহা ব্যতীত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের 'বৃহৎ বঙ্গ' এবং 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য,' মধুসূদন তত্ত্ববাচস্পতি মহাশয়ের গৌড়ীয় বৈষ্ণব ইতিহাস, হরিদাস দাস মহাশয়ের শ্রীশ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব জীবন, অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত শ্রীনিবাস আচার্য্য চরিত এবং শ্রীখণ্ডের প্রাচীন বৈষ্ণব গ্রন্থ, প্রাচীন শ্রীগৌরাঙ্গ সেবক পত্রিকা, শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকা, শ্রীল রামদাস বাবাজী মহারাজের মুখোদ্গীর্ণ আখর সমন্বিত কীর্ত্তন প্রভৃতির সাহায্য স্থানে স্থানে গ্রহণ করিয়াছি।

ভক্তিরত্নাকরাদি বিরাট গ্রন্থ হইতে আচার্য্য প্রভুর ঘটনাবহুল ও পরম তাৎপর্য্যপূর্ণ লীলা বৃত্তান্ত সঙ্কলন করিবার দুঃসাহস আমার ছিল না। মদীয় কুলাচার্য্য শ্রীল শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর বংশীয় শ্রীযুক্ত গতিকৃষ্ণ ঠাকুর গোস্বামী মহাশয় কর্ত্তৃক প্রদত্ত উৎসাহ এবং কৃপাশক্তি, পতিত পাবন বৈষ্ণবগণের কৃপাশীর্ব্বাদ ও পরম করুণ শ্রীগুরুদেব শ্রীল রামদাস বাবাজী মহারাজের অহিতুকী করুণা সম্বল করিয়াই লেখনী ধারণ করিবার সাহস পাইয়াছিলাম। গ্রন্থ সঙ্কলন বিষয়ে আমার নিজস্ব কৃতিত্ব কিছু মাত্র নাই; তবে যদি ত্রুটী বিচ্যুতি কিছু আসিয়া থাকে তাহা হইলে আমার স্বতন্ত্রতা দোষই তাহার একমাত্র কারণ, অতএব তাহার জন্য আমিই দায়ী। পাঠক পাঠিকাগণের নিকট প্রার্থনা করি তাঁহারা যেন গ্রন্থোক্ত সেই ত্রুটী বিচ্যুতিগুলি পরিত্যাগ পূর্ব্বক গ্রন্থ আস্বাদন করেন।

মূল গ্রন্থসমূহে আচার্য্য প্রভুর লীলা-প্রসঙ্গ অতি বিস্তারিত ভাবেই বর্ণিত হইয়াছে। গ্রন্থসমূহের মধ্যে আমি যাহা পাইয়াছি রসিক ভক্তবৃন্দ এবং ঐতিহাসিকগণের দৃষ্টিভঙ্গীর উপর লক্ষ্য রাখিয়া অবিকৃত ভাবে তাহাই সংক্ষিপ্ত আকারে বর্ণনা করিয়াছি। জটিল

সমালোচনা এবং মতবাদাদি প্রয়োগ করিয়া প্রসঙ্গ ভারাক্রান্ত করিবার কোনও রূপ চেষ্টা করি নাই। স্থলবিশেষে তাৎপর্য্য মূলক তথ্য যাহা আলোচনা করিয়াছি তাহা শাস্ত্র, মহাজন এবং সিদ্ধ মহাত্মগণের সিদ্ধান্ত অনুসরণেই করিয়াছি।

আচার্য্য প্রভুর আবির্ভাবাদি বিষয়ে সন, তারিখ প্রভৃতি লইয়া ঐতিহাসিকগণের মধ্যে এখনও গবেষণা চলিতেছে। এই বিষয়ে আমাদেরও কিঞ্চিৎ বক্তব্য রহিয়াছে। তাহা নিবেদন করিয়াই বর্ত্তমান প্রসঙ্গ শেষ করিব।

বৈষ্ণব গ্রন্থকারগণ ঐতিহাসিক মনোবৃত্তি লইয়া গ্রন্থ রচনা করেন নাই। লীলা মাধুর্য্যে অবগাহন করা এবং অপরকে সেই রসে অবগাহন করানই তাঁহাদের গ্রন্থ প্রণয়নের মূল লক্ষ্য ছিল। সেই কারণেই তাঁহাদের গ্রন্থ হইতে ঐতিহাসিক তথ্য নির্ণয় করা সুকঠিন, কিন্তু বর্ত্তমান যুগে মানুষের রুচি পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, লীলা কাহিনীর সহিত ঐতিহাসিক তথ্যগুলিও এখন প্রয়োজনীয় হইয়া পড়িতেছে।

আচার্য্য প্রভুর জীবনী বিষয়ে ঐতিহাসিক তথ্য নিরূপণের চেষ্টা যাঁহারা করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে কেহ প্রচলিত ইতিহাস এবং কেহ বা গ্রন্থোক্ত ঘটনাগুলিকে প্রধান করিয়া নিজ নিজ সিদ্ধান্ত স্থাপন করিয়াছেন। আমরা উভয় মতাবলম্বনে বিচার করিয়াই সিদ্ধান্ত নির্ণয় করিতে চেষ্টা করিব।

প্রচলিত ইতিহাস অবলম্বনে যাঁহারা বিচার করিয়াছেন, বিচারের মূল সূত্র তাঁহাদের তিনটী যথা :—

(অ) 'Vaisnava Literature P. 170' গ্রন্থে উক্ত আছে—'বৃন্দাবনে গোবিন্দজীর মন্দিরের প্রস্তর ফলকে লিখিত আছে যে ১৫৯০ খৃষ্টাব্দে (১৫১২ শকাব্দা) এই মন্দিরের নির্ম্মাণ কার্য্য সমাপ্ত হয়।

(আ) নগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত বিশ্বকোষ হইতে অবগত হওয়া যায় :—'আকবরের রাজত্বের ৩৪ বর্ষে গোবিন্দজীর মন্দির নির্ম্মিত

হয়।' আকবর সিংহাসনে আরোহণ করেন ১৫৫৬ খৃষ্টাব্দে। সুতরাং ১৫৫৬+৩৪=১৫৯০ খৃষ্টাব্দ (১৫১২ শকাব্দা)।

(ই) Growse's History of Mothura P. 241তে উক্ত আছে 'আকবর ১৫৭৩ খৃষ্টাব্দে (১৪৯৫ শকাব্দা) বৃন্দাবনে আসিয়া রূপ সনাতনকে দর্শন করেন।'

রূপ সনাতনের অপ্রকটের পর এবং গোবিন্দজীর মন্দির নির্ম্মাণের পর আচার্য্য প্রভু বৃন্দাবনে আগমন করেন। অতএব সিদ্ধান্ত করিতে হয় :—

আচার্য্য প্রভুর প্রথমবার বৃন্দাবনে আগমন, রূপ সনাতনের অপ্রকটের দুই বৎসর পর অর্থাৎ ১৫১৪ শকের ২০শে বৈশাখী পূর্ণিমা তিথিতে (১৫১২ অথবা ১৫১৩ শকের ২০শে বৈশাখ পূর্ণিমা ছিল না) অথবা তাহারও পর।

বৃন্দাবন আগমনের ১৫।২০ বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ ১৪৯৫ শক হইতে ১৪৯৮ শকের মধ্যে তাঁহার জন্ম।

বৃন্দাবনে ৬।৭ বৎসর বাস করিবার পর ১৫২১ বা ১৫২২ শকে তাঁহার প্রথমবার বৃন্দাবন ত্যাগ, বিষ্ণুপুর আগমন ইত্যাদি ঘটনা।

শ্রীশ্রীচৈতন্য চরিতামৃতের অন্যতম টিকাকার শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ নাথ মহাশয় উপরোক্ত সিদ্ধান্তই গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু এই সিদ্ধান্ত গ্রহণে কতকগুলি বিরোধ উপস্থিত হয়, তাহা এই—

১। ভক্তি রত্নাকর ও নরোত্তম বিলাসে উক্ত আছে যে আচার্য্য প্রভু নীলাচল যাত্রা করিয়া পথি মধ্যে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অপ্রকট বার্ত্তা শ্রবণ করিয়াছিলেন। এই ঘটনার প্রমাণ স্বরূপে ভক্তি-রত্নাকর, শ্রীনৃসিংহ কবিরাজ কৃত নবপদ্য হইতে এবং নরোত্তম বিলাস শ্রীকর্ণপূর কবিরাজ কৃত গুণ লেশ সূচক হইতে শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া প্রমাণ দিয়াছেন। ১৪৫৫ শকাব্দাতে শ্রীমন্মহাপ্রভু অন্তর্হিত হন। উপরোক্ত মতে আচার্য্য প্রভুর জন্ম ১৪৯৫—৯৮ শকের মধ্যে হইলে উপরোক্ত ঘটনা মিথ্যা হইয়া পড়ে।

২। উক্ত আছে—আচার্য্য প্রভু নীলাচল হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পর গদাধর পণ্ডিতের নিকট শ্রীমদ্ভাগবত অধ্যয়নার্থে যখন পুনরায় নীলাচল যাইতে ছিলেন তখন পথে, শ্রীগদাধর পণ্ডিতের অপ্রকট বার্ত্তা শ্রবণ করেন এবং পরে নীলাচলে না যাইয়া যখন পুনরায় গৌড়ের পথে ফিরিয়া আসিতেছিলেন তখন পথে, অদ্বৈত প্রভু ও নিত্যানন্দ প্রভুর অপ্রকট বার্ত্তা শ্রবণ করেন। এই ঘটনা আচার্য্য প্রভুর জন্মের অন্ততঃ ১৩।১৪ বৎসর পরে অর্থাৎ ১৫১০-১২ শকে ধরিয়া লইতে হয়। ১৪০৭ শকে শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মকালে শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর বয়স ছিল অন্ততঃ ৫২ বৎসর। (অদ্বৈত প্রকাশ গ্রন্থেরও এই অভিপ্রায়) ১৫১২ শকে তাঁহার তিরোভাব ধরিয়া লইলে তাঁহার জীবিত কাল ধরিতে হইবে অন্ততঃ ১৫৭ বৎসর। কিন্তু অদ্বৈত প্রকাশ গ্রন্থে উক্ত আছে অদ্বৈত প্রভু ১২৫ বৎসর প্রকট ছিলেন।

৩। প্রেম বিলাসে উক্ত আছে অদ্বৈত প্রভুর অপ্রকটের ১৩ বৎসর পর আচার্য্য প্রভু শান্তিপুর ভ্রমণে গমন করেন। উপরোক্ত কারণে এই ঘটনাও মিথ্যা ধরিয়া লইতে হইবে।

৪। আচার্য্য প্রভুর কন্যা হেমলতা ঠাকুরাণীর শিষ্য যদুনন্দন দাস ১৫২৯ শকে 'কর্ণানন্দ' রচনা করেন। উক্ত তারিখ কর্ণানন্দেই উক্ত হইয়াছে। ১৪৯৫-৯৮ শকাব্দায় আচার্য্য প্রভুর জন্ম ধরিয়া লইলে তাঁহার বিবাহ কাল হইবে অন্ততঃ ১৫২২ শকের পর। (কারণ প্রথমবার বৃন্দাবন হইতে প্রত্যাগমনের পর তাঁহার বিবাহ হয়।) সুতরাং বিবাহের মাত্র ৭ বৎসরের মধ্যে তাঁহার কন্যার জন্ম, দীক্ষা প্রদান এবং তাঁহার শিষ্যের দ্বারায় গ্রন্থ রচনা অস্বাভাবিক ঘটনা।

৫। ১৪৩১ শকে শ্রীমন্মহাপ্রভুর সন্ন্যাস গ্রহণকালে আচার্য্য প্রভুর পিতা শ্রীচৈতন্য দাস যখন কাটোয়াতে প্রভুকে দর্শন করিতে যান তখন তিনি বিবাহিত যুবক, সুতরাং প্রভু অপেক্ষা বয়ো জ্যেষ্ঠ না হইলেও অন্ততঃ সমবয়স্ক ধরিতে হইবে। আচার্য্য প্রভুর জন্ম ১৪৯৮ শকে ধরিলে তখন তাঁহার পিতার বয়স হইবে ৯১ বৎসর। তাহারও

১১।১২ বৎসর পর তিনি পুত্রকে বলিতেছেন 'তুমি বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়াছ এইবার তুমি সংসারের ভার গ্রহণ কর। আমি শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীরূপ সনাতনের আশ্রয়ে গমন করিব। অর্থাৎ ১০২।১০৩ বৎসরের বৃদ্ধ শ্রীচৈতন্য দাস হাঁটিয়া বৃন্দাবনে ভজন করিতে যাইবেন। এই ইচ্ছা অস্বাভাবিক।

৬। রামচন্দ্র কবিরাজের পিতা চিরঞ্জীব সেন, শ্রীমন্মহ প্রভুর পরিকর ছিলেন। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে ১।১০।৭৬, ৭৭ পয়ারে এবং গৌর গণোদ্দেশ দীপিকায় সে কথার উল্লেখ আছে। তাঁহাকে শ্রীখণ্ডবাসী বলিয়াও বর্ণনা করা হইয়াছে। তিনি বিবাহের পর শ্রীখণ্ডে আসিয়া বসবাস করেন এবং নরহরি সরকার ঠাকুর মহাশয়ের সঙ্গ প্রভাবে প্রভুর প্রতি অনুরক্ত হন। অতএব প্রভুর পরিকর স্বরূপে যখন তিনি পরিচিত হইলেন, তখন তিনি বিবাহিত যুবক। ১৪৯৮ শকে আচার্য্য প্রভুর জন্ম ধরিয়া লইলে রামচন্দ্রের জন্ম তাহারও অনেক পরে। রামচন্দ্রের জন্মের পরও চিরঞ্জীবের আর একটী পুত্র ও একটী কন্যা জন্ম গ্রহণ করেন। তাহার পর তাঁহার দেহত্যাগ। অতএব ধরা যাইতে পারে তিনি অন্ততঃ ১৫১০ শক পর্য্যন্ত অবশ্যই জীবিত ছিলেন। সেই সময় তাঁহার বয়স হইবে অন্ততঃ ১০০ শত বৎসর। ৯০ বৎসর বয়সে তাঁহার ১ম সন্তান এবং ১০০ বৎসর বয়সে শেষ সন্তানের জন্ম হয়। কিন্তু কথিত আছে চিরঞ্জীব অল্প বয়সে দেহ ত্যাগ করিলে পর দামোদর পণ্ডিত দৌহিত্রগণকে প্রতি পালন করেন।

৭। ১৪৯৮ শকে আচার্য্য প্রভুর জন্ম ধরিলে তাঁহার নীলাচল গমনের কাল হইবে ১৫১০-১২ শকাব্দার মধ্যে তিনি সেখানে গিয়া গদাধর পণ্ডিত, রামরায়, সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য প্রভৃতির সহিত মিলিত হন। গদাধর পণ্ডিত মহাপ্রভুর সহপাঠী এবং তাঁহা অপেক্ষা ১ বৎসরের ছোট। অতএব ১৫১০ শকাব্দায় তাঁহার বয়স হইবে ১০৪ বৎসর। রামরায়, প্রভু অপেক্ষা অন্ততঃ ২৪।২৫ বৎসরের বড়,

তাঁহার বয়স হইবে ১২৯ বৎসর সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য প্রভু অপেক্ষা অন্ততঃ ৪০ বৎসরের বড়, কারণ প্রভুর বাল্যাবস্থাতেই সার্ব্বভৌম নবদ্বীপের খ্যাতনামা অধ্যাপক ছিলেন। এই সময় তাঁহার বয়স হইবে প্রায় ১৪৫ বৎসর।

৮। আচার্য্য প্রভু প্রথমবার বৃন্দাবনে ৭।৮ বৎসর ছিলেন। ১৫১৪ শকে তাঁহার বৃন্দাবনে আগমন ধরিয়া লইলে, বৃন্দাবন হইতে গৌড় প্রত্যাবর্ত্তন ১৫২১ শকে ধরা যাইতে পারে। সেই সময় রঘুনাথ দাস গোস্বামীর বয়স হইবে অন্ততঃ ১০৫ বৎসর। অথচ তিনি সেই বয়সে রাধাকুণ্ড হইতে ১৪ মাইল হাঁটিয়া বৃন্দাবনে আসিলেন এবং আচার্য্য প্রভুকে মথুরা পর্য্যন্ত পৌঁছাইয়া দিয়া গেলেন। ইহা অস্বাভাবিক মনে হয়।

৯। সরকার ঠাকুর মহাশয় প্রভু অপেক্ষা অন্ততঃ ৭।৮ বৎসরের বড়, উক্ত মতে তাঁহার অপ্রকট কাল হইবে ১৫২২ শকের পর। অর্থাৎ তিনি অন্ততঃ ১২২ বৎসর কাল জীবিত ছিলেন ধরিতে হইবে। ইহা ব্যতীত আচার্য্য প্রভুর দীক্ষাকালে গোপাল ভট্ট প্রভুর বয়স হইবে অন্ততঃ ৯২ বৎসর, কারণ ১৪৩২ শকে দাক্ষিণাত্য ভ্রমণে আসিয়া প্রভু তাঁহাকে ১০।১১ বৎসর বয়স্ক বালকরূপে দেখিয়াছিলেন। অতএব তাঁহার জন্মকাল হইবে ১৪২১-২২ শকাব্দা। সেই সময় শ্রীজীবের বয়স হইবে অন্ততঃ ৮৫ বৎসর। কারণ ১৪৩৬ শকে প্রভু রামকেলী গ্রামে আসিয়া যখন তাঁহাকে দর্শন করেন তখন তিনি শিশু। এই ঘটনার অন্ততঃ ২০।২৫ বৎসর পরও ইঁহারা দুইজনে জীবিত ছিলেন তাহারও, পরিচয় পাওয়া যায়।

১০। ভক্তিরত্নাকরাদিতে উদ্ধৃত শ্রীজীবের লিখিত কয়েকখানি পত্র আছে। ১৫১৪ শকে যে পত্র লিখিত হইয়াছে তাহাতে আচার্য্য প্রভুর সন্তান সন্ততির কথা উল্লিখিত আছে। ১৪৯৫-৯৮ শকে

আচার্য্য প্রভুর জন্ম ধরিয়া লইলে উক্ত কালে তাঁহার সন্তানের অস্তিত্ব অসম্ভব। তখন তাঁহার বিবাহই হয় নাই।

১১। আচার্য্য প্রভুর প্রথম বার বৃন্দাবন আগমনের পথে, রূপসনাতনের অপ্রকট সংবাদ শ্রবণের যে বিবরণ গ্রন্থে পাওয়া যায় তাহাও মিথ্যা বলিতে হইবে।

১২। দ্বিতীয় বার বৃন্দাবনে আসিয়া আচার্য্য প্রভু শ্রীজীবের নিকটে তাঁহার আরম্ভিত গোপাল চম্পূর পূর্ব্বচম্পূর কিয়দংশ যাহা রচিত হইয়াছিল, তাহা শ্রবণ করাইয়াছিলেন। এই ঘটনাও মিথ্যা হইয়া যায়। যেহেতু ১৫১৪ শকে তাঁহার ১ম বার বৃন্দাবনে আগমন ধরিয়া লইলে তখনই পূর্ব্ব ও উত্তর চম্পূ রচনা সম্পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু বর্ণিত আছে যে আচার্য্য প্রভু যখন দ্বিতীয়বার বৃন্দাবনে আসেন তখন তিনি পূর্ব্বচম্পূ রচনা সবে মাত্র আরম্ভ করিয়াছিলেন।

এইরূপ আরও বহু প্রকার অসঙ্গতি দেখিয়া মনে হয় তারিখ নির্ণয় ব্যাপারে ভুল আছে। এখন অতঃপর গ্রন্থোক্ত বর্ণনা এবং অন্যান্য প্রমাণ সংগ্রহ পূর্ব্বক বিচার করিয়া অপর কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় কি না তাহা দেখিতে হইবে এবং সেই সিদ্ধান্তের দ্বারা উপযুক্ত অসঙ্গতি বর্জ্জন পূর্ব্বক সঙ্গতি রক্ষা করা যায় কি না তাহাও দেখিতে হইবে।

(ক) ১৩১৮ সনে শ্রাবণ সংখ্যা শ্রীগৌরাঙ্গ সেবক পত্রিকায় সম্পাদকীয় প্রবন্ধে উক্ত হইয়াছে ঃ—"আমরা শ্রীআচার্য্য প্রভুর বংশধরগণের নিকট যে অতি জীর্ণ হস্ত লিখিত 'বংশাবলী' দেখিয়াছি তাহাতে আচার্য্য প্রভুর আবির্ভাব কাল ১৪৪১ শকে, ৮৪ বৎসর স্থিতি কাল……।"

(খ) বৈদ্যহিতৈষিণী পত্রিকায় ৩য় বর্ষ ১১ সংখ্যায় পদকর্ত্তা বলরাম দাসের বংশীয় প্রফুল্ল কুমার কবিরাজ ঠাকুর রচিত, পদকর্ত্তা শ্রীগোবিন্দ দাস কবিরাজ ঠাকুর শীর্ষক প্রবন্ধে ১৫০৭ শকে বাইশ

ভোগোৎসবের উল্লেখ আছে। বলরাম কবিরাজের আহ্বানে আচার্য্য-প্রভু, শ্রীদাস, গোকুলানন্দ প্রভৃতি তাঁহার বাইশ জন পরিকর লইয়া গোয়াস গ্রামে আসিয়া উৎসবের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। বলরাম, রামচন্দ্র কবিরাজের ভাগিনেয় ছিলেন। খেতুরী মহোৎসবের পর এই উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। বলরাম কবিরাজের, ঘরে যে পত্রী পাওয়া যায় তাহাতে কোন্ কোন্ মহাত্মা এই উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন এবং কত শকে উৎসব হইয়াছিল তাহা শ্লোকাকারে নিবদ্ধ আছে। শ্রীশ্রীনিতাই স্থন্দর পত্রিকা ৮ম বর্ষ ৮ম সংখ্যায় প্রকাশিত বুধরি বিলাস গ্রন্থের ২৭০ পৃষ্ঠায় সেই শ্লোক উক্ত হইয়াছে। তারিখ সম্বন্ধে তাহাতে উক্ত হইয়াছে :—

শাকে হৃদ্ধি বিন্দু বাণেন্দৌ ফাল্গুনী পূর্ণিমাতিথৌ।
গঙ্গা পদ্মা সঙ্গমেঽস্মিন্ গোয়াসে বৈ সমাগতাঃ ॥

অতএব এই উৎসব ১৫০৭ শকে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। বাইশ ভোগোৎসবের সত্যতা সম্বন্ধে এইমাত্র বলিতে পারা যায় যে ইহা প্রতি বৎসর এখনও যথারীতি প্রতিপালিত হইয়া আসিতেছে। ১৫০৭ শকে বাইশ মহোৎসব হইয়া থাকিলে আচার্য্য প্রভু তৎপূর্ব্বেই বৃন্দাবন হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন, বনবিষ্ণুপুরে বীরহাম্বীরের সহিত মিলিত হইয়াছেন এবং খেতুরী মহোৎসবও শেষ করিয়াছেন, ইহা ধরিয়া লইতে হইবে। ১৪৪১ শকে তাঁহার জন্ম হইলে উক্ত তারিখ সামঞ্জস্য পূর্ণ হইতে পারে। নিম্নোক্ত প্রমাণটীও এই মতের সমর্থক। যথা :—

(গ) বঙ্কুপ্রিয়া পত্রিকা, গৌরাঙ্গাব্দ ৪০৮।১লা ভাদ্র সংখ্যায় উক্ত আছে :—"খেতুরী মন্দির প্রতিষ্ঠার পর বীরহাম্বীর বনবিষ্ণুপুর রাজ্যে বিস্তর শ্রীবিগ্রহ প্রকাশ ও দেউল নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। পরিচয়ার্থে সেই সকল দেউলোপরি এক একটী প্রস্তর ফলকে ১৫০৭।১৫০৭ এবং ততোধিক সংখ্যা আছে।"

(ঘ) দীনেশ চন্দ্র সেন মহাশয় কৃত বঙ্গভাষা ও সাহিত্য গ্রন্থে খেতুরী মহোৎসবের তারিখ নির্দ্দেশ করিয়াছেন ১৫০৪ শকাব্দা। এই তারিখও আলোচ্য মতের অনুকুল। গৌরপদ তরঙ্গিনী গ্রন্থের প্রকাশক জগদ্বন্ধু ভদ্র মহাশয় এই মতের সমর্থক।

(ঙ) শ্রীজীব রচিত গোপাল চম্পু গ্রন্থেই উক্ত আছে যে পূর্ব্ব চম্পু রচনা তিনি শেষ করেন ১৫১০ শকে। আচার্য্য প্রভু দ্বিতীয়বার বৃন্দাবনে যখন আসিয়াছিলেন তখন সবে গোপাল চম্পু রচনা আরম্ভ হইয়াছে। ১৫১০ শকের ৪।৫ বৎসর পূর্ব্বে গ্রন্থ রচনা আরম্ভ হইয়াছিল ধরিয়া লইলে প্রায় ১৫০৫ শকে আচার্য্য প্রভুর দ্বিতীয়বার বৃন্দাবনে আগমন বলা যাইতে পারে।

(চ) গ্রন্থাদি হইতে ইহাও অবগত হওয়া যায় যে প্রথমবার বৃন্দাবন ত্যাগের ১।১॥০ বৎসর পর তাঁহার দ্বিতীয়বার বৃন্দাবনে আগমন; সুতরাং ধরিয়া লইতে পারা যায় ১৫০৩ শকে গ্রন্থ সম্পূট সহ তাঁহার প্রথম বৃন্দাবন ত্যাগ।

(ছ) বৃন্দাবন ত্যাগের ৭।৮ বৎসর পূর্ব্বে তিনি সেখানে আসিয়া ছিলেন (প্রথমবার)। সুতরাং ধরিয়া লওয়া যায় ১৪৯৫ শকের ২০শে বৈশাখই তাঁহার প্রথম বৃন্দাবনে আগমন। গ্রন্থে পাওয়া যায়, আচার্য্য প্রভুর বৃন্দাবন প্রবেশের দিন ২০শে বৈশাখ পূর্ণিমা তিথি। জ্যোতিষ বিচার দ্বারা শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ নাথ মহাশয়ও দেখাইয়াছেন উক্ত শকের উক্ত তারিখে পূর্ণিমা তিথি ছিল।

(জ) শ্রীমন্মহাপ্রভু ১৪৫৫ শকাব্দায় অন্তর্হিত হন। ভক্তি রত্নাকরাদি গ্রন্থে উক্ত আছে, আচার্য্য প্রভু ১৪।১৫ বৎসর বয়সে নীলাচল যাত্রার পথে প্রভুর অপ্রকট বার্ত্তা শ্রবণ করেন। এই নির্দ্দেশ হইতেও অবগত হওয়া যায় যে তাঁহার জন্ম ১৪৪১ শকাব্দাতেই হইবে। গৌড়ীয় বৈষ্ণব ইতিহাস—প্রণেতা মধুসূদন তত্ত্ব বাচস্পতি এবং গৌড়ীয় বৈষ্ণব জীবন প্রণেতা হরিদাস দাস মহাশয়ও এই সিদ্ধান্তে একমত।

উপর্য্যুক্ত নির্দ্দেশ অনুসারে যাহা পাওয়া গেল তাহা এই,—আচার্য্য প্রভুর জন্ম ১৪৪১ শকাব্দায়, ১৪ বৎসর বয়সে ১৪৫৫ শকাব্দায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তর্দ্ধান বৎসরে তাঁহার নীলাচল গমন। ১৪৯৫ শকের ২০শে বৈশাখ পূর্ণিমা দিবসে তাঁহার ১ম বার বৃন্দাবন প্রবেশ, ১৫০৪ শকে খেতুরী মহোৎসব এবং, তাহার অনতিকাল পূর্ব্বে ১৫০২ বা ১৫০৩ শকাব্দায় বিষ্ণুপুরে গ্রন্থ চুরি এবং বীরহাম্বীরের সহিত মিলন। ১৫০৫ শকে দ্বিতীয়বার বৃন্দাবন গমন। ১৫০৭ শকে গোয়স গ্রামে বাইশ মহোৎসব, ১৫২৫ শকে ৮৪ বৎসর বয়সে তিরোধান। এখন বিচার করিয়া দেখিতে হইবে যে উক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলে ঐতিহাসিক কোন বিরোধ আসিয়া উপস্থিত হয় কিনা। শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ নাথ মহাশয়ের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলে যে সমস্ত বিরোধ আসিয়া উপস্থিত হয় তাহা পূর্ব্বে ১২টী সূত্রে উল্লিখিত হইয়াছে। এখন সেই সূত্রগুলির ক্রম অনুসারে আলোচনা করিলে দেখা যাইবে বর্ত্তমান সিদ্ধান্ত অনুসারে কোন প্রকার বিরোধ আসিয়া উপস্থিত হয় না। ইহার মধ্যে ৪র্থ ও ১০ম সূত্র সম্বন্ধে বক্তব্য এই :- শেষোক্ত সিদ্ধান্ত অনুসারে আচার্য্য প্রভুর বিবাহ কাল স্থির করিতে হয় ১৫০৩ শকের কিছু পর। অতএব ১৫২৯ শকে আচার্য্য প্রভুর কন্যা হেমলতার শিষ্য কর্ত্তৃক গ্রন্থ রচনা অস্বাভাবিক নহে ১৫১৪ শকে আচার্য্য প্রভুর সন্তানের অস্তিত্বও স্বাভাবিক।

রসিক মঙ্গলে উক্ত আছে শ্যামানন্দের শিষ্য রসিকানন্দ ১৫১২ শকে জন্ম গ্রহণ করেন। শ্যামানন্দ আচার্য্য প্রভু অপেক্ষা কনিষ্ঠ, রসিকানন্দ শ্যামানন্দ অপেক্ষাও অনেক কনিষ্ঠ। ১৪৪১ শকে আচার্য্য প্রভুর জন্ম ধরিয়া লইলে ১৫১২ শকে রসিকানন্দের জন্ম অপ্রাসঙ্গিক হয় না। শ্রীরাধাগোবিন্দ নাথ মহাশয় Bankura gazetteer by L. S. S. O'-Mally P. 158 হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন যে, বনবিষ্ণুপুরে মল্লেশ্বর মন্দিরে একখানি খোদিত লিপি হইতে অবগত হওয়া যায় :—উক্ত মন্দির ১৬২২ খৃষ্টাব্দে অর্থাৎ

১৫৪৪ শকে বীরহাম্বীর কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হয়। গ্রন্থে পাওয়া যায় আচার্য্য প্রভুর উপস্থিতিতে কালাচাঁদ বিগ্রহ বীরহাম্বীর কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়। মল্লেশ্বর মন্দিরের কোন প্রসঙ্গ আচার্য্য প্রভুর কোন জীবনী গ্রন্থে পাওয়া যায় না। সুতরাং আচার্য্য প্রভুর অপ্রকটের পর তাহা বীরহাম্বীর কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়া থাকিবে। অতএব ইহাতে আমাদের সিদ্ধান্ত বিরোধী কোন কথা নাই।

আকবর নামা Translated by H. Beveridge Vol. III P. 879 হইতে নাথ মহাশয় উদ্ধৃত করিয়াছেন—কুতলু খাঁ পক্ষীয়দের যুদ্ধে মানসিংহের পুত্র জগৎসিংহ বিপন্ন হইলে বীরহাম্বীর জগৎ সিংহকে রক্ষা করিয়া বিষ্ণুপুরে আনয়ন করেন। এই ঘটনা ঘটে ১৫৯১ খৃষ্টাব্দে অর্থাৎ ১৫২৩ শকাব্দায়। (সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা ৫০ ভাগের ৩য় সংখ্যায় উক্ত আছে ১৫৯০ খৃষ্টাব্দ ২১শে মে তারিখে বাঁকুড়া রাইপুরের নিকট ধরমপুরে এই ঘটনা ঘটে।) Bankura gazetter হইতেও ইহা অবগত হওয়া যায়। ঘটনাটী ১৫২৩ বা ১৫২২ শকাব্দায়। ১৫০৩ শকে বীরহাম্বীরের সহিত আচার্য্য প্রভুর সাক্ষাৎকারের পর ইহা ঘটিয়াছিল এইরূপ মনে করিলে সিদ্ধান্তের কোন বিরোধ হয় না।

প্রবন্ধের প্রথমাংশে যে তিনটি ঐতিহাসিক সূত্র (অ, আ, ই) উক্ত হইয়াছে সেইগুলি লইয়া অতঃপর আলোচনা করিব।

(অ) উক্ত হইয়াছে, গোবিন্দ মন্দিরের শিলালিপি দেখিয়া সিদ্ধান্ত করিতে হয় এই মন্দিরের নির্ম্মাণ কার্য্য সমাপ্ত হয় ১৫১২ শকে। অতএব ১৫১২ শকে শ্রীরূপ সনাতন প্রকট ছিলেন। অতএব ১৪৯৫ শকে আচার্য্য প্রভুর বৃন্দাবনে আগমন মিথ্যা। কিন্তু এইরূপ অনুমান করা যাইতে পারে যে প্রথমে মানসিংহ ব্যবহারোপযোগী করিয়া মন্দির নির্ম্মাণ করতঃ শ্রীরূপ সনাতনের প্রকট অবস্থাতেই বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। পরে গোস্বামিদ্বয়ের অপ্রকটের পর ১৫১২ শকে অর্থাৎ ১৫৯০ খৃঃ অবশিষ্টাংশ সম্পূর্ণ করিয়া প্রস্তর

ফলক সন্নিবিষ্ট করেন। পূর্ব্বোক্ত ঐতিহাসিক বিরোধগুলির বিষয়ে চিন্তা করিয়া দেখিলে এইরূপ অনুমান করা অসঙ্গত হইবে না।

(আ) নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় তাঁহার বিশ্ব কোষেও সেই প্রস্তর ফলক দেখিয়াই মন্দির নির্ম্মাণের তারিখ নির্দ্ধারণ করিয়াছেন।

(ই) উক্ত হইয়াছে আকবর ১৫৭৩ খৃষ্টাব্দে বৃন্দাবনে আসিয়া শ্রীরূপ ও সনাতনকে দর্শন করেন। ১৫৭৩ খৃষ্টাব্দে হইল ১৪৯৪ শকের পৌষ মাসের শেষার্দ্ধ হইতে ১৪৯৫ শকের পৌষ মাসের প্রথমার্দ্ধ পর্য্যন্ত। সনাতন যদি ১৪৯৪ শকের মাঘ মাসে এবং শ্রীরূপ যদি ১৪৯৫ শকের ১৬ই বৈশাখ অপ্রকট হইয়াছিলেন ধরা যায়, তবে তাঁহারা ১৪৯৪ শকের পৌষ মাসের শেষার্দ্ধে উভয়েই প্রকট ছিলেন; এবং তাহা অবশ্যই ১৫৭৩ খৃষ্টাব্দ। যদি আকবর সেই সময়েই শ্রীধামে আসিয়া তাঁহাদিগকে দর্শন করিয়া যা'ন এইরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায় তবে উক্ত ঐতিহাসিক সূত্রটীর সহিত গ্রন্থাবলম্বিত সিদ্ধান্তের কোনও বিরোধ হয় না। এইরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণের মূলে আরও কারণ দেখা যায় তাহা এই—প্রেম বিলাস গ্রন্থে (৫ম বিলাস) উক্ত আছে বৃন্দাবন উপনীত হওয়ার ৪ দিন পূর্ব্বে আচার্য্য প্রভু সনাতনের অপ্রকট বার্ত্তা শ্রবণ করেন কিন্তু সংবাদ দাতাগণ শ্রীরূপের অপ্রকট সংবাদ তখনও জানিতেন না, ইহার ৩ দিন পর তিনি শ্রীরূপের তিরোধান সংবাদ পাইলেন। আষাঢ় ও শ্রাবণ মাসে শ্রীরূপ সনাতনের অন্তর্ধান ঘটিয়া থাকিলে ২০শে বৈশাখের ৪ দিন পূর্ব্বে সংবাদ দাতাগণ উভয়েরই তিরোধান সংবাদ দিতে পারিতেন। কিন্তু উক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলে দেখা যায়, সংবাদ দাতাগণ ১৬ই বৈশাখ তারিখে আচার্য্য প্রভুকে সনাতনের তিরোধান সংবাদ দিতেছেন এবং সেই দিনই বৃন্দাবনে শ্রীরূপের তিরোভাব ঘটে। প্রেম বিলাসের মত গ্রহণ করিলে ধরিয়া লইতে হইবে ১৬ই বৈশাখ শ্রীরূপ এবং তাহার চারি মাস পূর্ব্বে অর্থাৎ পৌষের শেষ অথবা মাঘ মাসে সনাতন অপ্রকট হন।

ভক্তি রত্নাকরেও উক্ত আছে "আচার্য্য প্রভু বৃন্দাবনে উপনীত হওয়ার মাত্র কিছুদিন পূর্ব্বে সনাতন এবং "এবে অপ্রকট হৈলা শ্রীরূপ গোসাঞি।" (৪র্থ তরঙ্গ)। গ্রন্থের মত অনুসরণ করিতে হইলে উপর্য্যুক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা ছাড়া উপায় নাই। কিন্তু আষাঢ়ী পূর্ণিমায় শ্রীসনাতনের এবং শ্রাবণ শুক্লা দ্বাদশীতে শ্রীরূপের তিরোধান তিথি পূর্ব্ব হইতেই বৈষ্ণব জগতে প্রতিপালিত হইয়া আসিতেছে। ইতিহাস এবং জীবনী গ্রন্থের প্রমাণ অপেক্ষাও ইহার মর্য্যাদা অনেক বেশী। এ ক্ষেত্রে আকবরের বৃন্দাবনে আগমন ১৫৭৩ খৃষ্টাব্দের অন্ততঃ ৭।৮ মাস পূর্ব্বে ঘটিয়াছিল যদি এইরূপ কোন প্রমাণ পাওয়া যায় তবে ঘটনার সামঞ্জস্য স্থাপিত হইতে পারে। তাহা অবশ্য ঐতিহাসিকগণের গবেষণার বিষয়।

শ্রীশ্রীচৈতন্য চরিতামৃতের রচনা কাল প্রচলিত চরিতামৃতে পাওয়া যায়—

"শাকে সিন্ধগ্নিবাণেন্দৌ জ্যৈষ্ঠে বৃন্দাবনান্তরে।
সূর্য্যেঽহ্ন্যসিতপঞ্চম্যাং গ্রন্থোঽয়ং পূর্ণতাং গতঃ॥

অতএব ১৫৩৭ শকাব্দায় চরিতামৃত রচনা সম্পূর্ণ হয়। আমরা দেখিয়াছি কর্ণানন্দের রচনা কাল ১৫২৯ শকাব্দা। কর্ণানন্দে চরিতামৃতের বহু পয়ার উদ্ধৃত থাকায় অবশ্যই বুঝিতে হইবে, তাহার রচনা কাল চরিতামৃত রচনার পর। প্রেম বিলাস কর্ণানন্দেরও পূর্ব্বে রচিত হয় কারণ কর্ণানন্দে প্রেম বিলাসের কথা উক্ত আছে। আবার প্রেম বিলাসে চরিতামৃতের পয়ার উদ্ধৃত থাকায় বুঝিতে হইবে চরিতামৃত প্রেম বিলাসেরও পূর্ব্বে রচিত হয়। এখন চরিতামৃত রচনার কাল যদি ১৫৩৭ শকাব্দায় ধরিয়া লইতে হয় তবে সামঞ্জস্য থাকে না, অতএব এবিষয়েও আলোচনা প্রয়োজন। চরিতামৃতের কোন কোন সংখ্যায় উক্ত শ্লোকের পাঠান্তর পাওয়া যায়। যথা—শাকেঽগ্নিবিন্দু বাণেন্দৌ··· ॥ এই পাঠ অনুসারে চরিতামৃতের রচনা কাল হয় ১৫০৩ শকাব্দা। অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় কৃত শ্রীনিবাস আচার্য্য চরিত

গ্রন্থের পাদটীকায় উক্ত আছে ১৫০৫ শকে ব্যাসাচার্য্য চরিতামৃতের প্রতিলিপি করেন, সেই গ্রন্থেও উক্ত তারিখ পাওয়া গিয়াছে। এই গ্রন্থ নাকি বাঁকুড়া, রাইপুর রাজবাড়ীর গ্রন্থাগারে রক্ষিত আছে। ১৫০৩ শকে চরিতামৃত রচিত হইলে ১৫০৫ শকে তাহার প্রতিলিপি লিখন অসম্ভব নহে। কিন্তু এই তারিখ ভুল। কারণ চরিতামৃতে গোপাল চম্পূর উল্লেখ আছে। গোপাল চম্পূর রচনা শেষ হয় ১৫১৪ শকাব্দায়। অতএব চরিতামৃত রচনা তৎপূর্ব্বে নহে। তাহা ব্যতীত চরিতামৃতে রামচন্দ্র কবিরাজ ও গোবিন্দ কবিরাজের নাম পাওয়া যায় (চৈঃ চঃ ১।১১) ১৫০৩ শকে তাঁহারা বৈষ্ণব ধর্ম্ম গ্রহণ করেন নাই। বৈষ্ণব জগতে পরিচিতও হন নাই বলিয়া তাঁহাদের নাম উক্ত শকে চরিতামৃতে লিখিত হওয়া সম্ভব নহে। অতএব ১৫০৩ শকে চরিতামৃত রচনা অসম্ভব। অনেকে অগ্নির অর্থ সাত মনে করেন সেই মত অনুসারে চরিতামৃতের রচনা কাল হয় ১৫৭৭ শকাব্দা। কিন্তু যেহেতু প্রেম বিলাস এবং কর্ণানন্দ গ্রন্থে চরিতামৃতের উল্লেখ আছে সেই হেতু উক্ত তারিখও ভুল। বৈষ্ণব ইতিহাসবিদ্ বাঁকুড়া বাসী শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ পালিত মহাশয়ের নিকট হইতে প্রাপ্ত সন ১২৪৩ সালের অনুদিত পুঁথি হইতে এই পাঠ পাওয়া গিয়াছে— যথা সপ্তনবত্যধিক পঞ্চদশে ১৫৯৭ শকে জ্যৈষ্ঠ মাসি সূর্য্যে রবিবারে কৃষ্ণ পক্ষীয় পঞ্চম্যাং বৃন্দাবন মধ্যে গ্রন্থ সম্পূর্ণ।" উপরোক্ত কারণে এই তারিখও ভুল। এই সমস্ত বিভিন্ন মতভেদের মধ্যে চরিতামৃত রচনার যথার্থ কাল নিরূপণ সম্ভব নহে। সুতরাং তাহার উপর নির্ভর করিয়া কর্ণানন্দ রচনার তারিখ লইয়া বিচার চলিতে পারে না। তবে চরিতামৃত রচনার কাল সম্বন্ধে আলোচনায় যাহা পাওয়া গেল তাহাতে বুঝিতে হইবে গোপাল চম্পূ রচনার পর এবং কর্ণানন্দ রচনার পূর্ব্বে অর্থাৎ ১৫১৪ শকাব্দা ও ১৫২৯ শকাব্দার মধ্যবর্ত্তী কোন সময়ে চরিতামৃত রচিত হইয়া থাকিবে। এই সূত্র হইতে আরও একটি সিদ্ধান্ত পাওয়া যাইবে,—প্রেম বিলাসের উক্তিতে দেখা যায় আচার্য্য

প্রভু বৃন্দাবন হইতে প্রথমবার আগমনের সময় গ্রন্থ সম্পুটের সহিত চরিতামৃত আনয়ন করেন। বন বিষ্ণুপুরে গ্রন্থ চুরি হইলে সেই সংবাদ পাইয়া কবিরাজ গোস্বামী শ্রীরাধা কুণ্ডে ঝাঁপ দিয়া ছিলেন। আচার্য্য প্রভু যখন গ্রন্থ সম্পুট আনয়ন করেন তখন গোপাল চম্পূ রচিত হয় নাই। অতএব তখন চরিতামৃতও রচিত হয় নাই। সুতরাং এই সংবাদ মিথ্যা।

যাহা হউক বিচারে এই পর্য্যন্ত যাহা পাওয়া গেল তাহাতে আমরা নিম্নোক্তরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলাম।—

আচার্য্য প্রভুর জন্ম ১৪৪১ শকাব্দায়, ১৪৫৫ শকে ১৪ বৎসর বয়সে তাঁহার নীলাচল যাত্রা। তাহার অনতিকাল পূর্ব্বে পিতা শ্রীচৈতন্য দাসের অপ্রকট। ১৪৫৬ শকে গদাধর পণ্ডিতের তিরোভাব। ১৪৯৫ শকে ২০শে বৈশাখ পূর্ণিমা তিথিতে তাঁহার বৃন্দাবন গমন। বৃন্দাবন গমনের ইচ্ছা থাকা সত্বেও সম্ভবতঃ দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া এবং স্বীয় জননীর অনুরোধেই হয়ত পূর্ব্বে যাওয়া সম্ভব হয় নাই। ইহার ৭।৮ বৎসর পর ১৫০২।৩ শকে ৬২ বৎসর বয়সে তাঁহার গৌড়ে প্রত্যাবর্ত্তন, গ্রন্থ চুরি এবং অনতিকাল পরে মাতৃ বিয়োগ ও ১ম বিবাহ। তাহার ১।১॥০ বৎসর পর দ্বিতীয়বার বৃন্দাবন গমন ইত্যাদি, পরে খেতুরী মহোৎসব এবং দ্বিতীয়বার বিবাহ। এই পরিণত বয়সে বিবাহ প্রসঙ্গ অসম্ভব বলিয়া মনে হইতে পারে কিন্তু ব্রহ্মচর্য্য এবং ভজন পরায়ণ ব্যক্তির পক্ষে ৬০।৬২ বৎসর বয়সে শরীর দৃঢ় থাকা অসম্ভব নহে, তাহা ব্যতীত কুলীন ব্রাহ্মণ সন্তানের পক্ষে এই বয়সে দার পরিগ্রহ করা সমসাময়িক সমাজ নীতির প্রতিকুলও নহে। তবে সামাজিক কর্ত্তব্য পালনই তাঁহার বিবাহের কারণ নহে, বিশেষ উদ্দেশ্য সিদ্ধির নিমিত্তই তাঁহার দার পরিগ্রহ করা। অদ্বৈত প্রকাশ রচয়িতা ঈশান নাগরকেও উক্ত কারণে সীতা দেবীর আদেশে ৭০ বৎসর বয়সে বিবাহ করিতে হইয়াছিল, এবং কালক্রমে তাঁহার ৩টি সন্তানও জন্মগ্রহণ করে। আচার্য্য প্রভুর প্রকট কাল ৮৪ বৎসর

ফলক সন্নিবিষ্ট করেন। পূর্ব্বোক্ত ঐতিহাসিক বিরোধগুলির বিষয়ে চিন্তা করিয়া দেখিলে এইরূপ অনুমান করা অসঙ্গত হইবে না।

(আ) নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় তাঁহার বিশ্ব কোষেও সেই প্রস্তর ফলক দেখিয়াই মন্দির নির্ম্মাণের তারিখ নির্দ্ধারণ করিয়াছেন।

(ই) উক্ত হইয়াছে আকবর ১৫৭৩ খৃষ্টাব্দে বৃন্দাবনে আসিয়া শ্রীরূপ ও সনাতনকে দর্শন করেন। ১৫৭৩ খৃষ্টাব্দে হইল ১৪৯৪ শকের পৌষ মাসের শেষার্দ্ধ হইতে ১৪৯৫ শকের পৌষ মাসের প্রথমার্দ্ধ পর্য্যন্ত। সনাতন যদি ১৪৯৪ শকের মাঘ মাসে এবং শ্রীরূপ যদি ১৪৯৫ শকের ১৬ই বৈশাখ অপ্রকট হইয়াছিলেন ধরা যায়, তবে তাঁহারা ১৪৯৪ শকের পৌষ মাসের শেষার্দ্ধে উভয়েই প্রকট ছিলেন; এবং তাহা অবশ্যই ১৫৭৩ খৃষ্টাব্দ। যদি আকবর সেই সময়েই শ্রীধামে আসিয়া তাঁহাদিগকে দর্শন করিয়া যা'ন এইরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায় তবে উক্ত ঐতিহাসিক সূত্রটীর সহিত গ্রন্থাবলম্বিত সিদ্ধান্তের কোনও বিরোধ হয় না। এইরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণের মূলে আরও কারণ দেখা যায় তাহা এই—প্রেম বিলাস গ্রন্থে (৫ম বিলাস) উক্ত আছে বৃন্দাবন উপনীত হওয়ার ৪ দিন পূর্ব্বে আচার্য্য প্রভু সনাতনের অপ্রকট বার্ত্তা শ্রবণ করেন কিন্তু সংবাদ দাতাগণ শ্রীরূপের অপ্রকট সংবাদ তখনও জানিতেন না, ইহার ৩ দিন পর তিনি শ্রীরূপের তিরোধান সংবাদ পাইলেন। আষাঢ় ও শ্রাবণ মাসে শ্রীরূপ সনাতনের অন্তর্ধান ঘটিয়া থাকিলে ২০শে বৈশাখের ৪ দিন পূর্ব্বে সংবাদ দাতাগণ উভয়েরই তিরোধান সংবাদ দিতে পারিতেন। কিন্তু উক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলে দেখা যায়, সংবাদ দাতাগণ ১৬ই বৈশাখ তারিখে আচার্য্য প্রভুকে সনাতনের তিরোধান সংবাদ দিতেছেন এবং সেই দিনই বৃন্দাবনে শ্রীরূপের তিরোভাব ঘটে। প্রেম বিলাসের মত গ্রহণ করিলে ধরিয়া লইতে হইবে ১৬ই বৈশাখ শ্রীরূপ এবং তাহার চারি মাস পূর্ব্বে অর্থাৎ পৌষের শেষ অথবা মাঘ মাসে সনাতন অপ্রকট হন।

ভক্তি রত্নাকরেও উক্ত আছে "আচার্য্য প্রভু বৃন্দাবনে উপনীত হওয়ার মাত্র কিছুদিন পূর্ব্বে সনাতন এবং "এবে অপ্রকট হৈলা শ্রীরূপ গোসাঞি।" (৪র্থ তরঙ্গ)। গ্রন্থের মত অনুসরণ করিতে হইলে উপর্যুক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা ছাড়া উপায় নাই। কিন্তু আষাঢ়ী পূর্ণিমায় শ্রীসনাতনের এবং শ্রাবণ শুক্লা দ্বাদশীতে শ্রীরূপের তিরোধান তিথি পূর্ব্ব হইতেই বৈষ্ণব জগতে প্রতিপালিত হইয়া আসিতেছে। ইতিহাস এবং জীবনী গ্রন্থের প্রমাণ অপেক্ষাও ইহার মর্য্যাদা অনেক বেশী। এ ক্ষেত্রে আকবরের বৃন্দাবনে আগমন ১৫৭৩ খৃষ্টাব্দের অন্ততঃ ৭।৮ মাস পূর্ব্বে ঘটিয়াছিল যদি এইরূপ কোন প্রমাণ পাওয়া যায় তবে ঘটনার সামঞ্জস্য স্থাপিত হইতে পারে। তাহা অবশ্য ঐতিহাসিকগণের গবেষণার বিষয়।

শ্রীশ্রীচৈতন্য চরিতামৃতের রচনা কাল প্রচলিত চরিতামৃতে পাওয়া যায়—

"শাকে সিন্ধগ্নিবাণেন্দৌ জ্যৈষ্ঠে বৃন্দাবনান্তরে।
সূর্য্যেঽহ্ন্যসিতপঞ্চম্যাং গ্রন্থোঽয়ং পূর্ণতাং গতঃ॥

অতএব ১৫৩৭ শকাব্দায় চরিতামৃত রচনা সম্পূর্ণ হয়। আমরা দেখিয়াছি কর্ণানন্দের রচনা কাল ১৫২৯ শকাব্দা। কর্ণানন্দে চরিতামৃতের বহু পয়ার উদ্ধৃত থাকায় অবশ্যই বুঝিতে হইবে, তাহার রচনা কাল চরিতামৃত রচনার পর। প্রেম বিলাস কর্ণানন্দেরও পূর্ব্বে রচিত হয় কারণ কর্ণানন্দে প্রেম বিলাসের কথা উক্ত আছে। আবার প্রেম বিলাসে চরিতামৃতের পয়ার উদ্ধৃত থাকায় বুঝিতে হইবে চরিতামৃত প্রেম বিলাসেরও পূর্ব্বে রচিত হয়। এখন চরিতামৃত রচনার কাল যদি ১৫৩৭ শকাব্দায় ধরিয়া লইতে হয় তবে সামঞ্জস্য থাকে না, অতএব এবিষয়েও আলোচনা প্রয়োজন। চরিতামৃতের কোন কোন সংখ্যায় উক্ত শ্লোকের পাঠান্তর পাওয়া যায়। যথা—শাকেঽগ্নিবিন্দুবাণেন্দৌ··· ॥ এই পাঠ অনুসারে চরিতামৃতের রচনা কাল হয় ১৫০৩ শকাব্দা। অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় কৃত শ্রীনিবাস আচার্য্য চরিত

গ্রন্থের পাদটীকায় উক্ত আছে ১৫০৫ শকে ব্যাসাচার্য্য চরিতামৃতের প্রতিলিপি করেন, সেই গ্রন্থেও উক্ত তারিখ পাওয়া গিয়াছে। এই গ্রন্থ নাকি বাঁকুড়া, রাইপুর রাজবাড়ীর গ্রন্থাগারে রক্ষিত আছে। ১৫০৩ শকে চরিতামৃত রচিত হইলে ১৫০৫ শকে তাহার প্রতিলিপি লিখন অসম্ভব নহে। কিন্তু এই তারিখ ভুল। কারণ চরিতামৃতে গোপাল চম্পূর উল্লেখ আছে। গোপাল চম্পূর রচনা শেষ হয় ১৫১৪ শকাব্দায়। অতএব চরিতামৃত রচনা তৎপূর্ব্বে নহে। তাহা ব্যতীত চরিতামৃতে রামচন্দ্র কবিরাজ ও গোবিন্দ কবিরাজের নাম পাওয়া যায় (চৈঃ চঃ ১।১১) ১৫০৩ শকে তাঁহারা বৈষ্ণব ধর্ম্ম গ্রহণ করেন নাই। বৈষ্ণব জগতে পরিচিতও হন নাই বলিয়া তাঁহাদের নাম উক্ত শকে চরিতামৃতে লিখিত হওয়া সম্ভব নহে। অতএব ১৫০৩ শকে চরিতামৃত রচনা অসম্ভব। অনেকে অগ্নির অর্থ সাত মনে করেন সেই মত অনুসারে চরিতামৃতের রচনা কাল হয় ১৫৭৭ শকাব্দা। কিন্তু যেহেতু প্রেম বিলাস এবং কর্ণানন্দ গ্রন্থে চরিতামৃতের উল্লেখ আছে সেই হেতু উক্ত তারিখও ভুল। বৈষ্ণব ইতিহাসবিদ্ বাঁকুড়া বাসী শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ পালিত মহাশয়ের নিকট হইতে প্রাপ্ত সন ১২৪৩ সালের অনুদিত পুঁথি হইতে এই পাঠ পাওয়া গিয়াছে—যথা সপ্তনবত্যধিক পঞ্চদশে ১৫৯৭ শকে জ্যৈষ্ঠ মাসি সূর্য্যে রবিবারে কৃষ্ণ পক্ষীয় পঞ্চম্যাং বৃন্দাবন মধ্যে গ্রন্থ সম্পূর্ণ।” উপরোক্ত কারণে এই তারিখও ভুল। এই সমস্ত বিভিন্ন মতভেদের মধ্যে চরিতামৃত রচনার যথার্থ কাল নিরূপণ সম্ভব নহে। সুতরাং তাহার উপর নির্ভর করিয়া কর্ণানন্দ রচনার তারিখ লইয়া বিচার চলিতে পারে না। তবে চরিতামৃত রচনার কাল সম্বন্ধে আলোচনায় যাহা পাওয়া গেল তাহাতে বুঝিতে হইবে গোপাল চম্পূ রচনার পর এবং কর্ণানন্দ রচনার পূর্ব্বে অর্থাৎ ১৫১৪ শকাব্দা ও ১৫২৯ শকাব্দার মধ্যবর্ত্তী কোন সময়ে চরিতামৃত রচিত হইয়া থাকিবে। এই সূত্র হইতে আরও একটি সিদ্ধান্ত পাওয়া যাইবে,—প্রেম বিলাসের উক্তিতে দেখা যায় আচার্য্য

প্রভু বৃন্দাবন হইতে প্রথমবার আগমনের সময় গ্রন্থ সম্পুটের সহিত চরিতামৃত আনয়ন করেন। বন বিষ্ণুপুরে গ্রন্থ চুরি হইলে সেই সংবাদ পাইয়া কবিরাজ গোস্বামী শ্রীরাধা কুণ্ডে ঝাঁপ দিয়া ছিলেন। আচার্য্য প্রভু যখন গ্রন্থ সম্পুট আনয়ন করেন তখন গোপাল চম্পূ রচিত হয় নাই। অতএব তখন চরিতামৃতও রচিত হয় নাই। সুতরাং এই সংবাদ মিথ্যা।

যাহা হউক বিচারে এই পর্য্যন্ত যাহা পাওয়া গেল তাহাতে আমরা নিম্নোক্তরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলাম।—

আচার্য্য প্রভুর জন্ম ৪৪১ শকাব্দায়, ১৪৫৫ শকে ১৪ বৎসর বয়সে তাঁহার নীলাচল যাত্রা। তাহার অনতিকাল পূর্ব্বে পিতা শ্রীচৈতন্য দাসের অপ্রকট। ১৪৫৬ শকে গদাধর পণ্ডিতের তিরোভাব। ১৪৯৫ শকে ২০শে বৈশাখ পূর্ণিমা তিথিতে তাঁহার বৃন্দাবন গমন। বৃন্দাবন গমনের ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও সম্ভবতঃ দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া এবং স্বীয় জননীর অনুরোধেই হয়ত পূর্ব্বে যাওয়া সম্ভব হয় নাই। ইহার ৭।৮ বৎসর পর ১৫০২।৩ শকে ৬২ বৎসর বয়সে তাঁহার গৌড়ে প্রত্যাবর্ত্তন, গ্রন্থ চুরি এবং অনতিকাল পরে মাতৃ বিয়োগ ও ১ম বিবাহ। তাহার ১।১॥০ বৎসর পর দ্বিতীয়বার বৃন্দাবন গমন ইত্যাদি, পরে খেতুরী মহোৎসব এবং দ্বিতীয়বার বিবাহ। এই পরিণত বয়সে বিবাহ প্রসঙ্গ অসম্ভব বলিয়া মনে হইতে পারে কিন্তু ব্রহ্মচর্য্য এবং ভজন পরায়ণ ব্যক্তির পক্ষে ৬০।৬২ বৎসর বয়সে শরীর দৃঢ় থাকা অসম্ভব নহে, তাহা ব্যতীত কুলীন ব্রাহ্মণ সন্তানের পক্ষে এই বয়সে দার পরিগ্রহ করা সমসাময়িক সমাজ নীতির প্রতিকুলও নহে। তবে সামাজিক কর্ত্তব্য পালনই তাঁহার বিবাহের কারণ নহে, বিশেষ উদ্দেশ্য সিদ্ধির নিমিত্তই তাঁহার দার পরিগ্রহ করা। অদ্বৈত প্রকাশ রচয়িতা ঈশান নাগরকেও উক্ত কারণে সীতা দেবীর আদেশে ৭০ বৎসর বয়সে বিবাহ করিতে হইয়াছিল, এবং কালক্রমে তাঁহার ৩টি সন্তানও জন্মগ্রহণ করে। আচার্য্য প্রভুর প্রকট কাল ৮৪ বৎসর

অতএব ১৫২৫ শকে বৃন্দাবনে তিনি নিত্যলীলায় প্রবেশ করেন ধরা যাইতে পারে।

বৈষ্ণব মহাজনগণের জীবনী হইতে ঐতিহাসিক সময় নির্ণয় করা অতি দুরূহ, বিশেষতঃ আচার্য্য প্রভুর কালনির্ণয় বিষয়ে মতভেদ বহু প্রকার। স্বাভাবিক দৃষ্টিতে যাহা যুক্তিপূর্ণ বলিয়া মনে হইয়াছে তাহাই গ্রহণ করিয়াছি। ইহাতে ত্রুটি বিচ্যুতি কিছু থাকিলে ঐতিহাসিকগণ তাহা সংশোধন করিবেন। আমি ঐতিহাসিক নহি। কোন ঐতিহাসিক মতবাদ প্রকাশ করিবার ইচ্ছাও আমার নাই। লীলা সম্ভোগ পরায়ণ বৈষ্ণববৃন্দ আচার্য্য প্রভুর অনুপম লীলা মাধুরী আস্বাদন করিয়া তৃপ্তি লাভ করিবেন, সেই উদ্দেশ্য লইয়াই গ্রন্থ সঙ্কলনে আত্মনিয়োগ করিয়া ছিলাম। সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইলেই কৃতার্থ হইব। * * * *

সঙ্কলন বিষয়ে পরম প্রীতিভাজন শ্রীমান নিতাই দাস গোস্বামী ও শ্রীমান কানাইলাল দত্তের অকুণ্ঠ সহযোগিতা প্রশংসনীয়। প্রার্থনা করি শ্রীগুরুদেবের অহৈতুকী করুণায় তাহারা উত্তরোত্তর ভক্তি সম্পদ লাভে ধন্য হউক। ইত্যলম্।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দাশ গুপ্ত।

—○[*]○—